অখণ্ড সংহিতা

বা

ষোড়শ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

ষোড়শ খণ্ড

চতুর্থ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৪২২

চারিণী সাধনা দেবী

ও

চারী স্নেহময়

ম্পাদিত।

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০

ধর্মার্থ শুল্ক ঃ একশত টাকা

(মাশুলাদি স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ [দুই হাজার] [2015]
প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০,
দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৮

প্রিন্টার :—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
লাক্সা, বারাণসী- ২২১০১০

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, স্বামী স্বরূপানন্দ সরণী, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৪৪/৩৭৯০

অযাচক আশ্রম
"মঙ্গল ভবন", ১১, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

অযাচক আশ্রম
২৩বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১) ২৩২৮৩০৪

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

অযাচক আশ্রম
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কাহিলিপাড়া কলোনী,
গৌহাটী-৭৮১০১৯, আসাম ● দূরভাষ-(০৩৬১) ২৪৭০৩১০

দি মাল্টিভার্সিটি
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড :৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

ষোড়শ খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের অমূল্য উপদেশ-বাণী একটী বিপুল গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়া "অখণ্ড-সংহিতা" নামে প্রচারিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে চতুর্দ্দশ খণ্ড পর্য্যন্ত কোনওটীর দ্বিতীয়, কোনওটীর তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের হিতার্থে ষোড়শ খণ্ড প্রকাশ করিতে পারিয়া নিজেদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের জীবনচর্য্যা কতকগুলি বিশেষত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। যথা,—

(ক) তিনি জীবনে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন নাই এবং স্বাবলম্বনের মধ্য দিয়া জীবহিত সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন।।

(খ) তিনি ব্রহ্মচর্য্যকেই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং যাহা-কিছু মঙ্গলকর্ম্ম জীবন ভরিয়া করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের উপরে জনমনে আস্থা স্থাপনেরই চেষ্টা অবিরাম চলিয়াছে।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহ প্রভৃতি হইতে তাঁহার কর্ম্মপ্রয়াস সম্পূর্ণ-রূপে মুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া তিনি জনকল্যাণব্রত সাধন করিয়া যাইতেছেন।

(ঘ) শহরের যশঃসম্বর্দ্ধক কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সযত্নে দূরে থাকিয়া তিনি পল্লীর পর পল্লীতে নিঃশব্দে নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন।

(ঙ) তাঁহার সৃষ্ট অযাচক আশ্রম তাঁহারই স্বকীয় শ্রমলব্ধ অর্থে নির্ম্মিত ও পরিচালিত, ইহার মধ্যে ধনীর অনুগ্রহ-কামনার হীনতা নাই।

যাঁহারা পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়াছেন, ষোড়শ খণ্ড তাঁহাদের নিকটে যে অতীব আকর্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সংশয় নাই। কিমধিকমিতি—

অযাচকআশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১
(উত্তর প্রদেশ)

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
স্নেহময় ব্রহ্মচারী



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

ষোড়শ খণ্ড

—ঃ (*) ঃ—

পাথরকান্দি
২২শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৪১
(৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী সহ বেলা নয়টায় পাথরকান্দি পৌঁছিয়াছেন।

ষ্টেশনেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইল শ্রীহট্টের কালীঘাট-নিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসের সহিত।

তিনি আভূমি প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাল আপনাকে দেখলাম শ্রীহট্টে, আর আজই আপনি এখানে?

শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় বলিলেন,—আপনার কাছেই এসেছি। আপনার কাছে আমার দুটি কথা আছে। আপনি আপনার বিশ্রাম-স্থানে গিয়ে বিশ্রাম করুন, আমি আমার এক পরিচিত বান্ধবের গৃহে যাই। বিকাল বেলা আমি আপনার সাথে দেখা করব এবং আমার বক্তব্য বল্‌ব। শুধু এই কাজটুকুরই জন্য আমি পাথরকান্দি এসেছি। এখানে আমার অন্য কোনও কাজ নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাল ত' রাত্রি এগারটায় আপনি শ্রীহট্ট ষ্টেশনে আমাকে ট্রেণে তুলে দিতে অন্যান্য কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এসেছিলেন। রাত দুটো পঁচিশ মিনিটের আগে ত' ট্রেণ ছাড়ে নি। সেই সময়ের মধ্যেই ত' আপনি আপনার কথা দুটি বল্‌তে পারতেন। বৃথা রাত্রি-জাগরণের কষ্ট স্বীকার কর্‌লেন।

সতীশ বাবু বলিলেন,—বৃথা রাত্রি জাগি নাই। আপনার কামরার পাশের কামরায় ব'সে ব'সে অবিরাম আপনারই ধ্যান করেছি আর মনে মনে আলোচনা করেছি যে আপনি কুড়ি পঁচিশ দিন ধ'রে জাগন-যজ্ঞ থেকে শ্রীহট্টে কি অপূর্ব্ব

সুধা আমাদের জন্য অকাতরে বর্ষণ ক'রে গেলেন কিন্তু আমরা শুধু শুন্‌লাম, কিছু করলাম না। যাক্‌, বিকালেই আমি দেখা কর্ব্ব এবং আমার সব বক্তব্য বল্‌ব।

সতীশ বাবু প্রস্থান করিতেই একটী যুবক আসিয়া প্রণাম করিল। বলিল—বাবা, আমি বড় বিপন্ন হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি।

—কোত্থেকে এসেছ?

—শ্রীহট্ট থেকে।

—কবে, কি ভাবে?

—এই ট্রেণেই।

—তুমি ত' সিলেট ষ্টেশনেই আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌তে। আমি ত' রাত এগারটা থেকে দুটো পঁচিশ মিনিট পর্য্যন্ত নিদ্রাগত হ'তে পারি নি।

—সেই জন্যই আমি আপনার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারি নি। আপনাকে ঘিরে কত রকমের লোকের যে ভিড় ছিল। তার মধ্যে কেউ নিজের কোনও গোপন কথা বল্‌তে পারে?

—বেশ। এখানে কোথায় উঠ্‌বে?

—এখানে আমার পরিচিত কেউ নেই।

—নেই। ক্ষতি কি? আমি যেখানে উঠ্‌ব, সেখানেই চল। যেখানে আমি দুটী ডাল-ভাত খাব, সেখানেই তুমি প্রসাদ পাবে। আপত্তি নেই ত'।

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি যাঁহার গৃহে উঠিবেন, তাঁহারই দেখা নাই।

বিপ্লব

এমন সময়ে আর একটী যুবক আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। বলিল,—আমি আপনাকে আর কখনো দেখি নি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। আমার কতকগুলি গোপনীয় কথা বল্‌বার আছে। তা' এখনি বলতে চাই। ষ্টেশনের ভিড়ে সম্ভব নয়। একটু একান্তে আসবেন কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বচ্ছন্দে।

উভয়ে ষ্টেশনের একটী দূরবর্ত্তী প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবক বলিল, দেশে আজ বিপ্লবের প্রয়োজন। পরাধীনতার নাগপাশ আজ ছিন্ন করতে হবে। এ সময়ে বিপ্লবের আবশ্যকতা সম্পর্কে প্রচার-কার্য্য না ক'রে আপনি শুধু ব্রহ্মচর্য্যের উপরে এত জোর দিচ্ছেন কেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—বিপ্লবকে প্রচার করতে হয় না। বিপ্লব আপনা আপনি আসে। চারিদিকের পরিস্থিতি এবং জনগণের আত্মপ্রকৃতি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। একটা জরুরী প্রয়োজনের দাবীকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পূরণের জন্য সমগ্র জাতির সঙ্ঘবদ্ধ যে চেষ্টা, তারই অপর নাম বিপ্লব। বোমা, বন্দুক, নরহত্যা বা বিভীষিকা-সৃষ্টি বিপ্লবের সহায়ক না হ'য়ে বিপ্লবের ধ্বংসক হতে পারে। মানুষের মনে যে বদ্ধ সংস্কার বহু যুগের সঞ্চিত গ্লানিকে বহন ক'রে বেড়াচ্ছে এবং যার ফলে নূতন জগতের নব-পরিস্থিতির দাবীকে অনুভবে আনতে যে

অক্ষম হচ্ছে, ব্যাপক চিন্তার বিপুল প্লাবন এনে তাকে ধুয়ে ধসিয়ে নিয়ে তাকে তার বর্ত্তমান রূপ থেকে পরিভ্রষ্ট এবং সম্ভব হ'লে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়ার সার্থক চেষ্টার নাম বিপ্লব। সেই বিপ্লবে আসুরিক শক্তির চেয়ে ঋষি-মনীষার প্রয়োজন অধিকতর এবং সেই বিপ্লবকে সফল করার জন্য চরিত্রবলই সবচেয়ে বড় অবলম্বন। এই জন্যই আমি "বিপ্লব" "বিপ্লব" ব'লে চীৎকার করিনি, এই জন্যই আমি "চরিত্র" "চরিত্র" ব'লে গর্জ্জন ক'রে যাচ্ছি।

হঠাৎ যুবকটী একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল,—আমার পিছনে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরে আবার দেখা করব।

ইতিমধ্যে পাথরকান্দির গৃহস্বামী শ্রী—বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—স্বামীজী, কার সঙ্গে কথা বলছেন? ছেলেটা যে ইংরেজ কর্ত্তাদের পুলিশের গুপ্তচর।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বিচিত্র কি!

যোনিপূজা ও লিঙ্গপূজা

প্রস্থানে শ্রীহট্ট হইতে আগত যুবকটী বলিল,—এক দুর্নিবার দুশ্চিন্তা আমার মনকে নিরন্তর অধিকার ক'রে রেখেছে। যে দিকে তাকাই, আমি শুধু স্ত্রী-যোনিই দর্শন করি অথবা স্ত্রীযোনি কল্পনা করি। স্কুল-কলেজের দেওয়ালে, রেলের কামরায়, সাধারণ চিত্রপটে যেখানে দৃষ্টি পড়ে, কেবল খুঁজে

বেড়াই যে, কোন্ রেখাটীর সঙ্গে কোন্ রেখাটী যুক্ত হ'লে একটী স্ত্রীযোনির মতন দেখতে হয়। শিশু, বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা যে-কোনও নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ুক, তার সর্ব্ব অঙ্গের রূপ-লাবণ্য আমার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে যায়, আমার মন কেবল কল্পনা করে থাকে যে এই ব্যক্তিটীর যোনিটি যেন দেখতে কেমন। এই এক মনোবিকারে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। এর প্রতিবিধান করুন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রতিবিধান অতি সহজ। কিন্তু এরূপ চিন্তার কারণটি তোমার কি, তা আগে বের করে নাও। তোমার কি নারী-সম্ভোগের ইচ্ছা থেকেই অবিরাম এই চিন্তা হচ্ছে, না, শুধু দেখবার কৌতূহল থেকে বা জানবার ইচ্ছা থেকে এই নিদারুণ চিন্তার উদ্ভব হয়েছে, সেইটী তুমি বিচার-বিবেচনা-অনুসন্ধান ক'রে বের করে নাও। কারণটী তোমার জানা হ'য়ে গেলে এই চিন্তার মূলোৎপাটন সহজ হবে। যদি স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা থেকেই এর উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে সকল কষ্টে মনকে আদেশ কর বিবাহ করা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করতে। সফল প্রতীক্ষা তোমাকে বলবান কর্ব্বে এবং যখন স্ত্রী-সম্ভোগের যোগ্য সময় আসবে, তখন তোমার সম্ভোগ সুখকর ও সার্থক হবে। আর কৌতূহলই যদি তোমার এই দারুণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে থাকে, তবে মনকে বুঝিয়ে বল যে, স্ত্রীযোনি যেমন এক আশ্চর্য্য পদার্থ, স্ত্রী-পুরুষের শরীরের প্রতিটী অঙ্গের প্রতিটি জীবকোষ বা সেল্ তেমন

অতীব আশ্চর্য্য পদার্থ। তুমি মনে মনে ভাবছ যে, যোনি বুঝি শরীরের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানেই থাকে কিন্তু তা নয়, লক্ষ লক্ষ নূতন নূতন মানুষকে জন্ম দিতে পারে, নূতন মানুষের সর্ব্বাঙ্গ তৈরী ক'রে, পূরণ ক'রে, তাকে পূর্ণাঙ্গ মানব-রূপে বিকশিত ক'রে দিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবকোষ বা সেল মানুষের শরীরের সর্ব্ব অংশে সমান ভাবে বিস্তারিত রয়েছে। বিজ্ঞান একদিন এই আবিষ্কার সফল ক'রে কৃতার্থ হবে যে, তোমার একটা আঙ্গুল বা কান কিম্বা বুকের মাংস থেকে একটী বা একাধিক জীবকোষ নিয়ে তার মূলধনে তোমারই মতন বুদ্ধিমান বা প্রতিভাধর একজন বা একাধিক মানুষের সৃষ্টি সম্ভব হবে। সমগ্র সৃষ্টিই যোনিময়, অর্থাৎ সৃষ্টির সবখানেই নবতর সৃষ্টির অপূর্ব্ব সম্ভাবনা পূর্ণ-রূপে বিরাজমান। এজগতে জড় বস্তু ব'লে কিছু নেই, সব কিছুই চৈতন্যের রূপাভাস। এই জন্যই মধ্য যুগের প্রাচীন অংশে বা প্রাচীন যুগের মধ্য অংশে এই ভারতে একদল সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল, যারা যোনিকেই মনে করতেন পূজাস্থান এবং অঙ্কিত বা শিলা-নির্ম্মিত যোনিকে পরোক্ষতঃ কিম্বা নারীদেহস্থিত যোনিকে প্রত্যক্ষতঃ সম্মুখে রেখে পরমেশ্বরী-জ্ঞানে পূজার্চ্চনা ক'রে নিজেদিগকে বিগতকাম করতেন। এসব সাধনা কখনো কখনো তাঁদিগকে প্রকৃত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট করেনি, এমন কথা বলা চলে না কিন্তু অনেকেই যে নিজ

নিজ পরম-লক্ষ্যকে ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এটাও সত্য। এসব উৎকট সাধনা আজ আর প্রচলিত নেই এবং এসব মারাত্মক পন্থার পুনঃ-প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়ও নয়। কিন্তু মানুষ যোনি-পূজার প্রয়োজন চিরকাল অনুভব করেছে এবং প্রকৃত বিনীত মনে যোনিপূজা ক'রে অনেকে উপকৃতও হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তোমার মনটি যেমন অবিরাম যোনি-চিন্তায় উদ্ভ্রান্ত হচ্ছে, তেমনি ক'রে একটী কিশোরী বা যুবতীর মনে লিঙ্গ চিন্তার উৎকট অত্যাচার শুরু হওয়াও বিচিত্র নয়। এই চিন্তাকে আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিকতার পথে ধাবিত করার একান্ত আগ্রহে পৃথিবীর নানা প্রান্তে লিঙ্গ-পূজারও প্রবর্তন এক সময়ে হয়েছে। নানা দেশের লিঙ্গ-পূজার বিপুল হিড়িক যদিও বর্তমান সভ্যতার ও ধর্ম্মের বিপুল প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু ভারতে নির্বিকার সাত্ত্বিকতায় গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন, লিঙ্গ-মূর্ত্তিকে আবার যোনিপীঠের উপরেই স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু এর দরুন কোনও পূজক বা পূজার্থিনীর মনের কোণে এক কণাও অসুন্দর অশোভন ভাবের উদ্গম নেই। পুমঙ্গ নারীকে আর স্ত্রী-অঙ্গ পুরুষকে অনাদি কাল থেকে হয় কৌতূহলের আকর্ষণে, নয় সম্ভোগের লালসায় সহস্রবার উন্মাদিত ক'রেছে এবং সেই উন্মাদনা নানা দেশে নানা রূপ অশালীন পূজার্চ্চনার আড়ম্বরের মধ্য

দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, যার ফল অনেক সময়ে সামাজিক ব্যভিচার ও অনুচিত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চাকে প্রশ্রয় দান ব্যতীত আর কিছু হয় নাই, কিন্তু তারও এক অপূর্ব্ব ব্রহ্মবাদের আস্বাদনের ফলে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মকে কি লিঙ্গে কি যোনিতে দর্শন ক'রে স্বাভাবিক ভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দর্শনের চেষ্টার মধ্য দিয়েই তোমার মনের সকল উন্মাদনার অবসান ঘটবে। তুমি চিন্তা করো না।

অর্দ্ধনারীশ্বর

যুবক।—তার উপায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একই ব্রহ্ম কোথাও পুরুষ-রূপে কোথাও নারী-রূপে নিজেকে বিকশিত ও বিস্তারিত করেছেন। পুরুষ-রূপে তিনি নারীকে একদিকে করছেন ধ্যান, অন্য দিকে করছেন আকর্ষণ, নারী-রূপে তিনি পুরুষকে একদিকে করছেন ধ্যান, অন্য দিকে করছেন আকর্ষণ। ধ্যান জমাট বাঁধলেই নারী আর পুরুষ এক, দুটী আলাদা বস্তু নয়। একে অপরের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে মিলিত হ'লেই নারী আর পুরুষ অভিন্ন, দুইটী আলাদা সত্তা নয়। কিন্তু দেহের ক্ষণিক মিলনেই দুজনের পূর্ণ মিলন সাধিত হয় না, আত্মায় আত্মায় পূর্ণ মিলন চাই। সেই মিলন ধ্যানের পথেই সম্ভব। এজন্য একদল সাধক এক অত্যদ্ভুত পন্থার আশ্রয় নিলেন। সেটি হচ্ছে অর্দ্ধনারীশ্বর-কল্পনা। যিনি নারী, তিনি আবার পুরুষ।

যিনি শিব, তিনিই পার্ব্বতী। যিনি পূজ্য, তিনিই পূজক। দুইটীর মিলন একেবারে সার্ব্বাঙ্গিক এবং মন, প্রাণ, আত্মা জুড়ে এই মিলন। দৈহিক সম্ভোগের বা ইন্দ্রিয়-লালসার এক কণা ঠাঁই এর মধ্যে আর রইল না।

কিশোরী-ভজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর একদল সাধক অদ্ভুততর পন্থার আশ্রয় নিলেন। নিত্যকিশোর পরমেশ্বর তাঁদের একমাত্র উপাস্য হ'লেন আর নিজেদিগকে তাঁরা কল্পনা কর্ত্তে লাগলেন নিত্য-কিশোরী প্রকৃতি ব'লে। শারীরিক গঠনে যিনি দিব্যি একটী পুরুষ ছাড়া আর কিছুই নন, তিনি নিজের পুরুষত্বের পূর্ণ অভিমান সম্পূর্ণতঃ বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেকে প্রকৃতি ব'লে ভাবতে লাগলেন। নিজ বক্ষে তিনি স্তন দেখতে লাগলেন, নিজ পুংমেঢ্রে তিনি যোনি দর্শন কর্ত্তে লাগলেন, নিজ অস্তিত্বকে তিনি নিত্য-কিশোর শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সাধনের আয়তন বলে অবিরাম ধ্যান কর্ত্তে লাগলেন, একজন হরিপদ, একজন দয়ারাম, একজন সত্যচরণ, একজন বিশাখা সখী, একজন মাধবী সখী, একজন শ্রীরাধিকাতে পরিণত হ'য়ে গেলেন। নিজের পুরুষ-সংজ্ঞা বিস্মৃত হ'য়ে গেলে আর যোনি-চিন্তা তার কোন্ ক্ষতি সাধন কর্ত্তে পারে? এভাবে সাধকেরা নানা অঞ্চলে নানা যুগে নানা ভাবে কামবিকারের ঊর্দ্ধে যাবার চেষ্টা করেছেন।

গুরুনিষ্ঠা

যুবক বলিল,—এ সকল উপায় আমার পক্ষে সহজ হবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সহজ হবে না, তা' জানি। তুমি এসব উপায় অবলম্বন কর, তাও আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু সাধকেরা কে কি করেছেন, জেনে রাখ্‌তে দোষ নেই। এ দুটী উপায় ছাড়া আরও একটী উপায় অনেক সাধক অবলম্বন করেছেন। সেটি হচ্ছে, গুরুতে একান্ত ভাবে পরিনিষ্ঠিত হওয়া। গুরুকে রক্ত-মাংসের একটা পিণ্ডমাত্র মনে না ক'রে পরম-চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি জ্ঞান ক'রে যদি কেউ মনে প্রাণে তাঁর নিকটে নিজেকে নিঃশেষে এই ব'লে সমর্পণ করে দেয় যে, হে গুরো, অনাদি অনন্ত কাল ধরে তুমি আমাকে এমন পথে পরিচালিত কর যেন কাম-মোহ আমাকে অভিভূত না করে, সাধারণ মানুষের পক্ষে যা সুলভ, সেই যৌন কৌতূহল যেন আমার মনের কোণেও কদাচ উঁকি না মারে। গুরুকে কাম-ক্রোধ-দ্বেষাদির ঊর্দ্ধে অবস্থিত এক অনবদ্য সত্তা ব'লে জেনে নিয়ে যে গুরুধ্যান করে, গুরু তার পক্ষে সর্ব্বকণ্টকনাশক সর্ব্ববিঘ্ননিসূদন পরমবান্ধব হ'য়ে পড়েন। অবশ্য গুরুতে এই আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে অনেক স্বার্থপর ইন্দ্রিয়-চঞ্চী গুরু শিষ্য-শিষ্যাদের অনেক সর্ব্বনাশ অনেক স্থানে করেছেন এবং ভবিষ্যতেও

কত্তে পারেন, এই আশঙ্কাটী থাকা সত্ত্বেও শিষ্যের বা শিষ্যার পক্ষে গুরুতে একান্ত ভাবে পরিনিষ্ঠিত হওয়ার এই সুফলটুকু উপেক্ষা করার মত নয়। সত্যিকারের গুরুকে যদি সর্ব্ববস্তুতে ধ্যান কত্তে পার, তবে কালিকলুষে তোমার কি কত্তে পারে? মৈথুন চিন্তা মনে আসে? গুরুদেবের মূর্ত্তিখানা ঐ চিন্তার মাঝখানে সযত্নে বসিয়ে দাও,—কুচিন্তা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবে। যোনিধ্যান মনে আসে? গুরুদেবের প্রেমপূর্ণ অস্তিত্বের চিন্তাকে তার মধ্যে স্থাপিত কর। যোনিবস্তুটী নিজের রূপ পরিবর্ত্তিত ক'রে নেবে। গুরুতে পরিনিষ্ঠিত-চিত্ত শিষ্যকে এসব সঙ্কট থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা গুরুর আছে, কারণ প্রকৃত গুরু নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ এবং অভিসন্ধিহীন।

যুবকটী দীক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উত্তম, বসো। এখনি দীক্ষা হবে।

দীক্ষা হইয়া যাইবার পরে সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবামণি, শ্রীহট্টে কত লোক দীক্ষার জন্য এসেছেন, সবাইকে এক কথায় ফেরৎ দিয়েছেন। এই ছেলেটীকে আপনি আবার এক কথায় দীক্ষা দিয়ে দিলেন। রহস্যটা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ছেলেটীর অবিলম্বে দীক্ষার প্রয়োজন। অন্যান্যদের নিকটে দীক্ষা ছিল শুধু লোকপ্রথা রক্ষা।

জ্ঞান কখনো ফালতু হয় না

বেলা দেড় ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি সকলের অনুরোধে পাথরকান্দি মডার্ণ ইন্‌ষ্টিটিউশানে দেড়ঘণ্টা ব্যাপী একটী ভাষণ দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ দেখা, শিক্ষকদের দোষ দেখা বেশ কতক দিন যাবৎ দেশে চালু হয়েছে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, ভারত ইংরেজ-শাসনের অধীন হওয়ার পর থেকে দেশে যে শিক্ষা-পদ্ধতি চালু হয়েছে, তার আদর্শের উৎস ভারতবর্ষ নয়, সেই উৎসের সৃষ্টি ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ডের লোকের জীবন-দর্শন আর ভারতীয় জীবন-দর্শন এক নয়। তদুপরি তাঁদের দেশের লোকের প্রয়োজনে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি বা কচ্ছি, তাতে আমাদের দেশের প্রয়োজন মিটে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে জাতীয় শিক্ষার জন্য এক প্রবল আন্দোলনের এ দেশে সৃষ্টি হয়। কিন্তু তথাকথিত সেই জাতীয় শিক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিরই নূতন নামকরণ মাত্র। কি শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন হ'লে এদেশের মানুষের বর্ত্তমান যুগোপযোগী আত্মপ্রস্তুতি সম্ভব হবে, এ নিয়ে অনেক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় মনীষী গভীর ভাবে চিন্তা কচ্ছেন। তোমরা ছাত্রের দল সে সব দুশ্চিন্তা-সাগরে পতিত না হ'য়ে যার যতটুকু আছে শিক্ষার সুযোগ, সে তা' প্রাণপণে গ্রহণ কর। শিক্ষার সময়ে

যদি শিক্ষার সুযোগটুকু গ্রহণ না ক'রে অন্য ব্যাপারে সময় নষ্ট কর, তাহ'লে পরবর্তী কালে যখন শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা তোমাদের উপলব্ধিতে আসবে, তখন হয়ত জীবন-সংগ্রাম এমনি তীব্র হ'য়ে যাবে যে হাজার চেষ্টা করেও শিক্ষা লাভের সুযোগ ক'রে উঠতে পারবে না। তোমরা অনেকেই গরীব মা-বাপের ছেলে। মাতাপিতা অনেক কষ্ট ক'রে তোমাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষাটুকুরই ব্যয় বহন করতে গিয়ে গলদঘর্ম হ'য়ে পড়েন। সুতরাং মনটাকে শিক্ষা লাভের চেষ্টার সঙ্গে সর্ব্বদা যুক্ত রাখবে। জ্ঞান বস্তুটা অল্প হ'লেও অনেক কাজে আসে। ইংরাজিতে বলে—Knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি। এদেশে বর্ত্তমানে শিক্ষার মান খুবই নীচু আর শিক্ষার আদর্শও অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু এই শিক্ষাটুকু নেবার যার সুযোগ আছে, সে নিজেকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখবে কেন? জ্ঞান কখনই ফালতু হয় না। যেখানে যে টুক্‌রা টুক্‌রা জ্ঞানই আহরণ কর না কেন, জীবনের কোনও না কোনও মুহূর্ত্তে তার যে-কোনও একটা টুক্‌রা তোমার বড় বড় কাজে এসে যেতে পারে। জ্ঞানসঞ্চয়কে পুণ্যসঞ্চয়ের মত মনে করবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুণ্য কাজ যে জীবন ভ'রে ক'রে যায়, তার জীবন পরিণামে এক অখণ্ড পুণ্যের বিপুল ভাণ্ডারের মতন হয়। জ্ঞানসঞ্চয়কে কৃপণের ধনসঞ্চয়ের মতন মনে কর্বে। এক পয়সা দুই পয়সা ক'রে প্রত্যহ সঞ্চয়

করতে করতে হঠাৎ সঞ্চয়ী গৃহস্থ দেখতে পায় যে, তার একশ টাকা জমে গেছে। তখন সে একশ টাকা দিয়ে একটা অতীব প্রয়োজনীয় জিনিষ ইচ্ছা করলেই কিনতে পারে, যেমন ধর এক হাল জমি বা একটী দুগ্ধবতী ভালো গাভী। সদ্‌বিষয়ের জ্ঞানকে কখনো-অনাবশ্যক ব'লে হেলা কর্বে না। সাধু সন্ন্যাসীরা হয়ত বলবেন, স্কুলে পড়ে কি হবে রে, ঐ সব বিদ্যা ত' অবিদ্যা, স্কুল ছেড়ে চলে আয়, আমরা ব্রহ্মবিদ্যা শিখাব। এ কথায় ভুলে যেও না। এ কথা মায়ার ছলনা ছাড়া কিছু না। খোঁজ ক'রে গিয়ে দেখ, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যেও যাঁরা বিদ্বান্‌, তাঁরা সমাজের বেশী কাজ করতে পেরেছেন। দেশের সেবার জন্য স্কুল ছেড়ে দাও, একথা গত ত্রিশ বৎসর ধ'রে অনেক বার আমরা শুনেছি কিন্তু দেখা গেছে যে, বিদ্যার্জ্জন যারা করে নি, তারা অনেক সময়ে অনেক দামী দামী কাজের বেলায় নিজেদিগকে অযোগ্য দেখে ক্ষুব্ধ হ'তে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি যাঁরা সংশোধন করবার, তাঁরা তা' করুন, তোমরা যে যতটুকু শিক্ষার্জ্জনের সুযোগ পেয়েছ, তার সদ্ব্যবহার কর। ভারতের ঋষি অধ্যয়নকে তপস্যা বলে বর্ণনা করেছেন। এটা শুধু কবির কণ্ঠ-কাকলী নয়, এটা অতি সত্য কথা, অধ্যয়নকে তোমরা তপস্যা জ্ঞান করো। অধ্যয়ন তপস্যা বলেই তোমাদের প্রতিজনকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা করতে হবে, অন্তরে স্ত্রী-জাতির প্রতি মাতৃভাব পোষণ করতে হবে, জীবন যে জগতের

কল্যাণ সাধনেরই জন্য, শুধু আত্মস্বার্থ-পুষ্টির জন্য নয়, এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মচর্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিক্ষার্থীর জীবনের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে মনের একাগ্রতা আর এই একাগ্রতাকে স্বভাবসিদ্ধ সম্পদে পরিণত করার জন্য চাই সংযম, সদাচার ও ব্রহ্মচর্য্য। ছত্র-পাদুকা-বর্জ্জন, নিরামিষ আহার আর ঘন ঘন উপবাস,—এর নাম ব্রহ্মচর্য্য নয়। শরীরের সারভূত মহাবস্তুকে অপচয়িত হ'তে না দেওয়ার নাম ব্রহ্মচর্য্য। অনিচ্ছায় যার যা ক্ষয় হবার হোক্, তা' নিয়ে মাথা ঘামার দরকার নেই কিন্তু স্বেচ্ছায় কখনো নিজের সারবস্তুকে অপচয়িত হ'তে দেবে না,—এই পণ প্রত্যেকে কর। কুসঙ্গ বর্জ্জন কর্ব্বে, কুকথা বলবে না, কুচিন্তা কর্ব্বে না,—এই পণ কর। নারী মাত্রের প্রতি মাতৃভাব এবং ভগিনী-ভাব পোষণ কর্ব্বে এবং নিষ্প্রয়োজনে মেয়েদের সঙ্গে মেশামেশি কর্ব্বে না, আবার প্রয়োজনের সময়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে গিয়ে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে আসতে ভয়ও পাবে না, সঙ্কোচও কর্ব্বে না,—এই পণ কর। তোমার পিতামাতা তোমার কাছে নিশ্চয়ই কিছু প্রত্যাশা করেন। তাঁদের প্রত্যাশা-পূরণের জন্য তুমি চরিত্রে, বিদ্যায় ও সৎকর্ম্মানুশীলনে যত বড় হ'তে পার, তা' হবার জন্য চেষ্টা নিয়তই কর্ব্বে,—এই পণ কর।

পিতৃমাতৃ-ভক্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদ্যার্থী কিশোর গুরুগৃহে গিয়ে প্রথমেই যে উপদেশটী পেত, তা' হচ্ছে, পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর, মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর। এর তাৎপর্য্য হ'চ্ছে এই যে, পিতৃমাতৃচরিত্রে যে মহত্ত্বগুলি আছে, নিয়ত তারই অনুধ্যানে মনকে মজিয়ে রাখলে নিজের জীবনে সেই সকল সদ্গুণের পরিবিকাশের জন্য আগ্রহও জন্মে, যোগ্যতাও জন্মে। এ ভাবে বংশানুক্রমিক চর্চ্চা ও চেষ্টা চল্‌লে একটা সাধারণ বংশের ভিতরে অসাধারণ মানবদের আবির্ভাব ক্রমশঃ সম্ভব হয়ে আসে। ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাও তোমার একটী মাত্র জীবনের কুশলের জন্যই পরিকল্পিত নয়, তোমাকে অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যতের যে বংশধারা প্রবাহিত হবে, তদন্তর্ভুক্ত সকলের কুশলের দিকে তাকিয়ে।

ব্যক্তির কুশল নহে, সমষ্টির কুশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্যক্তি-বিশেষের কুশলই তোমার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অগণিত মানব-সন্তান, সকলে তোমার জ্ঞান, বিদ্যা, কৃতিত্ব ও পৌরুষের দ্বারা লাভবান্ হবে, এইটী তোমার সুস্পষ্ট

লক্ষ্যে থাকা চাই। কেবল নিজের জন্য বাঁচা, বাঁচাই নয়। বাঁচতে তোমাকে হবে এবং সকলের শুভার্থে তুমি বাঁচবে। এই লক্ষ্য স্থির রেখে প্রত্যেকটী কাজ করো, নিশ্চিতই তুমি জীবনে জয়যুক্ত হবে।

অভিক্ষা

অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাস মহাশয় আসিলেন। বলিলেন,—আমি এসেছি ক্ষমা ভিক্ষা করতে।

শ্রীশ্রীবাবামণি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—ক্ষমা? এর মানে?

—মানে এই যে, আমাদের শ্রীহট্টে অনেক বড় বড় ধর্ম্ম-প্রবক্তারা ভাষণ দিতে এসেছেন এবং তাঁরা চলে যাওয়ার সময়ে আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক টাকা তুলে তাঁদের হাতে শ্রদ্ধার্ঘ্য-রূপে অর্পণ করেছি। কিন্তু আপনার ব্যাপারে একাজটী আমরা কেউ করিনি, কর্ব্বার জন্য চেষ্টাও করিনি।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতে আপনাদের কুণ্ঠিত হবার কি আছে? আমি ত' কারো কাছে কিছু চাই নি। আপনারা দিতে যাবেন কেন? আমি যদি চাইতাম আর আপনারা কিছু না দিতেন, তবে বরং কথা ছিল।

সতীশ বাবু,—আপনি চাইবেন না ব'লেই ত' আপনার

আরব্ধ সৎ-কাজগুলির জন্য আমাদের যেচে অর্থদান করা সঙ্গত।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—এদেশে ভৈক্ষ্যকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। অন্তরের অভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়ে পরহিতকারী মহাজন দ্বারে দ্বারে মাধুকরী ক'রে জীবন ধারণ কর্ত্তেন, এই হচ্ছে এ দেশের চিরপ্রশংসিত নীতি। এমতাবস্থায় আমি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কিছু না চাইলে আপনারা আমাকে কিছু দিতে ত' বাধ্য নন। বৃথা কেন নিজেদিগকে দোষী জ্ঞান কচ্ছেন? আমার মত তুচ্ছ বক্তার বক্তৃতা শুনতে দিনের পর দিন আপনারা সহর ভেঙ্গে সভাস্থলে এসেছেন, এ কি আমার প্রতি আপনাদের কম স্নেহ?

সতীশ বাবু।—আমার মনে একটা প্রবল আগ্রহ জন্মেছে যে, আমি সিলেট ফিরে গিয়ে সকল সজ্জনদের ডেকে আপনার আশ্রমের সহায়তা-কল্পে অর্থ সংগ্রহের একটা চেষ্টা কর্ব্ব। এতে আপনার অনুমতি প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—না সতীশ বাবু, এ কাজটী কর্ব্বেন না। কিঞ্চিন্যূন এক মাসে আপনারা আমার রচিত বই-পত্র প্রায় দেড় হাজার টাকার কিনেছেন, এ টাকাটাই আমার যথেষ্ট। দুর্গেশ্বর বাবু আমাকে আশ্রমে ফিরে যাবার ভাড়ার টাকা দিয়ে দিয়েছেন, অতিরিক্ত দিয়েছেন একটী পার্কার পেন। সুরেশ বাবু ভাইস-প্রিন্সিপাল আমাকে একখানা পশমী চাদর কিনে উপহার দিয়েছেন। আমার প্রয়োজনের তুলনায় এগুলি অতিরিক্ত।

সতীশ বাবু কয়েক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—আশ্চর্য্য!

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অভিজ্ঞতা এক শক্ত ব্রত। আমাকে দেশের পর দেশ নিজের পয়সায় ভ্রমণ করতে হয়। বইগুলি না থাকলে মুস্কিল হ'ত। আমাকে সভাস্থলে আলো জ্বেলার পেট্রোম্যাক্সটাও নিজের পয়সায় কিনতে হয়েছে। সভার বিজ্ঞাপনগুলি আমি নিজের পয়সায় ছাপিয়ে নিয়ে থাকি। কোনো কোনো সহরে হলের ভাড়াও নিজেই দেই। এতে আমার কোনো কষ্ট হয় না, না হয় দেহে, না হয় মনে। চাঁদা না তুলে, চাঁদা না নিয়ে, কারো উপরে উৎপীড়ন না চাপিয়ে আমি আস্তে আস্তে যে কাজ করে যাচ্ছি, তার পূর্ণ সুফল একদিন স্বাবলম্বন-প্রবুদ্ধ এক মহাজাতির আকার ধারণ করবে, এই বিশ্বাস আমার অন্তরে আছে।

ষড়যন্ত্র

অতঃপর সতীশ বাবু অন্য একটি প্রসঙ্গ তুলিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, অতীব সঙ্গত কারণে তাহা মুদ্রিত হইবে না। অদূরবর্ত্তী প্রতিবেশী যে ভদ্রলোকেরা শ্রীশ্রীবাবামণিকে সিলেটে বাস করিতে পারেন নাই, তাঁহারা শিলচরে একটী অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—শিলচরে যদি কিল চড়ই

খাইতে হয়, তবে তার প্রতিদান আমি অন্য ভাবে দিব। এবার আমি অপরিচিত পথিক মাত্র। সহরে স্থানীয় কেউ আমার পরিচিত নেই। এক কয়লার দোকানের অস্থায়ী কর্ম্মচারী শিলংপট্টিতে বাস করেন, যাঁর বাড়ী হয় ফরিদপুর, নয় ঢাকা। তাঁর গৃহে উঠ্‌লুম এবং চারদিন থাক্‌লুম। তারপরে ছুটল পুপুন্‌কী, শরীর বড় ক্লান্ত।

সন্ধ্যা-সমাগমে কিছু সজ্জন-সমাগম হইল। একজন মুসলমান একটী ভক্তিমূলক গান করিলেন।

পরম সত্য জীবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মে আসে তেজ, সফলতা, শক্তি। জ্ঞানে আসে পরম নিশ্চিন্ততা, অভয়। ভক্তিতে আসে তৃপ্তি, শান্তি, নির্ভর। তিনটিই জীবের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় মহাবস্তু। একটীকে বাদ দিয়ে অন্যটীকে আলাদা ক'রে নেবার উপায় নেই। দুধে যেমন মাখন, চিনি, ছানা এই তিনটী জিনিষ আছে ব'লেই এটা শ্রেষ্ঠ খাদ্য, ঠিক তেমনি যে জীবনে কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞানের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েছে, সেই জীবনটীকে জানতে হবে শ্রেষ্ঠ জীবন, পুরুষোত্তমের জীবন, শ্লাঘ্যতম অবস্থার জীবন। যে জীবন কোনও সত্যকেই অস্বীকার করে না, জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেম-সমন্বিত সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনই পরম সত্য জীবন।

বিবাহ-প্রথার সংস্কার

একজন মণিপুরী ভদ্রলোক তাঁহাদের সমাজের বিবাহ-পদ্ধতির একটী বিবরণ দিয়া তাহার কতক কতক অংশের সংশোধনের কি সদুপায় আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজ-বদ্ধ জীবের সংসারটাকে ধ'রে রাখে মূলতঃ যেই অত্যাবশ্যকীয় একটী প্রথা, তাই হচ্ছে বিবাহ-বন্ধন। একদা মানব-সমাজে সমাজ-বদ্ধতা দানা বেঁধেছিল কিন্তু বিবাহ-প্রথার সৃষ্টিই হয় নি। কিন্তু কাল-সহকারে বিবাহ-রূপ একটী বন্ধনকে সাগ্রহে এবং সানন্দে স্বীকার ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হ'ল এবং সেই অনুভূতির মূল তাগিদ একদিক থেকে এল সাংসারিক জীবনে শান্তি লাভের দাবীতে, অন্য দিকে ভাবী সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত ও সুন্দর ক'রে তোলার কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়। বিবাহ তখন একটা সামাজিক উৎসবের সম্মান পেল। তখন থেকে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ নিন্দিত হ'তে লাগ্‌ল এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ অধিকাংশ স্থলেই বিরল হতে চল্‌ল। এই সব দেখেই বেশ বুঝা যায় যে, যা অতি আদিম কালে নিতান্তই জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় একটা সাময়িক সম্ভোগ মাত্র ছিল, তাকে ক্রমশঃ প্রকৃতির উন্নততর প্রকোষ্ঠে টেনে নেবার চেষ্টা মানবজাতি ক'রে এসেছেন। উন্নতি-সাধনের এই চেষ্টা দিনের পর দিন বর্দ্ধিততর ও সফলতর হবে, সভ্যতার বিকাশের কাছে এইটুকুই প্রত্যাশার উপযুক্ত। কিন্তু একটা সমাজে প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন, রূপান্তর বা পরিশোধন একজন আর দুজনের ইচ্ছায় হ'তে পারে না। এজন্য সহস্র জনের ইচ্ছাকে জাগ্রত, একাগ্র ও সক্রিয় করতে হয়। মুখের কথায় মানুষের এই সদিচ্ছাকে জাগ্রত করা সম্ভব নয়, তার জন্য বহু জনের জীবনব্যাপী ও ধারাবাহিক তপস্যার প্রয়োজন। সমুদ্র-তরঙ্গের মত সমাজের নৈতিক মানসিকতা কতবার অভ্রলেহী হবে, কতবার বা অতলের তলে ডুব্‌বে, তাতে ধৈর্য্য হারালে চল্‌বে না। অকুতোভয় উদ্যম চাই আর চাই অবিচলিত নিষ্ঠা। এক সমাজের লোক আর এক সমাজের লোকের মধ্যে গিয়ে সমাজ-সংস্কারের কাজ করতে পারে না। যিনি যেই সমাজের লোক, তিনি যখন সেই সমাজের সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হন, তখন সে চেষ্টা অনেকাংশে সফলতা আহরণে সমর্থ হয়।

সৎপথে থাকিয়া ব্যবসায়

অপর একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি দোকানদার। সহর থেকে এক সঙ্গে অনেক জিনিষ পাইকারী দরে কিনে আনি আর এখানে তা খুচরা দরে বেচি। পাইকারী দরে প্রত্যেকটা জিনিষের যে হার হয়, অবশ্যই আমি তার চেয়ে বেশী দামে জিনিষ বেচি। কিন্তু খরিদ্দার হাতে রাখ্‌বার জন্য বারংবার আমাকে বলতে হয় যে, এঁর কাছে আমি এক

বিবাহ-প্রথার সংস্কার

একজন মণিপুরী ভদ্রলোক তাঁহাদের সমাজের বিবাহ-পদ্ধতির একটী বিবরণ দিয়া তাহার কতক কতক অংশের সংশোধনের কি সদুপায় আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সমাজ-বদ্ধ জীবের সংসারটাকে ধ'রে রাখে মূলতঃ সেই অত্যাবশ্যকীয় একটী প্রথা, তাই হচ্ছে বিবাহ-বন্ধন। একদা মানব-সমাজে সমাজ-বদ্ধতা দানা বেঁধেছিল কিন্তু বিবাহ-প্রথার সৃষ্টিই হয় নি। কিন্তু কাল-সহকারে বিবাহ-রূপ একটী বন্ধনকে সাগ্রহে এবং সানন্দে স্বীকার ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হ'ল এবং সেই অনুভূতির মূল তাগিদ একদিক থেকে এল সাংসারিক জীবনে শান্তি লাভের দাবীতে, অন্য দিকে ভাবী সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত ও সুন্দর ক'রে তোলার কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায়। বিবাহ তখন একটা সামাজিক উৎসবের সম্মান পেল। তখন থেকে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ নিন্দিত হ'তে লাগল এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ অধিকাংশ স্থলেই বিরল হতে চল্‌ল। এই সব দেখেই বেশ বুঝা যায় যে, যা অতি আদিম কালে নিতান্তই জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় একটা সাময়িক সঙ্গসুখ মাত্র ছিল, তাকে ক্রমশঃ প্রকৃতির উন্নততর প্রকোষ্ঠে টেনে নেবার চেষ্টা মানবজাতি ক'রে এসেছেন। উন্নতি-সাধনের এই চেষ্টা দিনের পর দিন বর্দ্ধিততর ও সফলতর

হবে, সভ্যতার বিকাশের কাছে এইটুকুই প্রত্যাশার উপযুক্ত। কিন্তু একটা সমাজে প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন, রূপান্তর বা পরিশোধন একজন আর দুজনের ইচ্ছায় হ'তে পারে না। এজন্য সহস্র জনের ইচ্ছাকে জাগ্রত, একাগ্র ও সক্রিয় করতে হয়। মুখের কথায় মানুষের এই সদিচ্ছাকে জাগ্রত করা সম্ভব নয়, তার জন্য বহু জনের জীবনব্যাপী ও ধারাবাহিক তপস্যার প্রয়োজন। সমুদ্র-তরঙ্গের মত সমাজের নৈতিক মানসিকতা কতবার অভ্রলেহী হবে, কতবার বা অতলের তলে ডুববে, তাতে ধৈর্য্য হারালে চল্‌বে না। অকুতোভয় উদ্যম চাই আর চাই অবিচলিত নিষ্ঠা। এক সমাজের লোক আর এক সমাজের লোকের মধ্যে গিয়ে সমাজ-সংস্কারের কাজ করতে পারে না। যিনি যেই সমাজের লোক, তিনি যখন সেই সমাজের সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হন, তখন সে চেষ্টা অনেকাংশে সফলতা আহরণে সমর্থ হয়।

সৎপথে থাকিয়া ব্যবসায়

অপর একজন ভদ্রলোক বলিলেন,—আমি দোকানদার। সহর থেকে এক সঙ্গে অনেক জিনিষ পাইকারী দরে কিনে আনি আর এখানে তা খুচরা দরে বেচি। পাইকারী দরে প্রত্যেকটা জিনিষের যে হার হয়, অবশ্যই আমি তার চেয়ে বেশী দামে জিনিষ বেচি। কিন্তু খরিদ্দার হাতে রাখ্‌বার জন্য বারবার আমাকে বলতে হয় যে, ওঁর কাছে আমি এক

পয়সাও লাভ নিচ্ছি না। মনে মনে জানছি যে মিথ্যে কথা বলছি এবং এতে পাপ হচ্ছে, কিন্তু প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে না চল্লে ব্যবসা মার যাবে, পরে দোকান তুলে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তুমি যে সহর থেকে পাইকারী দরে জিনিষ কিনে নিয়ে আস এই রকম একটা ক্ষুদ্র গ্রামে, তার উদ্দেশ্য কি? প্রথমতঃ চুরি-ডাকাতি না ক'রে যাতে নিজের সংসারটী পালতে পার, ছেলেকে পড়াতে পার, মেয়েকে সৎপাত্রে বিয়ে দিতে পার, আর কালে ভদ্রে একবার কি দুই বার জীবনে কোনও প্রিয় তীর্থ দর্শন ক'রে মনে শান্তি পেতে পার। এতটুকুই যখন তোমার জীবনের কাম্য, তখন তুমি যেই দরে জিনিষ কিনেছ, তার চেয়ে কিছু বেশী দরে জিনিষ বিক্রয় কর্ত্তে নিশ্চয়ই অধিকারী। ঘরের কাছে দূরের জিনিষ পেয়ে ক্রেতারাও নিশ্চয়ই খুশী হচ্ছেন, সুতরাং তুমি দুই পয়সা দাম বাড়িয়ে বিক্রী কচ্ছ বলে তাঁরাও বোধ হয় তোমার উপরে অসন্তুষ্ট হবেন না। কিন্তু লাভ একবার আরম্ভ হ'লে লোভ এমন ভাবে বাড়তে থাকে যে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে দোকানদার দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, এমনকি দশগুণ দামে জিনিষ বিক্রী ক'রে ক্রেতাদের ক্ষতি করে। এমন ব্যবসায় নিশ্চয়ই পাপ। বিশেষ ক'রে খাদ্যশস্যের ব্যাপারে, যখন মনুষ্য বুভুক্ষু এবং খাদ্যাভাবে চতুর্দ্দিকে

অন্ধকার দেখছে, তখন খাদ্য সামগ্রী গোপনে দূরে সরিয়ে রেখে যারা মানুষকে অনশনে মরতে দেয়, তারা নিশ্চয়ই মহাপাপী। ব্যবসায় কর্ব্বে আর লাভ কর্ত্তে পার্ব্বে না, এমন কথা বলতে গেলে ব্যবসায় কেউ কর্ব্বে না। জগতে ব্যবসায়ীর প্রয়োজন ছিল ব'লেই বৈশ্য শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা বিপুল জ্ঞানার্জ্জন, দেশরক্ষা, খাদ্যোৎপাদন ও উৎপাদিত বস্তু সর্ব্বস্থানে বণ্টন সম্ভব ছিল না ব'লেই শ্রম-বিভাগের উপরে ভিত্তি ক'রে এক একটা শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু এক একজন এক এক রকম শ্রম করে ব'লেই তার সংসার-প্রতিপালনের রাস্তা বন্ধ ক'রে দিতে হবে, এমন কোনো যুক্তি হ'তে পারে না। ইতিহাসের বিবর্ত্তনের মুখে এমন সময় যদি কখনো আসে যে পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে বা সমগ্র পৃথিবীতেই ব্যবসায়-কর্ম্ম কেউ নিজ দায়িত্বে কর্ত্তে পার্ব্বে না, ব্যবসায় কর্ব্বেন রাষ্ট্র আর তোমরা থাকবে রাষ্ট্রের পোষ্য বা বেতনভুক্ কর্ম্মচারী, তখনও বিনা লাভে ব্যবসায় করা রাষ্ট্রের পক্ষে পোষাবে না। তোমাদের মতন কর্ম্মচারীদের প্রতিপালনের জন্যই উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়েও অধিক অর্থ নিয়ে রাষ্ট্রকে দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রী কর্ত্তে হবে। উৎপাদন-ব্যয় থেকে দাম কিছু বেশী নেওয়া হচ্ছে ব'লে কেউ রাষ্ট্রকে দোষী ব'লে সাব্যস্ত কর্ব্বে না, অবশ্য যদি মূল্যমান যথার্থ সঙ্গতিকে অতিক্রম না করে। ব্যবসায়ে নেমে

লাভ করা দোষের নয় কিন্তু তুমি সেই লাভের পরিমাণকে সঙ্গতির সীমা ছাড়িয়ে নিতে পার না, তুমি লাভ-লোভের দ্বারা পরিচালিত হ'তে পার না, তুমি অনর্থক ও ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা বলে গ্রাহককে প্রতারণা কত্তে পার না। অসত্য উচ্চারণ না ক'রেও যে ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায়, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

সতীত্ব বনাম সভ্যতা

অপর একজনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রগতিবাদীরা নারীর সতীত্ব-বোধকে এবং সতীত্বের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশত পুরুষের নানাবিধ আচরণকে প্রগতির অন্তরায় ব'লে মনে কর্ল্লেও এই কথাটি আমাদের প্রত্যেকের স্মরণে রাখতে হবে যে, নারীর একপরায়ণতার প্রয়োজন-বোধ নারীর ভিতরেই সর্ব্বপ্রথম জেগেছিল এবং তাদের অনুচ্চারিত সেই বোধকেই পুরুষেরা সমাজের বিধির মধ্য দিয়ে রূপ দিয়েছিলেন। জোর ক'রে পুরুষেরা নারীকে সতীত্বশালিনী হবার জন্য বাধ্য করেছে এবং অবিরাম মন্ত্রণা দিতে দিতে নারীর আদিম স্বৈরিণী-বৃত্তিকে সঙ্কুচিত কত্তে বাধ্য করেছে, একথা বল্লে অসত্য-ভাষণের দোষে দুষ্ট হতে হবে। সতীত্বের প্রয়োজন-বোধ নারীর ভিতরে তার স্বভাবেই জেগে উঠেছিল, কেননা নারী স্বভাবতই মমতাময়ী, স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী। স্নেহ, প্রেম, মমতার ধর্ম্ম হচ্ছে একটি বস্তুতে

মনকে সুদীর্ঘকাল লগ্ন ক'রে রাখা। এই তত্ত্বটী প্রাচীন ভারতের ঋষি-দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়েছিল। এই জন্যই ভারতীয় সমাজের মূলভিত্তি হচ্ছে নারীর সতীত্ব। ভারতীয় দৃষ্টিতে সেই দেশ বা সমাজই প্রকৃত সভ্য, যাদের ভিতরে নারীর সতীত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত। যে দেশে বা যে জাতিতে নারী যত অধিকতর সতীত্ব-সুষমায় মণ্ডিত, সেই দেশ বা সেই জাতি ভারতীয় দৃষ্টিতে তত মহত্তর ও উন্নততর। নারীর সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকারী পুরুষদের মধ্যে যদি কেউ বহুনারীরত থেকে থাকে, তবে সেটার জন্য নারীর মহত্ত্ব কমে যেতে পারে না। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার উগ্রমদিরা যারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পান ক'রে ধনবলগর্ব্বিত, বিজ্ঞানবলদর্পিত বা সৈন্যবলপরিস্ফীত জাতি-সমূহের নিকৃষ্ট আচরণের অনুকরণকে সভ্যতা ব'লে মনে করে, তারা প্রগতির পথে যা-কিছুকে বাধাদায়ক মনে কর্ব্বে, তাকেই ভেঙ্গে চুরে একাকার ক'রে দিতে চাহিবে, এটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই তথাকথিত প্রগতি নারীর সসম্ভ্রম জীবনকে দুরপনেয় বাধা ব'লে মনে কচ্ছে। তারা দেখছে যে, এই একটা বাঁধ ভেঙ্গে দিতে পারলে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিরাট সভ্যতার শক্ত কাঠামো দেখতে না দেখতে কলাগাছের তুচ্ছ একটা ভেলার ন্যায় ভাসতে ভাসতে বন্যার জলের প্রবল তোড়ে দিকচক্রবালের ওপারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এই জন্যই সভ্যতাভিমানী নবীন

প্রগতিবাদীরা নারীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে কাব্যে, সাহিত্যে লোকব্যবহারে এবং অনুভূতিতে জলচল ক'রে নেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। এই ক্ষ্যাপামিকে বিপ্লব বা রেনেসাঁস বলে ভ্রম করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

ব্যাপক সংযম-শিক্ষার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদের মধ্যে অত্যগ্র যৌন-কৌতূহল এসবের দ্বারাই সব চেয়ে অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে উদ্রিক্ত করা হচ্ছে। রসিকতা-প্রিয় অশিক্ষিত আত্মীয়-কুটুম্বেরা এবং মর্ম্মসখা ও নর্ম্মসখী-দলের স্বাভাবিক অনাবৃত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ফলে যেখানে যেটুকু হচ্ছে, তারপরে অতি প্রবল ইন্ধন যোগাচ্ছে এরা, এই প্রগতিবাদী কবি ও সাহিত্যিকেরা কিন্তু তার জন্য হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। এমন শিক্ষা এই সব বালক-বালিকাদিগকে আমাদের দেওয়া চাই, যেন বিচলিত ও পথভ্রষ্ট হবার হাজার রকমের কারণ থাকা সত্ত্বেও এরা কখনো না টলে। বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরা,—বিকারের হেতু থাকা সত্ত্বেও যাদের মনোবিকার আসে না, তারাই ত' প্রকৃত সংযমী। আমাদিগকে প্রাণপণ ক'রে সংযম শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে ব্যাপক ভাবে চালু করতে হবে। নারকীরা নরকোৎসব করতে চাইবে বলেই কি আমরা

ভগবানের সৃষ্ট এই সুন্দর ধরণীকে পাপের পঙ্কলে ডুবে যেতে দিব? কখনই না।

শিলচর

২৩শে মাঘ, বুধবার, ১৩৪১

(৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

যাহারা আমার করিছে বিরোধ

সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি শিলচর পৌঁছিলেন। ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই প্রথম যে উল্লেখযোগ্য সংবাদ শুনা গেল, তাহা এই যে, স্থানীয় আদালতের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা-দানের সংবাদ সম্বলিত বিজ্ঞাপন বিতরণ-কালে অনেক প্রসিদ্ধ উকিলের নির্দ্দেশে বিতরণ-কারীর হস্ত হইতে কিছু বিজ্ঞাপন কাড়িয়া নেওয়া হয় এবং সেইগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—ভালই হ'ল, যাঁরা কিছুতেই আমার সভায় বক্তৃতা শুনতে হয়ত আসতেন না, লক্ষণে মনে হচ্ছে তাঁরাও আসবেন।

শ্রীশ্রীবাবামণিকে জানান হইল, যে সকল পোষ্টার শহরের নানা স্থানে লাগান হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ কে বা কাহারা তুলিয়া নিয়াছে বা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—

যাহারা আমার করিছে বিরোধ
তাহারা শত্রু নয়,
শত্রুর বেশে মিত্র তাহারা,
কেন রে করিব ভয়?
আচরণে আর বচনে যে যাই হোক
ভবিষ্যতের ফলটুকু শুধু
দেখিবে আমার চোখ্;
যার যা বলার, যার যা করার,
বলুক, করুক,—সবই উপহার,
দীর্ঘ আমার যাত্রা-পথের
পাথেয় সুনিশ্চয়,
গ্রহণ করিব আনন্দ-ভরে
অনাস্ সবিস্ময়॥

অমৃতের সাথে মৃত্যুর কভু
কলহ হ'তে কি পারে?
মৃত্যু অমৃত হ'য়ে যায় বারে বারে।
যত বিদ্বেষ সব হয় শেষ,
শুধুই অমৃত অপার অশেষ,
ধ্বংসের যত তাণ্ডব-লীলা
সৃষ্টিতে পায় লয়,
বাধা ও বিঘ্ন করি' কলরব
গাহে সত্যের জয়॥

গলা সাধা দরকার

জানা গেল, শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের হেড্মাষ্টার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র পুরকায়স্থ মহাশয় তাঁহার স্কুলের হলটি চারি দিনের বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু অতি সুকৌশলে বিরুদ্ধ-প্রচার যে ভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে খুবই আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, হলটিতে জনতা হয়ত হইবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি এখানে রুজি-রোজগার করতে আসিনি। চাঁদা তুলতেও না। আমি এসেছি কয়েকটী অতি দরকারী সৎকথা বলতে, যা প্রত্যেকে জানে কিন্তু জেনেও জানে না। শ্রোতা যদি নাই হয়, খালি মন্দিরেই গলা সাধ্‌ব। এতে দুশ্চিন্তার কি আছে? গায়ক, বক্তা ও অভিনেতা এদের তিন জনের গলা সাধা খুব দরকারী কাজ।

বক্তার কি কি প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমার কথার মানে বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছ না। মানে হচ্ছে এই যে, গায়ক, বক্তা, অভিনেতা এই তিন জনেরই সর্ব্বপ্রথমে চাই একটুখানি রূপ। অর্থাৎ চেহারাখানা এমন হওয়া চাই, যেন দেখা-মাত্র দর্শক ও শ্রোতারা আকৃষ্ট হন। যিনি যেই তত্ত্বের প্রচারক, তাঁর অন্তরের ভিতরে সেই তত্ত্ব যদি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি রূপে জলজ্বল্ ক'রে জ্বলতে থাকে, তবে মেইক-আপ থাকুক আর

না থাকুক, তাঁকে দেখে দর্শক ও শ্রোতাদের মনের ভিতরে ভাবের তরঙ্গ খেলতে থাকে। কথায় বলে,—আগে দর্শনধারী, পিছু গুণ-বিচারী। পরবর্তী প্রয়োজনটী হচ্ছে উপযুক্ত কণ্ঠ-স্বরের। যে যেমন নিখুঁত ভাবে কণ্ঠের সাধনা করে, তার কণ্ঠ-স্বর তেমন হৃদয়-গ্রাহী চিত্তদ্রাবী প্রাণাকর্ষী হয়। তারপরেই প্রয়োজন বাচন-ভঙ্গীর কৌলীন্য বা ভেলিভারি। সর্ব্বশেষে প্রয়োজন বা সত্যি ক'রে বলতে গেলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হচ্ছে বক্তব্য বিষয়ের মহত্ত্ব ও উপযোগিতা। আমার বক্তব্য বিষয়ের ভিতরে যদি সত্যিকারের আবশ্যকীয় কিছু থাকে, তবে জনহীন হলের শূন্য চেয়ার আর বেঞ্চিগুলি বিদেহী শ্রোতায় পূর্ণ হবে এবং নিষ্প্রাণেরা প্রাণ পাবে।

শিলচর

২৪শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

(৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

এই সহরে দর্শনার্থীর ভিড় নাই। দুই একজন যে একটু উঁকি মারিয়া দেখিবার জন্য আসেন নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদের সংস্পর্শ হইতে কেবল একটী সন্দেহই বদ্ধমূল হইল যে, একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা মানুষের আগমনকে যেন উৎসমুখেই থামাইয়া দিতেছে। আতিথ্যদাতা মনে মনে একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমি ত' বুঝি, ভালই হয়েছে। অনেক চিঠি জমে আছে। এই অবসরে সেগুলির মধ্যে কয়েকটীর প্রতি কর্তব্য পালন ক'রে পার্ব্ব।

সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য্য পরিণতি

ঢাকা-নরসিংদী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যতই দিন যাইতেছে, ততই লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িকতা নিদারুণ ভাবে দেশের মানুষগুলির মনকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্র যে এক কথা নহে, ধর্ম্ম যে রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ হইতে পারে, রাষ্ট্র যে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইতে পারে, সকল ধর্ম্মের মূল লক্ষ্য যে এক, এক ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত অপর ধর্ম্মাবলম্বীর যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীয় ব্যাপার নিয়া কলহ হওয়া উচিত নহে, ধর্ম্মীয় ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য এই দুইটা জিনিষ যে কদাচ সমার্থবাচী হইতে পারে না, স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ যে সকল ধর্ম্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাইতে পারে, এই সকল বিষয়ে জাতির তথাকথিত পথপ্রদর্শকদের ভ্রান্তি ও দূরদৃষ্টিহীনতা দেশের প্রত্যেকটী সমস্যাকে সমাধানের অতীত এক দুরূহ পর্য্যায়ে নিয়া ফেলিতে চলিয়াছে। ফলে অনেক দীর্ঘশ্বাস এদেশবাসীকে ফেলিতে হইবে, অনেক আর্ত্তনাদ সকলকে করিতে হইবে, গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রে, মেঘনা-পদ্মা-শীতললক্ষায় অনেক শোণিত তর্পণ করিয়া ইহাদের জলে হোলি খেলার রং চড়াইতে হইবে। সেই দিন কত দূরে,

তাহা বলা কঠিন কিন্তু সেই নিদারুণ দিনটী এদেশবাসীর এক অনিবার্য্য দুর্ভাগ্য। চারিদিকে খোলা চক্ষে তাকাও এবং নিজেদের মনকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ হইতে মুক্ত রাখিবার জনাই উদাত্ত-কণ্ঠে ব্রহ্মগায়ত্রীর পাবন-মন্ত্র জপিতে থাক। কত কত বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব যাইবে, আসিবে, সমুদ্র-তরঙ্গের মত উঠিবে আর ডুবিবে, অটল হিমাদ্রির মতন সুস্থির হইয়া তোমরা তোমাদের নিজস্ব সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাক। সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য্য পরিণতি অন্ধতা এবং অনন্ত-কোটি যুগব্যাপী অন্ধকার।"

প্রকৃত উন্নতি

ঢাকা জেলান্তর্গত দিঘলী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার অনন্ত আশীর্ব্বাদ তোমাদের উন্নতি। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনে উন্নতি লাভ কর। উন্নতির মানে নিজের উন্নতির সাথে জগতের উন্নতি, জগতের উন্নতির সাথে নিজের উন্নতি। একাকী যে উন্নতি, তাহা উন্নতি নহে। সে উন্নতি দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না, পারিপার্শ্বিক চতুর্দ্দিক হইতে টানিয়া নামায়। সকলকে লইয়া ওঠ, সকলকে লইয়া জাগো, সকলকে লইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্ববিধ কুশল ভাগ করিয়া ভোগ কর। একাকী বিজয়-অভিযান করিয়া তৃপ্ত হইও না, সকলকে লইয়া চল। একাকী বড় হইয়া সম্ভোগ অর্জ্জন করিও না,

সকলকে সমভাবে মহত্ত্বের ভাগ দিয়া তাহাদেরও কৃতার্থ কর, নিজেও কৃতার্থ হও।"

পতিতকে উত্থান লাভের সুযোগ দাও

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত নেত্রকোণা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমাকে কাহারও বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিও না, কারণ কাহারও বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগের কথা বিশ্বাস না করিবার আমার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই রহিয়া গিয়াছে। কেহ দোষী, অপরাধী, ঘৃণিত বা পাপী বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবারও আমার ক্ষমতা নাই, জানিও। আজ যে চুরী করিতেছে, কাল সে সাধু হইবে না কিম্বা সদুপায়ে অর্থার্জ্জন করিয়া তাহাই অকাতরে দান করিতে থাকিবে না, একথা তুমি কি করিয়া বলিতে পার? পরস্বাপহারী রত্নাকর দস্যু জগতে বহুবার যে বাল্মীকি হইয়াছে, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আজিকার গণিকা কন্যা হয়ত পরমা ভাগবতী এবং দোষহীনা বৈষ্ণবীতে পরিণত হইতে পারে। আজিকার অসতী কন্যা হয়ত সতীকুলেরও পূজনীয়া হইতে পারে। কেহ দোষ করিয়াছে বা করিতেছে বলিয়াই তাহাকে বর্জ্জন করিব, ইহা আমার মনের রুচি নহে। বরঞ্চ সে দোষ মুক্ত হইবার জন্য কত ভাবে সাহায্য

পাইতে পারে, আমি তদ্বিষয়ে আমার চিন্তা, চেষ্টা ও অভিনিবেশকে প্রয়োগ করিব। বুদ্ধ-খীষ্ট-চৈতন্য প্রমুখ ত্রিলোকপাবন মহাপুরুষগণের আচরণের প্রতি দৃষ্টি দাও। তাঁহারা পাপকে অবাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিলেও পাপীকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন নাই। পাপীকে তাঁহারা কোল পাতিয়া নিয়াছেন, বুকে তুলিয়া ধরিয়াছেন, স্নেহের অমোঘ স্পর্শে নবজীবনের আস্বাদন দিয়াছেন, প্রেমের বলে তাহাদের প্রাণের কলুষ বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন। মীন ও মুক্তাই সমুদ্রের একমাত্র আশ্রিত নহে, নক্র-কুম্ভীরও সমুদ্রেই থাকিবে। সমুদ্রবৎ বিশাল ক্ষমা দিয়া ছোট-বড় ভাল-মন্দ পাপী-পুণ্যবান্ ধনি-দরিদ্র বাল-বৃদ্ধ পুরুষ-নারী সকলকে আমি আমার স্নেহের বক্ষে ঠাঁই দিব। তবে অসৎকে সৎ হইবার জন্য, দুষ্টকে শিষ্ট হইবার জন্য, কুক্রিয়া-সক্তকে সদাচারী হইবার জন্য, স্বার্থপরকে পরার্থপর হইবার জন্য, আত্মতোষণকারীকে পর-সেবায় উন্মুখ হইবার জন্য বাধ্যও আমি করিব। ভগবানের অমৃতময় পাপহারী নাম ইহাদের পাপ-মুক্তিতে সহায়তা করিবে বলিয়াই আমি ইহাদিগকে তাঁর নামে দীক্ষিত দেখিতে চাহি। গঙ্গাজলে যদি একমাত্র পুণ্যবানেরই অবগাহন করিবার অধিকার থাকিত, পাপী, তাপী, অপরাধীরা যদি ঐ পুণ্য সলিলের স্পর্শ পাইতে বঞ্চিত হইত, তাহা হইলে গঙ্গোদকের কোনও মহিমাই জগতে থাকিত না। পাপীকেও সমান আদরে স্নেহের কোলে তুলিয়া নেয় বলিয়াই

গঙ্গা-প্রবাহের এত মর্য্যাদা। তোমরা দৃঢ় হইবে, ইহা ভাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উদারও হও। তোমরা নিজেদের পবিত্রতার সম্বন্ধে সুস্থির থাকিবে, ইহা ভাল, কিন্তু অন্য অপবিত্রতাকে পবিত্রতার পথে আসিতে বাধা কেন দিবে?

নাম পতিত-পাবন

"মঙ্গলময় নাম সর্ব্বপাপের হারক। এই নামের যে আশ্রয় লয়, আস্তে আস্তে পাপ তাহাকে পরিত্যাগ করে। নামের সেবায় রত হইলে ক্রমশঃ চোরের চৌর্য্য-প্রবৃত্তি হ্রাস পায়, অসতের অসৎ-প্রবৃত্তির নাশ হয়, পরনারী-সেবক দুশ্চরিত্র পুরুষের মন উপপত্নীর উপর হইতে আপনা আপনি সরিয়া আসে, পরপুরুষ-সেবিকা দুঃশীলা রমণীর মন উপপতির প্রতি বিরাগ-সম্পন্ন হয়, স্বার্থান্ধ আত্মপরায়ণ ব্যক্তির মন ক্রমশঃ পরসেবার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই অভ্রান্ত অকাট্য সুনিশ্চিত সত্য সম্পর্কে তোমরা উদাসীন বা অবিশ্বাসী হইও না।

গণিকাকে দীক্ষাদানে বিপত্তি

"তবে, পাপী-তাপীকে নির্ব্বিচারে জীর্ণ করিবার ক্ষমতা সকল গুরুর থাকিতে পারে না। যাহার সে ক্ষমতা নাই, সে যেন এইরূপ ভয়ঙ্কর ব্যসনে প্রমত্ত না হয়। একধার হইতে গণিকা-কুলকে দীক্ষা দিয়া যাইবার ফল যদি ইহা দাঁড়ায় যে, কুললক্ষ্মীরাও ইহাদের সংস্রবে আসিয়া ক্রমশঃ সাধারণ

গণিকাদের হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র ও রীতি-নীতির অনুসরণ করিয়া নরকের পথেই অগ্রসর হইবে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী গুরুই হইয়া থাক, তোমাকে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে। গণিকারা আসিয়া দলে দলে দীক্ষাও নিবে আবার গণিকাবৃত্তিরই অনুশীলন করিয়া যাইবে, কোনও গুরুর পক্ষেই ইহা গ্রহণযোগ্য অবস্থা নহে। এই অবস্থার পরিবর্তন যাহার ক্ষমতায় নাই, সে কেন গণিকাকে দীক্ষা দিবে?

গণিকার দীক্ষা লাভের অধিকার

'তবে, আর একটা দিকও আছে। কেহ হয়ত গণিকার পথ ছাড়িয়া এই পথে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, এমনই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া আছে। চতুর্দ্দিকের পুঞ্জীকৃত বাধা অপসারিত করিয়া চলিয়া আসিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এমতাবস্থায় সকলে তাহাকে বর্জ্জন করিলেও ঈশ্বর কি তাহাকে বর্জ্জন করিবেন? সকলের যিনি স্রষ্টা, সেই পরমপ্রভুর পবিত্র নামের আশ্রয় সে কি পাইতে পারিবে না? সকল বাধা ঠেলিয়া সবল মেরুদণ্ডে সে যে দাঁড়াইবে, বল, সেই মনোবল সে কোথায় পাইবে? সকলে যাঁহাকে ডাকিয়া প্রাণের দুর্ব্বলতা দূর করে, কেন সে তাঁহাকে ডাকিতে পারিবে না? হয়ত সে নিজের দোষে গণিকা হয় নাই। হয়ত সে নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও সৎপথে ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে না। হয়ত

সে সুযোগ পাইলেই সাধু-জীবন যাপন করিবে। হয়ত সে অনুকূল সুযোগ পায় নাই বলিয়াই কদাচারের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না। হয়ত সে নিজের অনিচ্ছায় দিনের পর দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় ভগবানের নাম পাইবার অধিকার হইতে যদি সে বঞ্চিতা হয়, তাহা হইলে সে যে আর শত জন্মেও উঠিতে পারিবে না। অনন্ত কাল কেহ কেবল নরকেই পচিয়া মরুক, ইহা কি, তোমাদের কাম্য হইবে? সুতরাং ভগবানের নাম পাইবার অধিকার তাহার জন্য স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু জীবন-যাপন-প্রণালী সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বিধায় তাহাকে সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত সামাজিক ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। ইহাই হইতেছে এই উভয়-সঙ্কটের সমাধান। তোমরা স্থির চিত্তে এই কথাটি চিন্তা করিয়া দেখিও।

সমাজের জারণ-শক্তি বর্দ্ধন

'সমাজের ভিতরে জারণ-শক্তি কি করিয়া বাড়ে, তাহা তোমরা চিন্তা কর। কেহ একবার পতিত হইয়াছে বলিয়াই পুনরায় সমাজের বুকে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না, এই সর্ব্বনাশা বয়কটের নীতি তোমরা পরিত্যাগ কর। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর কন্যাকেও তোমরা নিজ নিজ গৃহে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে তুলিয়া আনিবার সাহস অর্জ্জন কর। বিবাহের

দ্বারা যে নারী বা পুরুষের নবজন্ম হয়, এই কথা তোমরা স্বীকার কর। যে তোমাদের গৃহে পুত্রবধূ হইয়া আসিতে চাহে, সে যদি সন্নীতি, সচ্চিন্তা, সজ্জীবন গ্রহণ করে, তোমরা দ্বিধাহীন চিত্তে তাহার সমগ্র অতীত বিস্মৃত হইয়া যাইবার মত উদার মনোবৃত্তি অর্জ্জন কর। চেষ্টা কর, যাহাতে জগতের যত পতিত, যত পাতকী, যত সমাজবহির্ভূত, যত ভিন্ন-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারী সব নিজ নিজ জীবনে পবিত্রতার ব্রতকে অক্ষত ভাবে প্রতিপালনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া তোমাদের সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসে। অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহকে তোমরা ভয় পাইও না, ইহাতে সত্য সত্যই জাতিধ্বংস হয় না। অতীতে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সহস্র সহস্র অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ করিয়াছিলেন। ইতিহাস-রক্ষণে অনভ্যস্ত আত্মবিস্মৃত জাতি তোমরা, এই জনাই সেই সহজ সত্যকে আজ বিশ্বাস করিতে তোমাদের সাহস নাই। কিন্তু যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য। অতীতেও যেমন তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অসবর্ণ ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহে ক্ষতি হয় নাই, ভবিষ্যতেও তেমন হইবে না। কিন্তু সে কার্য্য করিতে হইবে নিজের অক্ষকেন্দ্রে দাঁড়াইয়া। নিজের অক্ষরেখা পরিত্যাগ করিয়া তোমরা অসবর্ণ বা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ করিবে না। নিজ অক্ষরেখাকে লঙ্ঘন করিয়া তোমরা পাপী, তাপী, নীচ, অসৎ বা দুর্জ্জনকে গণ্ডীর ভিতরে টানিয়া আনিবে না,—ইহা থাকিবে তোমাদের প্রধান লক্ষ্য। তোমাদের

অক্ষকেন্দ্র হইতেছে ভগবানে পরম বিশ্বাস, তোমাদের অক্ষরেখা হইতেছে সামাজিক এবং পারিবারিক প্রত্যেকটী আচরণের মধ্যে পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠা করা। একথা না ভুলিলে তোমাদের ধ্বংস নাই কিছুতেই।"

ক্ষিপ্ত জনতার গুণ্ডামিতে কর্ত্তব্য

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত জামালপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসা এবং দলবদ্ধ আক্রোশ বা গুণ্ডামির মধ্যে কতকগুলি মারাত্মক পার্থক্য রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেই দল, সম্প্রদায় বা জাতি লইয়া এইরূপ দলবদ্ধ গুণ্ডামি হইয়াছে এবং গৃহদাহে, লুণ্ঠনে, নারী-ধর্ষণে, শিশু-হত্যায় এবং অপরাপর অকথনীয় পাশবিকতায় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে। ব্যক্তিগত দ্বেষ বা প্রতিহিংসা উভয় পক্ষের মন-খোলা আলোচনার দ্বারা অনেক সময়েই শান্ত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি মীমাংসার সর্ত্তগুলি পালনের চেষ্টা প্রায় সর্ব্বক্ষণই করিয়াছে। কিন্তু দলবদ্ধ প্রতিহিংসা যখন জনতার হাতে গিয়া পড়িয়াছে, কোনও সুসংবদ্ধ সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল সঙ্ঘের শাসনের সীমাকে মানিয়া চলিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই, সেই সময়ে তুমি একদল লোকের সঙ্গে আপোষ করিয়া যেই মুহূর্ত্তে নিশ্চিন্ত হইয়াছ, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই হয়ত অপর একদল লোক ক্ষিপ্ত

প্রতিহিংসা লইয়া তোমাকে, তোমার গৃহকে, তোমার পরিজনবর্গকে, তোমার মাতা, ভগিনী, পত্নী ও কন্যাকে, তোমার নিষ্পাপ নিরপরাধ শিশুদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তখন আবার তাহাদের সহিত নূতন করিয়া আপোষ করিতে তুমি চেষ্টিত হইতে পার, কিন্তু জনতা কোনও সময়েই নেতার নেতৃত্ব মানে না। এই জনতার নেতাকে যখন তুমি বিপুল অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়া শান্ত করিতে যাইতেছ, ঠিক্ সেই সময়েই হয়ত ইহার দলভুক্ত অপর ব্যক্তি তোমার পুত্রের মস্তকে লগুড়াঘাত করিল, মাতাকে বিবস্ত্র করিল, পত্নীর হস্তদ্বয় কাটিয়া লইল, কন্যাকে বলাৎকার করিল, শিশু-পুত্রকে শূলে বিদ্ধ করিয়া উন্মত্ত জনতার উৎসাহ-প্রবর্দ্ধনের জন্য প্রদর্শনী-রূপে স্কন্ধে বহিয়া রাস্তায় টহল দিতে বাহির হইল। এগুলি কল্পনাও নহে, উপন্যাসও নহে। এগুলি ইতিহাসে লিখিত সত্যিকার ঘটনা। বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল জনতা এক যুগে পৃথিবীর এক প্রান্তে একবার যাহা করিয়াছে, অপর যুগে পৃথিবীর অপর প্রান্তে সুযোগ-সুবিধা-মত শত শত বার তাহাই করিবে। জনতার মনোবৃত্তি পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল যুগেই প্রায় একরূপ। একাকী যে ব্যক্তি হয়ত তোমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে পরিধেয় বস্ত্রকে মলমূত্রত্যাগে কলুষিত করিত, উন্মত্ত জনতার মধ্যে পড়িয়া সে দুঃসাহসী হইয়াছে, সে আজ তোমার সমক্ষে তোমার মাতা, ভগিনী, কন্যাকে উৎপীড়ন করিতে

তবু বোধ করা ত' দূরের কথা, দ্বিধা পর্য্যন্ত বোধ করিবে না। সুতরাং জনতার গুণ্ডামি প্রবল হইলে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অর্থ দিয়া তোষণ প্রভৃতি কাপুরুষোচিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের আত্মরক্ষার অধিকারকে চূড়ান্ত ভাবে ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত হওয়া সঙ্গত। ইহাদিগকে উত্তেজিত করিবার মত কার্য্য হইতে গোড়া হইতেই নিজেদিগকে বিরত রাখিতে হইবে, কেননা তোমার প্রয়োজন আত্মরক্ষা, অপরকে আক্রমণ করা নহে। কিন্তু লুণ্ঠন ও গৃহদাহ প্রভৃতি অসৎ-কার্য্যের সঙ্কল্প লইয়া যাহারা গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ঢিল না ছুড়িলেও তাহারা অভিযোগ করিবে যে তোমার শিশু কন্যা ছাদের চিলকোঠা হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের সব চেয়ে বড় সর্দ্দারের একটা চক্ষু অন্ধ করিয়া দিয়াছে, সুতরাং তাহার প্রতিশোধ-স্বরূপে তাহারা তোমার শিশু কন্যার চক্ষু উৎপাটন করিবে। প্রস্রবণের ঊর্দ্ধ স্থানে অবস্থিত নেকড়ে বাঘের জল যেমন করিয়া প্রস্রবণের নিম্ন দেশে অবস্থিত ছাগশিশু ঘোলা করিয়াছিল বলিয়া প্রাণ হারাইল, ব্যাপার তদ্রূপ হইবে। তুমি শান্ত, শিষ্ট ও সংযত ভাবে নিজেকে সামলাইয়া চলিয়াছ বলিয়াই বাঁচিয়া যাইতে পারিবে, ইহা তোমার অতীব ভ্রান্ত ধারণা। লুণ্ঠনের সঙ্কল্প লইয়া যাহারা গৃহ ছাড়িয়াছে, তাহাদের লুব্ধ চিত্ত তোমার সহস্র সংযম সত্ত্বেও তোমার বিরুদ্ধে একটী গুরুতর অভিযোগ সৃষ্টি করিবে এবং তাহার সত্যতা বা

সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য তোমাকে সুযোগ-মাত্রও না দিয়া তোমার গৃহ আক্রমণ করিবে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ থাকিবে, তাহারাই বাঁচিবে, অপরেরা মরিবে। প্রাণপণে সংযত থাকিলেও তারপরে যদি আক্রান্তই হও, তাহা হইলে জানিবে যে আক্রমণকারীর পায়ে পড়িলেই আত্মরক্ষা করা যায় না, ইজ্জৎও যায়, প্রাণও যায়, কিছুই রক্ষা পায় না। গৃহস্থিত প্রত্যেকটী প্রাণীর জীবনের নগদ মূল্য গণিয়া গণিয়া গ্রহণ করিবার পরে নোটের তাড়া পকেটে ভরিবার পরক্ষণেই যে তাহারা তোমাদের জীবনের উপরেই আক্রমণ চালাইবে না, এতটা বিশ্বাস গুণ্ডাদিগকে করা চলে না। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রীতির অনুশীলন তোমরা প্রত্যেকে কর, যাহার ফলে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডামি দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়। কিন্তু যেরূপ ক্ষিপ্ততা আসিলে গুণ্ডাদল দলবদ্ধ হইয়া অকারণে মানুষের প্রাণহানি নারীর সতীত্বহানি, শিশুকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, পরস্ব-লুণ্ঠন প্রভৃতি অপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার অধিকার অস্বীকার করার মত মূর্খতা আর কিছু নাই।

জনতার মনোবৃত্তি

"যাহার ধর্ম্মের শিক্ষা যতই মহৎ হউক, কিন্তু জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহারা লুণ্ঠন-পরায়ণ গৃহদাহরত জনতার অঙ্গ-বিশেষ বলিয়া নিজেদিগকে স্বীকার করিয়া লয়, তাহাদের

চক্ষু হইতে লজ্জার আবরণ খসিয়া পড়িয়া যায়। নিতান্ত লম্পট ব্যক্তিও যে কার্য্য গোপনে করে, প্রাত্যহিক নেশা-ভাং এর সঙ্গীকে একটু সমীহ করিয়া তবে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এই বেপরোয়া নির্লজ্জ মুহূর্ত্তে সহস্র জনের সমক্ষে তদ্রূপ আচরণ করিতে আর বিন্দুমাত্র লজ্জা-সঙ্কোচ তাহার আসে না। লুণ্ঠনরত গুণ্ডারা যে অতি প্রকাশ্যে নারী-ধর্ষণ করে, শিশু বালিকার উপরে বলাৎকার করে, তাহার মনস্তত্ত্বটা এই। সবাই যেখানে পশু হইয়াছে, সেখানে প্রকাশ্যে পশুবৎ আচরণ করিলে লজ্জা কিসের? এক পশু অপর পশুকে সঙ্কোচ করিয়া চলিবে কেন? সাধারণ সময়ে মানুষ নিজের পশুত্বটাকে ঢাকিয়া রাখিয়া অপরের নিকটে নিজেকে মানুষ বলিয়া পরিচিত করিতে যত্ন নেয়। কিন্তু ইহা ত' সাধারণ মুহূর্ত্ত নহে। এখন যে সবাই পশু, এখন যে প্রত্যেকে নিজ নিজ পশুত্বের চূড়ান্ত উৎকর্ষ অপরকে প্রদর্শন করিয়াই বাহবা পাইতে চায়, এই সময়ে কামোত্তেজনা না থাকিলেও নারীর অমর্য্যাদা করিতে হইবে, কোনও রমণী পায়ে পড়িয়া ইজ্জৎ রক্ষার জন্য আকুল ক্রন্দনে বুক ভাসাইলেও তাহার প্রতি একটা অমার্জ্জনীয় ব্যবহার করিতেই হইবে। নতুবা যে, এই মাত্র অপর যাহারা নারীর প্রতি অতি অকথ্য ব্যবহার করিয়া সকলের করতালিতে অভিনন্দিত হইল, তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বাহবা পাওয়া যাইবে

না। কিন্তু জনতার ইহাই মনোবৃত্তি। ইহাদের নিকটে যাহারা দয়া, দাক্ষিণ্য বা সদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করে, তাহারা মূর্খ। যে ব্যক্তি কিছুকাল পরে নিজ গৃহে ফিরিয়া গিয়া নিজের শান্ত মুহূর্তে প্রাণের অনুতাপে দগ্ধ হইবে যে, কেন সে নারীর মর্যাদা লঙ্ঘন করিল, শিশুর প্রতি কেন সে পাশবিক ব্যবহার করিল, জনতার দলে ভিড়িয়া সে আজ এমন পিশাচ হইয়াছে যে, বেদ, কোরাণ, বাইবেল সবকিছু তাহার হাতে ধরিয়া অনুনয় করিলেও সে তোমার মাতা, ভগিনী, কন্যা ও পত্নীকে সসম্মানে অব্যাহতি দিবে না। ইহাই জনতার মনোবৃত্তি। অতীব উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও কিন্তু জনতায় ভিড়িয়া গেলে এমন দানবে পরিণত হইবে, যাহার চির-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা একটী নিমেষে উড়িয়া গিয়া তাহাকে একটী বন্য বর্ব্বরে পরিণত করিবে। সুদূর অতীতের গুহাবাসী মানব যখন নারীমাত্রকেই দেখিতে পাইলে তাহাকে চুলের মুঠায় ধরিয়া আনিয়া জোর করিয়া ধর্ষণ করিত, বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার গর্ব্বকারী মার্জ্জিত-রুচি মহান্ ব্যক্তিও জনতার ভিড়ে পড়িয়া সেই অতীত যুগে ফিরিয়া যায়। তাহার নিকটে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দীর্ঘ-কালব্যাপী চারিত্রিক অনুশীলন সব এক নিমেষে ব্যর্থ হইয়া যায়। কেননা, ইহা জনতার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলগামী অপরাধানুষ্ঠানে রত জনতার উপরে বিশ্বাস করিয়া যে নিজের আত্মরক্ষার অধিকার ত্যাগ করে, সে নিদারুণ মূর্খ।"

যৌবনকে ধরিয়া রাখার উপায়

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত সরিষাবাড়ী-নিবাসী জনৈক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যুবক-মাত্রেরই কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তোমার যৌবনকে তুমি যত দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতে পারিবে, ততই তুমি জগতে অধিকতর পরিমাণ এবং কৌলীন্যের দিক্ দিয়া বিশেষ ভাবে গণনীয়তর কাজ করিয়া যাইতে পারিবে। সুতরাং কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত থাক যেন তোমার দেহ, মন ও বাক্য কদাচ পাপ-পথে প্রধাবিত না হয়। যৌবন সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই ত' ইহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টার প্রয়োজনীয়তাটা সকলের চেয়ে বেশী। যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে হইলে সদাচারী, সচ্চিন্তক ও সৎকর্ম্মান্বিত হইতে হইবে, কদাচার, কুচিন্তা ও কুক্রিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে হইলে জীবনের লক্ষ্যকে অতীব উচ্চে তুলিতে হইবে এবং সেই লক্ষ্য যে তোমার দ্বারা আয়ত্ত সুনিশ্চিতই হইতে পারে, এজন্য অন্তরে অফুরন্ত আস্থা, উৎসাহ ও আশা সঞ্চারিত করিতে হইবে। আদর্শ-স্বরূপ জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলিকে অনুধ্যানের মধ্যে দিয়া নয়ন-সমক্ষে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যাহা করিয়া ধন্য ও বরেণ্য হইয়াছেন, তুমি ত' তোমার জীবনে তাহা করিবেই করিবে, সম্ভব হইলে

কর্ম্মকৌলীন্যে ইঁহাদের অনেককে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্যও চেষ্টা যে করিতে হইবে, ইহা মনে রাখিও। উন্নতির ইতিহাসে কোনও মহাপুরুষের জীবনই একটী পূর্ণচ্ছেদ বা ফুলষ্টপ নহে, ইঁহারা কেহ কমা, কেহ সেমিকোলন। তোমাকে ইঁহাদের চাইতেও মহত্তর হইতে হইবে। অবিরাম এইরূপ সঙ্কল্প করিতে করিতে তোমার দেহ-মনের অভ্যন্তরে তোমার সম্পূর্ণ অগোচরে এক অসাধারণ দিব্যায়ন ঘটিয়া যাইবে, যাহা তোমার যৌবনকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিবে। একথায় যদি সত্যতা না থাকিত, তবে আমি কদাচ ইহা তোমাকে লিখিতাম না। কাব্যের কাকলি আমার লেখনীতে নাই, আছে সত্যের ঝঙ্কার।"

নারীর সতীত্ব, অকালমৃত্যু ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা

বর্দ্ধমান খণ্ডঘোষ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের কাছ হইতে যত সময়ে যত রকমের দুঃসংবাদ আমার নিকটে আসিয়া থাকে, তন্মধ্যে আমি নারীর উপরে ধর্ষণ এবং শিশুদের অকালমৃত্যু, এই দুইটী সংবাদকে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক বলিয়া গণনা করি। যে সমাজের পুরুষেরা বাঁচিয়া থাকিতে নারীর উপরে বলাৎকার সম্ভব হয়

এবং নারীরা বলাৎকৃতা হইবার পূর্ব্বে বলাৎকারকারীর কণ্ঠনালী দাঁত দিয়া চাপিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারে না, সেই সমাজের পরিবেশে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত হইয়া আজও সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বাস করিতেছি বলিয়া অন্তরে নিদারুণ ঘৃণা ও ধিক্কার আসিয়া থাকে। আর যেই সমাজে সুকুমার শিশু সকলের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে না, শরতের শেফালীর ন্যায় উষাসমাগমের স্বল্পকাল আগে ফুটিয়া উষা-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ঝরিয়া পড়িয়া যায়, সেই সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বড়ই আতঙ্কিত হই। যেমন করিয়া জন্মদান করিলে জন্মলাভের পরে সন্তান কিছুতেই অকালে মরিবে না, মাতা ও পিতারা সেই তত্ত্ব জানে না বা নিজেরা গবেষণা দ্বারা সেই তত্ত্ব আবিষ্কারে যত্নবান্ হয় না দেখিয়া মর্ম্মাহত হই। জৈব প্রকৃতির উদ্দামতারই তাড়নায় অকস্মাৎ স্বামি-স্ত্রীতে দৈহিক মিলন সাধন না করিয়া প্রবৃত্তিকে করধৃত কশাবৎ স্বেচ্ছানুসারে চালাইবার সামর্থ্য লইয়া তারপরে মিলিত হইলে এবং উভয়ের দৈহিক ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিলে ইহা দ্বারা সন্তানের অকাল মৃত্যুর মৌলিক প্রতিষেধের ব্যবস্থা হইতে পারে। সন্তানগুলিকে প্রতিপালনের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া জনক যদি সেই বিষয়ে অভিনিবেশ দিতে স্বীকৃত হন এবং মাতা যদি প্রত্যেকটী গৃহকর্ম্মকে সন্তানের দীর্ঘ পরমায়ু

প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষার অধীন করিয়া নিজ সংসারী কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহা হইলেও সন্তানের অকাল-মৃত্যুর সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কিন্তু অকাল মৃত্যুর এমন কতকগুলি দেশব্যাপী কারণ রহিয়াছে, যাহা কোনও ব্যক্তির চেষ্টায় বা একটা সঙ্ঘের চেষ্টায় দূর হইতে পারে না। যথা, ম্যালেরিয়া, উপদংশ প্রভৃতি শক্তিহারক ব্যাধি, অন্নের স্বল্পতা, দেশবাসীর চিরদারিদ্র্য ইত্যাদি। এজন্য রাষ্ট্র-শক্তির প্রয়োজন। যে রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা নিজেদিগকে প্রজা সাধারণের ভৃত্যজ্ঞানে তাহাদেরই সেবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত পদে সমাসীন হন এবং সর্ব্ববিধ শাসন-ক্ষমতা পরিচালন করেন, প্রয়োজন তেমন রাষ্ট্রশক্তির। এই জন্যই তোমরা যে নিখিল দুঃখ বরণ করিয়া নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালন করিতেছ, তাহাতে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দিবার সামর্থ্যের ও রুচির অভাব সত্ত্বেও আমি এইগুলির প্রতি অন্তরে অন্তরে অকপট ভাবে সহানুভূতিশীল। সহস্র সহস্র নারীকে অমর্য্যাদা হইতে রক্ষার জন্য, সহস্র সহস্র শিশুকে অকালমৃত্যু হইতে বাঁচাইবার জন্য, সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নিবার্য্য ব্যাধিসমূহের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য, দরিদ্রের দারিদ্র্য নাশের জন্য, অজ্ঞানকে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য, পশুবৎ জীবনযাপনকারী লক্ষ্যহীন বীর্য্যহীন কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উদ্দীপনা দানের জন্য যেদিন তোমরা সত্যিকার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারিবে, আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব, সেইদিন তোমরা প্রমাণ করিবে যে, আমরা যাহারা

আবাল্য তপস্যা করিয়া জাতির ও জীবের কুশল-চিন্তা করিয়াছি, তোমরা তাহাদের অপেক্ষাও শতগুণে শ্রেষ্ঠ, শতগুণে পূজ্য।"

সপত্নীর প্রতি সপত্নীর কর্ত্তব্য

দিনাজপুর জেলান্তর্গত ঠাকুরগাঁও-নিবাসিনী জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি যে মা তোমার রুগ্না সপত্নীকে সেবা, শুশ্রূষা ও স্নেহময় ব্যবহারের দ্বারা নিয়ত পরিচর্য্যা করিতেছ এবং তোমার এই অক্লান্ত শ্রম ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তোমার প্রতিবেশীরা তোমাকে ধন্য ধন্য করিতেছে, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দ ও গৌরব বোধ করিতেছি। একই পুরুষের একাধিক বিবাহ এই দেশে সাধারণ ভাবে প্রচলিত না থাকিলেও কেহ কেহ একের অধিক বিবাহ করিয়া থাকেন। কেহ করেন ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের জন্য, কেহ করেন নিতান্তই দায়ে ঠেকিয়া,—যেমন করিয়া তোমার স্বামী তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষেরা যে উদ্দেশ্যেই দুই বা ততোধিক পত্নী গ্রহণ করুন, সপত্নীদের মধ্যে চিরন্তন তিক্ততা এই দেশে এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাপার। সতীন সতীনকে বিষ খাওয়াইয়াছে, সতীন সতীনকে মিথ্যা অপবাদ দিয়া লাঞ্ছিতা করিয়াছে, এই সব ঘটনার অন্ত নাই। কিন্তু তুমি দেবী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সতীনকে সেবা করিবার মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছ। এই কারণেই সকলের দৃষ্টিতে তুমি নমস্যা হইয়াছ।

"প্রকৃত প্রস্তাবে এক সতীন অপর সতীনের পর নহে, প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, শত্রু নহে। যদি পতিকে কেহ ভালবাসে এবং সেই ভালবাসা যদি সত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে পতির সেবা, চিত্ত-বিনোদন বা প্রীতি সম্পাদন যে-কেহ করুক, সে-ই পত্নীর নিকটে প্রিয় হইবে। কিন্তু পতি যদি পরনারী বা বারনারীর প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার অতীব ঘোরতর নৈতিক দুর্গতি এবং আধ্যাত্মিক পতন ঘটে। এই কারণে, গণিকা লক্ষহীরার প্রীতিকামী আতুর স্বামীকে যে তার পত্নী স্কন্ধে বহন করিয়া বেশ্যালয়ের দুয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, ইহাকে একদল লোক খুব হাততালির সহিত বাহবা দিলেও আমরা অতীব গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু পতি যেখানে সামাজিক এবং বৈধ জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে পত্নী সংগ্রহ করেন, সেখানে অপর পত্নীর পক্ষে নবাগতা সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ এই কারণে উচিত নহে যে, স্বামী নিজ সুখ-সম্পাদনের জন্য যদি তাহার সুখ-সোহাগের একজন ভাগীদার আনিয়া জুটাইয়াই থাকেন, তবু স্বামীর প্রতি প্রেমবশতঃ নিজের এই ক্ষতি অম্লানবদনে সহিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। সপত্নীকে বিদ্বেষের পাত্র বলিয়া জ্ঞান না করিয়া নিজের বড় বা ছোট বোন্ বলিয়া বিচার করা উচিত এবং তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ ব্যবহার করিয়া চলা উচিত। মা-বাপও যদি দুই ভগিনীর প্রতি ব্যবহারে তারতম্য বা পক্ষপাত প্রদর্শন করেন, তবু

ভগিনীতে ভগিনীতে কত অশান্তি হয়, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, মা-বাপের কাছে সন্তানেরা কেবল পাইবারই দাবী করিয়া থাকে। প্রকৃত সাধ্বী পত্নীর পক্ষে পতির নিকটে পাইবার দাবী থাকে না, থাকে শুধু দিবার দাবী, দিবার প্রবৃত্তি, পতিকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিয়াই তার পরমা তৃপ্তি। এই কারণেই সে ইচ্ছা করিলে নিজের ত্যাগশক্তির বলে ভিন্ন বংশ হইতে আগতা ভিন্ন প্রতিবেশে পালিতা একটী নবীনা রমণীকেও বিদ্বেষ-ভাজিনী সপত্নী জ্ঞান না করিয়া সহোদরা ভগিনী অপেক্ষাও আপনতরা জ্ঞান করিতে পারে। পতি-সুখ-সম্পাদন যেখানে উভয়েরই লক্ষ্য, সেখানে এইরূপ সুগভীর প্রীতি উপজাত না হইবার কোনও কারণ নাই।"

স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা-সঞ্চারের কারণ

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত বরহিত-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিয়াছেন,—

"স্ত্রীলোকদের সহিত কয়েক মাস চলাফিরা করিবার ফলে স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছ। আমার মনে হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা অতিশয় চপলা, দায়িত্বজ্ঞানহীনা, আত্মসম্মানবোধবর্জ্জিতা, তুমি এমন চরিত্রের স্ত্রীলোকদেরই সঙ্গে এতদিন চলিয়াছ। আমিও স্ত্রীলোকদের সহিত যথেষ্ট চলিয়াছি, কিন্তু স্ত্রীজাতির প্রতি

আমার এইরূপ ঘৃণা উদ্রিক্ত হয় নাই। কেননা, ঘৃণনীয়া চরিত্রের বহু স্ত্রীলোক চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইলেও ইহাদের মধ্যে আবার দেবী-স্বভাবা সতীত্ব-জ্যোতিঃ-সমুজ্জ্বলা দীপ্তিমতী মহিমময়ী মূর্ত্তিও শত শত দেখিয়াছি। কোনও কোনও স্ত্রীলোক যে ঘনিষ্ঠতাকামী পুরুষদের পক্ষে সাক্ষাৎ কৃতান্তদূতী-স্বরূপিণী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহারও ভিতরে দেবীত্ব লুকাইয়া আছে, তাহার দেবী-সত্তা বাহিরের অননুশীলনের মেঘমালায় ঢাকা পড়িয়া অন্তরের এক অনাদৃত কোণে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। এই দেবী-সত্তা যে জাগিয়া ওঠে না, এই দেবী-সত্তা যে হুঙ্কার করিয়া আসিয়া ঘনিষ্ঠতা লিপ্সু পুরুষদের সমক্ষে দাঁড়ায় না, তাহার কারণও তোমাদেরই দেওয়া কুশিক্ষা, যাহার দরুণ প্রায় নারীমাত্রেই এ কথা ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, নারী প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, নারীর প্রাণের পিপাসা পূরণের জন্য পুরুষের সাহচর্য্য একান্তই অপরিহার্য্য, মেয়েদের বিবাহ হয় শুধু স্বামীটীর সহিত শারীরিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপনেরই জন্য, জীবনের অন্য সকল কাজ এই যৌন কার্য্যগুলির সম্যক্ রূপে অধীন এবং অপ্রকাশ্যে-অনুষ্ঠিতব্য এই কার্য্যগুলির তুলনায় জীবনের অপর সকল কার্য্য অল্পতর গুরুত্ব-বিশিষ্ট। স্ত্রীলোকগুলিকে ভাবিতে শিখান হইয়াছে যে, তাহারা যে স্বামীর গৃহে আসিয়া রান্না করে, বাটনা বাটে, জল তোলে, ঘর ঝাড়ে, বিছানা পাতে, শিশুদের পরিচর্য্যা

করে, শ্বশুরকে সেবা করে, শাশুড়ীর কাজে সাহায্য করে, হাতে শাঁখা পরে, সিঁথিতে সিন্দুর দেয়, তুলসীতলায় বাতি জ্বালায়, ঠাকুর-ঘরে প্রণাম করে, সব কাজই হইতেছে অবান্তর এবং অপ্রধান, প্রধান কাজ হইতেছে সেইগুলি, যেইগুলির তাহারা কোনও সাক্ষী রাখে না এবং যেগুলির খবর একমাত্র তাহারাই জানে আর তাহাদের স্বামীরা জানে। এইরূপ একদেশদর্শী শিক্ষা দিয়া তোমরা ও তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহু শতাব্দী ধরিয়া স্ত্রীলোকদিগকে যে ভাবে মাত্র একটী নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছ, তাহাতে ইহাদের অনেকের সহিতই কিছুকাল চলাফিরা করিলে সজ্জীবনযাপনেচ্ছু, সাধু-চরিত্র-লিপ্সু ব্যক্তির যে ইহাদের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা সঞ্জাত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবারই বা কি আছে?

নারীর দেবীত্ব উদ্বোধনের উপায়

"কিন্তু হতাশ হইবার কিছুই নাই। তুমি তোমার দৃষ্টির শুদ্ধতা দিয়া এই সব ভ্রান্তিকবলিত বিলাসলালিত অনেকের ভিতরেই শুদ্ধতা ফিরাইয়া আনিতে পার। তাহাদের ভিতরের সুপ্ত দেবীত্ব এমন অঘোর নিদ্রায় অচেতন নহে যে, ডাক দিতে জানিলে, তাহারা তাহা শুনিবে না। নারী-চরিত্রের মহিমার দিকটাতে দৃষ্টি-সঞ্চালন কর এবং বাক্যে বা ব্যবহারে প্রত্যেক রমণীকে নিজ দেবী-সত্তার কথা ভাবিতে বাধ্য কর।

হতাশও হইও না, বিরক্তও হইও না, নিজের অন্তরের শুভ্রতা দিয়া সকলের মনের সকল কালিমা ঢাকিয়া দাও। শুধু মধুর কণ্ঠে 'মা' ডাক ডাকিয়া আমি কত রমণীর চপলতা চিরতরে দূর করিয়া দিয়াছি, তাহা কি জান না? আমি যাহা করিতে পারিয়াছি, তোমরা কেন তাহা করিতে সমর্থ হইবে না? আমি যাহা করিতে পারিয়াছি ব্যাপক ভাবে, তোমরা তাহা স্বল্পায়তনেও করিতে অবশ্যই সমর্থ হইবে। বিদ্বেষ প্রয়োজনীয় নহে, প্রয়োজন হইতেছে বিশ্বাসের।"

আইনের বলে বহুবিবাহ-নিরোধ

পাবনা জিলান্তর্গত ঈশ্বরদী-নিবাসী আর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আইন করিয়া বহুবিবাহ-নিরোধের চেষ্টা, ফল ও আবশ্যকতাকে আমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করি। কুলীন ব্রাহ্মণ ও ধনীর দুলাল বহুবিবাহ করিয়াছে। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একমাত্র আন্দোলনের শক্তিতে বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বহুবিবাহ বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বঙ্গদেশস্থ কুলীন ব্রাহ্মণদের সমাজ ব্যতীত অন্যান্য সমাজেও বহুবিবাহ নিরুদ্ধ করিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে দুই চারিজন ভোগী বা বিলাসী বড়লোক ব্যতীত দুই বা ততোধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ বড় কেহ একটা করেনই না। এই কারণেই আইন করিয়া বহুবিবাহ নিরোধের চেষ্টা

উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া নিতান্তই গতিহীন হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য, যাঁহারা আইন করিয়া বহুবিবাহ নিরোধ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের অন্তরের প্রেরণা ভারতীয় ব্রহ্মচর্যের আদর্শ হইতে সমুদ্ভূত নহে। একপত্নীব্রত স্বামী রামচন্দ্রের আদর্শ তাঁহাদের প্রেরণার উৎস নহে। ইংরেজ বা ফরাসী স্বামীর মত একটী মাত্র পত্নীকে বিবাহ করিয়া কেহ যদি নৃত্য-নাচ, সামাজিক ভোজ, মদ্যশালা এবং মদিরার উত্তেজনায় লোকচক্ষে ধূলি দিয়া পরনারীতে আসক্ত হয়, তবে তাহা নিয়া মাথা ঘামাইবার ইঁহাদের প্রয়োজন নাই। জাতিকে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, চরিত্রবান্ করিবার জন্য ইঁহারা ব্যস্ত নহেন। ইঁহারা ব্যস্ত শুধু জগৎকে দেখাইতে যে আমরা ভারতবাসীরা ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অধিবাসীদের তুলনায় অসভ্য নহি। ব্যস, এই পর্য্যন্তই। ইঁহাদের বহুবিবাহ-নিরোধ-মূলক সকল চেষ্টার মূল উৎস হইতেছে পাশ্চাত্য জাতিদের এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে অবিচলিত বিশ্বাস।

বহুবিবাহ নিরোধ ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক বিপর্য্যয়

"আমার মতে বহুবিবাহকে হিন্দুদের মধ্য হইতে তুলিয়া দিবার জন্য আইনের কোনও আবশ্যকতাই নাই। যদি আইন করা হয়, তাহা হইলে ধনীদের উপর দিয়াই তাহার কর্তৃত্ব

চলা উচিত। যে সময়ে ভারতবর্ষে দুই ধর্ম্মাবলম্বী দুই সম্প্রদায় নিজ নিজ জনসংখ্যার বিষয় নিয়া রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতেছে বা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইতেছে, সেই সময়ে এক সম্প্রদায় তাহাদের ধার্ম্মিক নির্দ্দেশে চারিটি পর্য্যন্ত পত্নীর সাহায্যে জনসংখ্যা কেবলই বাড়াইয়া যাইবার অধিকার ব্যবহার করিতে থাকিবে এবং এই ধার্ম্মিক নির্দ্দেশের উপরে কোনও পরিবর্ত্তন বা সঙ্কোচ সাধনের অধিকার জগতের কোনও আইন-প্রণেতার নাই বলিয়া দাবী করিবে, আর অপর সম্প্রদায় নিজেরা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ হইতেছে জানিয়াও একমাত্র পাশ্চাত্যের সঙ্গে নিজেদের সভ্যতার সমত্ব প্রমাণের জন্য পুরুষের বিবাহকে সঙ্কুচিত করিয়া যাইবে, ইহা আমার মতে ভবিষ্যতের বিরাট রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টিকারী হইবে। পণ্ডিতেরাও যে অনেক সময়ে মূর্খ হইয়া থাকেন, বর্ত্তমান ব্যাপার তাহারই প্রমাণ।

বহু-বিবাহ-নিরোধক আইন কখন লঙ্ঘনীয়

"অবশ্য, সর্ব্বব্যাপারে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারবাদ দেশে ক্রমশঃ বিস্তৃততর হইতেছে। এই মতবাদের সহিত আমাদের অন্তরের গভীর সমর্থন আছে। একজন সীতার যেমন একজন পতি রাম, একজন রামচন্দ্রেরও তেমন এক পত্নী সীতা, এই আদর্শের আমরা প্রচারক ও সমর্থক। একজন

সাবিত্রীর যেমন এক পতি সত্যবান, তেমন একজন সত্যবানেরও এক পত্নী সাবিত্রী, এই দৃশ্য আমাদের নয়নের আনন্দ-বিধায়ক এবং অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধার প্রাপক ও পোষক। কিন্তু এক সাবিত্রীর গর্ভে সত্যবানের শত পুত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপ যদি শতপুত্রের প্রয়োজন ভবিষ্যতে কোনও সত্যবানের হয়, তাহা হইলে সেই ভাবী সাবিত্রী একাকিনী হয়ত এতগুলি সন্তান প্রসবে সমর্থা হইবেন না। অথবা সমর্থা হইলেও যত সময়ের মধ্যে এই সন্তানগুলিকে পাওয়া প্রয়োজন, তত সময়ের মধ্যে দিতে পারিবেন না। দেশ, জাতি, সমাজ বা ধর্ম্মকে অত্যাচার ও উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য যদি রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত লক্ষ লক্ষ পুত্রের প্রয়োজন হয় এবং সেই মহাযুদ্ধ যদি বহু বর্ষ ব্যাপিয়া চলে, তবে সেই সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত নিজেদিগকে সমান সভ্যতাশালী বলিয়া দেখাইবার জন্য যে আইন প্রণয়নের কল্পনা চলিতেছে, সেই আইন মান্য করা চলিবে কি? এই সকল বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে।"

বহুদেববাদ ও পুরোহিত-শ্রেণী

মালদহ-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হিন্দুর বহুদেববাদ দীর্ঘকাল এক বিষম বিতর্কের বিষয়

হইয়া রহিয়াছে। তর্কের সময়ে সকলেই বলিয়া থাকেন যে, সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা অর্থাৎ একই বিশ্ববিধাতার পূজার জন্য নিজহিতকামী সাধক তাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া নিয়াছেন। এই রূপ কল্পনায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত সমধ্যানী নহেন, যিনি যেমন অধিকারী, তিনি তেমন রূপের কল্পনা করিয়া সেই ব্যক্তাব্যক্ত পরব্রহ্মের ভজনা করিতেছেন। যুক্তির দিক্ দিয়া এই কথাগুলি শুনিতে বেশ কর্ণরোচক এবং প্রকৃতই যাঁহারা গভীর জলের মীন অর্থাৎ সাধক পুরুষ, তাঁহারা ইহা উপলব্ধিও করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যে একই ঠাকুর-ঘরে পঁচিশ জন করিয়া দেবতার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ স্থাপিত হইয়া নিত্য পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের পূজাকালে বা প্রণাম-কালে পূজক বা প্রণমক প্রত্যেককে বিভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিয়াও যাইতেছেন। সকলেই যে এক, এই কথাটা কাহারও স্মরণে থাকিতেছে না কিম্বা কেহ কার্য্যকালে সেই কথাটা মানিতেছেনও না। স্মরণ থাকিলে বা মানিলে একই ঠাকুরঘরে দশটি বিশটি দেবতার পৃথক্ বিগ্রহ রাখিবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না এবং একই পাড়াতে দশটি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ দশটি মন্দির স্থাপনের ও প্রয়োজনীয়তা কিছু থাকে না। মূলতঃ সাধকের হিতের জন্যই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপকল্পনার কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকিলেও এক্ষণে ব্রহ্ম নিজে গভীর বিস্মৃতির তলদেশে নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছেন এবং এক একজন পুরোহিতের ব্যক্তিগত

স্বার্থ-সংরক্ষণের বা গোষ্ঠী-প্রতিপালনের তাগিদে পড়িয়া এক একটী বিগ্রহ এক এক স্থানে জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। মূল তত্ত্বে পৌঁছিবার জন্য এই সকল ব্যক্তিদের আগ্রহ আদৌ নাই এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা যদি মূলতত্ত্বে পৌঁছিয়া নিষ্কল পরব্রহ্মের বিমল জ্ঞানের দীপ্ত আলোকে আসল কথাটুকু বুঝিয়া প্রথাগত তথাকথিত পূজার্চ্চনার পদ্ধতিগুলির প্রতি উদাসীন হইয়া তাঁহাদের বংশানুক্রমিক আয়ের পথে কোপ বসায়, এই ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত রহিয়াছেন। এই শঙ্কা তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম ও তত্ত্বের উচ্চ অনুশীলনের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রূপে দণ্ডায়মান করাইয়া রাখিয়াছে। কথাগুলি কটু হইতে পারে, কিন্তু কথাগুলি সত্য এবং পণ্ডিত ও পুরোহিত শ্রেণীর সজ্জনেরা সমাজ-রক্ষায়, ধর্ম্মরক্ষায়, সংস্কৃতিরক্ষায়, সভ্যতারক্ষায় যে সকল অপূর্ব্ব অবদান দিয়াছেন, তাহা বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা-নত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াও নিতান্ত সত্যের অনুরোধে এই অপ্রীতিকর মন্তব্যগুলি শুনাইতে হইতেছে।

অসাম্প্রদায়িক উপাসনা-গৃহ স্থাপনের আবশ্যকতা

"কিন্তু মানুষের যুক্তানুসন্ধী বুদ্ধিবৃত্তিকে চিরকাল কখনও লোক-প্রথার বা কুল-সংস্কারের নীচে চাপিয়া রাখা যায় না। একদা যে কোনও না কোনও উপলক্ষকে আশ্রয় করিয়া

মাথা চাড়া দিয়া উঠিবেই এবং দীর্ঘকাল অন্ধ প্রথার চাপের নীচে ছিল বলিয়াই মাথা চাড়া দিবার সময়ে কিছু অতিশয্যও করিয়া বসিবে। মানুষের যুক্তি-পরায়ণ মনকে একদা এভাবে বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেই হইবে। ইহাই নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার মতে আমরা, যাহারা নিজেদিগকে প্রাচীন আর্য্য-ঋষিদের ধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি, আমরা যাহাদের নিকটতম আত্মীয় হইতেছেন শাস্ত্রাজীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ এবং পূজাজীব পুরোহিত-শ্রেণী, সেই আমাদিগকেই এমন ভাবে কাজ করিতে হইবে, যাহাতে যুক্তি-বিচার এই বিদ্রোহের সুযোগটি না পায়, পরন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ব্বিচারে সর্ব্বজাতিতে সর্ব্ববর্ণে প্রচারিত হইতে পারে। আমাদেরই কর্ত্তব্য এমন ভজনালয়-সমূহ স্থাপন করা, যেখানে আসিয়া কৃষ্ণভক্ত, কালীভক্ত, শিবভক্ত, বিষ্ণুভক্ত, রামভক্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ভক্তেরা একমুখ মন লইয়া একত্র ভজনা করিতে পারে। শত শত দেব-বিগ্রহের প্রদর্শনী স্থাপন না করিয়া সর্ব্বদেবদেবের অদ্বিতীয় নাম অখণ্ড-মন্ত্রের বিগ্রহকে স্থাপন করিয়া বহু-দেব-বাদে বিচ্ছিন্ন শত সম্প্রদায়ের লোকের সমবেত ভাবে উপাসনা করিবার সুযোগ সৃষ্টি আমাদিগকেই করিয়া দিতে হইবে। যুক্তি ও প্রথার মধ্যে যে কলহ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, ওঙ্কার-সমন্বিত অসাম্প্রদায়িক উপাসনা-গৃহ সমূহের সৃষ্টি দ্বারা আমাদিগকেই তাহা দূরীভূত করিতে হইবে। স্ত্রী, শূদ্র বা দ্বিজবন্ধুকে ঘৃণা না করিয়া, উপেক্ষা না করিয়া,

তাহাদের প্রতি উদাসীন না থাকিয়া, নির্ব্বিচারে সকলকে ডাকিয়া আনিয়া গায়ত্রী ও প্রণবে পরিপূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়া সমান মন্ত্রে সমান তন্ত্রে সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার প্রদান করিয়া পরমপ্রেম-ভরে মহাসমাদরে কোলে তুলিয়া লইতে হইবে, ধর্ম্মের মধ্য হইতে অস্পৃশ্যতাকে, ছুঁৎমার্গকে, বর্জ্জন-নীতিকে একেবারে দূর করিয়া দিতে হইবে। একার্য্য করিবার ভার অন্যের উপরে না দিয়া আমাকে নিতে হইবে, তোমাকে নিতে হইবে, তোমার আমার বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, পরিজন, অনুগত, আশ্রিত, পরিচিত ও শুভানুধ্যায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইবে।

শত বর্ষ পরের উপাসনা-গৃহ

"আমি একশত বৎসরের পরোবর্ত্তী ভারতবর্ষের দিকে তাকাইয়া কি দেখিতেছি, জানো? সহস্র সহস্র উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যেখানে সর্ব্ববর্ণের, সর্ব্বজাতির সমান প্রবেশাধিকার, যেখানে ভক্তি-স্নিগ্ধ চিত্ত লইয়া সকলে আসিয়া উপাসনা করিতে পারে, যেখানে শত শত দেবতা নাই, আছেন মাত্র পবিত্র ওঙ্কার-বিগ্রহ, যেখানে একমাত্র ওঙ্কারের উপাসনার মধ্য দিয়া শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, রামায়ৎ প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভক্তি-পিপাসার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি হইতেছে। এই সকল উপাসনা-মন্দির

কেবলই ভক্তির উৎসমুখ খুলিয়া দিতেছে না, কর্ম্মের দিতেছে প্রেরণা, ক্লৈব্যের করিতেছে অপসারণ, ব্যক্তিতান্ত্রিক মনকে করিয়া তুলিতেছে সর্ব্বতান্ত্রিক, বিশ্বতান্ত্রিক, ভেদবিচ্ছেদকাতর মানব-সমাজে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ ঐক্যের করিয়া দিতেছে প্রতিষ্ঠা। সেই অনাগত দিনের অনাগত দৃশ্যপটের ধ্যান জমাইয়া তোমরা পথ চল,—সত্যিকার বাঁচিবার পথ পাইবে, দেশকে জাতিকে সত্যিকার বাঁচিবার পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে।"

আত্ম-সমর্পণ ও মহাশক্তি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত আকুবপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানের চরণে কর আত্মসমর্পণ। ভগবানে আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়া তোমাতে মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটিবে। সেই শক্তি যুগপৎ তোমার উদ্ধার ও জগতের উদ্ধার সাধন করিবে। তোমার নিজের শক্তি এত অল্প যে, যথেষ্ট পুরুষকার সহকারে তাহাকে পরিচালন করিতে গেলেও, নিজের ও জগতের জন্য যাহা করিতে চাহ, তাহার শতাংশের একাংশ করিয়া উঠিতে পারিবে না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের দ্বারা তাঁহারও অমিত শক্তি তোমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর। সব জিনিষের মধ্য দিয়াই কি তড়িৎ-শক্তি প্রবাহিত হয়? যে জিনিষের মধ্যে প্রবাহ-গুণ রহিয়াছে, মাত্র তাহার ভিতর দিয়াই মূল শক্তি-উৎপাদক কেন্দ্র হইতে

উৎপাদিত হইয়া বিদ্যুদ্ধারা নানা স্থানে বহিয়া থাকে। আত্মসমর্পণের দ্বারা তোমরা তেমন হও। ভগবানের ঈপ্সিত মহাকার্য্য-সমূহ তোমাদের দ্বারা এভাবে সম্পাদিত হইবে। আত্ম-সমর্পণই মহাশক্তি-উন্মেষের মূল উৎস।"

পরদোষ দর্শন ও আত্মগঠন

কুমিল্লা জেলান্তর্গত পাচুঁথর নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"চতুর্দ্দিকে যত লোক দেখিতেছ, সকলকেই স্বার্থপর ও ব্যভিচারী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, লিখিয়াছ। তুমি ইহাদিগকে যাহা বলিয়া মনে করিয়াছ, ইহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত তাহা নহে। অনেকেই আবার তাহা বলিয়াই দেশের কোনও সেবাতেই সার্থকতা আসিতেছে না, কোনও কাজই সাফল্যের দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে না। ভিতরের অপবিত্র অভিপ্রায়কে চটুবচনের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়া যে যেমন করিয়া পারিতেছে, কেবল পরের চখে ধূলি দিতেছে। কিন্তু তোমার যখন আত্মগঠনই প্রধান ব্রত হইয়াছে, তখন তুমি অপরের স্বার্থান্ধতা বা কদাচার সম্পর্কে মনকে কৌতূহলী, জিজ্ঞাসু, মনোযোগী বা লিপ্ত করিয়া নিজের মূল্যবান সময়কে কোনও প্রকারে অপব্যয়িত হইতে দিও না। ইহাতে তোমার যে কেবল সময়ই নষ্ট হইবে, তাহা নহে,

সুযোগও নষ্ট হইবে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক ব্যাপার এই ঘটিবে যে, পরের দোষ, ত্রুটী, চ্যুতি ও অপরাধের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজের ভিতরে দোষ-প্রবণতা চ্যুতি-উন্মুখতার সৃষ্টি হইয়া যাইবে। যে যেই বস্তু বা ব্যক্তির চিন্তা করে, সে সেই বস্তু বা ব্যক্তির গুণ অল্প হইলেও পায়। উদার আকাশ, বিশাল সমুদ্র যার চিন্তার বিষয়, তাহার হৃদয় আপনি উদার হয়, চিত্তবৃত্তি বিশাল হয়। বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশুর মত মহামানবের জীবনের কথা যে চিন্তা করে, তার হৃদয় তাঁদেরই মতন হইতে থাকে। এই যুগে অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণের বা মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা করিয়া আংশিক হইলেও তাঁদের মত হইয়া গিয়াছেন, ইহা তোমরা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তোমার প্রয়োজন জীবন-গঠন, তুমি এখন সর্ব্বপ্রকারে পরদোষ অনুসন্ধান করা হইতে যতটা সম্ভব দূরে থাকিবে, পরের ত্রুটী সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হইবার জন্য চেষ্টা করিবে।"

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আবশ্যকতা

বরিশাল জেলান্তর্গত ঝালকাটি নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অনাহারে, ব্যভিচারে, রোগে, দুর্ভিক্ষে দেশ ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে বলিয়াই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন। আগে বন্যার রিলিফ করিব, তারপরে স্বাধীনতা চাহিব, ইহা একটা

কাল্পনিক প্রস্তাব। বরং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিলে বন্যার আর্ত্তত্রাণ আরও সহজে হইবে, আরও গভীর ভাবে হইবে। যে পরাধীন ভারতে রামকৃষ্ণ-মিশন বা অন্যান্য সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠান দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কুড়াইয়া বিরাট বিরাট বিভীষিকার অবসান ঘটাইতে চাহেন, স্বাধীন ভারতে সেই সকল সেবা-প্রতিষ্ঠান সেবা-কার্য্যের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছ হইতেই কোটি কোটি মুদ্রার সাহায্য পাইবেন, শুধু তাহাই নহে, নানাবিধ শোষণের পীড়ন হইতে রক্ষা প্রাপ্ত স্বাধীন ভারতের জনপদবাসীরা স্বভাবতই বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর মুক্তহস্ত হইতে সমর্থ হইবেন। আজ যখন বন্যা আসে, ঝঞ্ঝা আসে, দুর্ভিক্ষ আসে, বর্ত্তমান সরকারী কর্ম্মচারীরাও সেখানে সেবা-কেন্দ্র খোলেন সত্য, কিন্তু এই পরাধীন ভারতে তাঁহাদের কোনও কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিলে কে গিয়া কৈফিয়ৎ নিবে? এই সব মান্য ব্যক্তিদের কয়জন সেবাবুদ্ধি নিয়া কাজ করেন? প্রকৃত স্বাধীন দেশে সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজেদিগকে জনসাধারণের ভৃত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। আর পরাধীন দেশের সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রজাসাধারণের প্রদত্ত রাজস্বের দ্বারা নিজেদের ভোগ-বিলাস চরিতার্থ করিয়াও নিজেদিগকে ইহাদের অনুগৃহীত মনে না করিয়া ইহাদের প্রভু বলিয়া দাবী করেন। ইহাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীটুকুর পার্থক্যের দরুণই, তোমরা যাহারা রাষ্ট্রীয়

স্বাধীনতার কোনও আন্দোলনেই যোগ দাও না, তাহাদেরও উচিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ভগবচ্চরণে অবিরাম প্রার্থনা করা। তোমরা ধর্ম্মের সেবা বা ধর্ম্মের প্রচার করিতেছ বলিয়া যেন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকামী যতো কর্ম্মী ও ত্যাগীরা তোমাদের বিদ্বেষের ভাজন না হন। ইঁহারা মহৎ এক সঙ্কল্পকে আশ্রয় করিয়া জীবনকে ও মরণকে সমভাবে অবহেলে তৃণসম অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন, ইহাই এক স্বর্গীয় আদর্শ জানিবে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা মানুষ মাত্রেরই কাম্য

"কিন্তু আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কথাটা দ্বারা যাহা বুঝি, তাহা আসিবার পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এমন অবাঞ্ছনীয় অবস্থা সমূহ চলিতে পারে, যাহা প্রজা-সাধারণের পক্ষে প্রাণান্তকর। বর্ত্তমান যুগে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার মধ্য দিয়া দল-বিশেষের প্রাধান্য লাভ করণান্তর শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অপর দলের বা সম্প্রদায়ের লোককে যথেচ্ছ উৎপীড়ন করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সকল বিপজ্জনক অপসম্ভাবনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা মানুষ-মাত্রেরই কাম্য হইতে বাধ্য। কেননা, অন্য ক্ষেত্রে যেমনই হউক না কেন, এই ক্ষেত্রে জলে না নামিয়া সাঁতার শিক্ষা চলে না।"

স্বদেশপ্রেম ও দুর্য্যোগের প্রতিকার

বরিশাল জেলান্তর্গত পিরোজপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আকাশ চতুর্দ্দিকেই মেঘাচ্ছন্ন। এই মেঘ এক প্রকারের নহে, বহু প্রকারের। এক এক মেঘে এক এক প্রকারের বস্তু, এক এক প্রকারের বর্ষণ। কেহ হয়ত বর্ষণ করিবে গন্ধকগর্ভী লাভাপ্রবাহ, কেহ হয়ত বর্ষণ করিবে পূয, রক্ত, পুরীষ। কেহ হয়ত বর্ষণ করিবে চিরত্বক্জ্বালাত্মক ক্ষারাম্ল বারি। কেহ বর্ষণ করিবে শ্বাসরোধী বিষবাষ্প, কেহ বর্ষণ করিবে জাতিক্ষয়কর যদুবংশের মুষল-রাশি। কনিষ্কের যুগে যাহা আমরা একেবারে জীর্ণ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, মোগল-পাঠান যুগে কেন আমরা তাহা হজম করিতে পারিলাম না, সেই অক্ষমতার, সেই দুর্ব্বলতার ইহা প্রাপ্য শাস্তি। কিন্তু তাহারও প্রতিকার আছে। সেই প্রতিকার স্বদেশপ্রেম। দেশকে ভালবাস। ধর্ম্মের গোঁড়ামি নহে, স্বাদেশিকতার হোমাগ্নিকুণ্ডে অক্লেশে আত্মাহুতি দিবার শক্তি অর্জ্জনেই প্রতিকার আসিবে। যে স্বদেশপ্রেম বিশ্ববাসীকে শত্রু করে, সেই স্বদেশপ্রেম নহে, যে স্বদেশপ্রেম দেশকে ভালবাসিতে শিখাইবার কালে বিশ্ববাসী প্রত্যেকের প্রতি অন্তরের অকপট ভালবাসাকে উৎসারিত ও প্রসারিত করিয়া দেয়, সেই স্বদেশপ্রেম।"

সাড়ে তিনটা বাজিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি জামা গায়ে দিলেন। খড়মের কোণায় একটা লোহা উঠিয়া আলগা হইয়া ছিল, সেটাকে পিটাইয়া সমান করিয়া লইয়া খড়ম পায়ে দিলেন। তারপরে চলিলেন সভাস্থলে।

যাহা আশঙ্কা করা যাইতেছিল, ব্যাপার তাহার বিপরীত দেখা গেল। সমস্ত হল কাণায় কাণায় ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া থাকিবার মত যতটুকু স্থান ছিল, সেখানেও গাঁজাগাজি করিয়া শ্রোতারা দাঁড়াইয়া আছেন। চারিটা বাজিতে ঠিক ত্রিশ সেকেণ্ড বাকী থাকিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইলেন। কাহারও সভাপতিত্ব করিবার কোনও কথা ছিল না। ধর্ম্মসভায় সভাপতির প্রয়োজনই বা কি?

বিকাল ঠিক চারিটায় শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতারম্ভ করিলেন। তিনি যখন উচ্চারণ করিতেছেন,—"স্নেহময়ী জননীগণ ও শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ", তখন তিন চারি জনকে ঘড়ি খুলিতে দেখা গেল। কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বক্তৃতারম্ভ হইয়াছে, কাহারও কিছু মন্তব্য করিবার অবকাশ হইল না।

ব্রহ্মচর্য্যই জীবনের যোগ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অঙ্কশাস্ত্র কাহার আবিষ্কার, জগতের লোক তাহা জানে না কিন্তু জগদ্বাসী প্রত্যেককেই অল্প হোক্ অধিক হোক্ অঙ্ক কষতে হয়ই হয়। গণিত ছাড়া সভ্যতার কোনও গতিই সম্ভব নয়। এই যে আপনারা

এতগুলি সজ্জন ও ভদ্রমহিলা এই সুন্দর হলটিকে পূর্ণতায় শোভমান ক'রে রেখেছেন, তাও অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবমতই হয়েছে। যদি এখানে পাঁচশত জন উপস্থিত হয়ে থাকেন, তবে এক সঙ্গে সবাই আসেন নি, একজনের পরে আর একজন প্রবেশ করেছেন। একজন এসে যে সংখ্যাটির সৃষ্টি কর্লেন, আর একজন এসে সেই সংখ্যাটির পরিপুষ্টি দিলেন। যোগ অঙ্ক হ'ল। আবার এসে শুন্‌লেন নিতান্ত সাধারণ একটা তুচ্ছ লোক এখানে বাগাড়ম্বর কর্ত্তে এসেছে, কাজের কাজ কিছু কর্ব্বে না, কেবল কতকগুলি উদ্দীপ্ত ভাষার প্রয়োগ ক'রে কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে নিজ স্বার্থ সাধন ক'রেই চম্পট দেবে, অমনি একজন বা দুজন হল থেকে বেরিয়ে গেলেন। সমবেত জনসংখ্যা একটুখানি শীর্ণতর হ'ল। বিয়োগ অঙ্ক হ'ল। কিন্তু বাহিরে গিয়েই মনে মনে ভাব্‌লেন, ছাইয়ের গাদার নীচে কি আগুন থাকে না? আস্তাকুঁড়ের মধ্যেও কি কখনো কখনো স্বর্ণ মিলে না? আবর্জ্জনাস্তূপের নীচে বা কয়লার গাদার মাঝখানেও কি হঠাৎ একটা দুটা দামী হীরা কেউ কখনো পায় নি? হ'ক না লোকটী তুচ্ছ, হ'ক না লোকটী স্বার্থাভিসন্ধী, কিন্তু আমি ত' আমার অজ্ঞাতে হঠাৎ কোনও দামী জিনিষ পেয়েও যেতে পারি। অমনি আপনারা হয়ত একজন একজন ক'রে নয়, একেবারে পাঁচ জন পাঁচ জন ক'রে হলের ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে লাগ্‌লেন। হ'ল পূরণ অঙ্ক সুরু। কিন্তু বক্তৃতা শুনতে শুনতে দেখলেন, এযে

পুরোনো যুগের বস্তাপচা বাসী মাল, এর জন্য আবার কষ্ট ক'রে দম আটকানো লোকের ভিড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতের দিনে জামাকাপড় গায়ের ঘামে ভিজান কেন? সুতরাং এবার আর পাঁচ জন পাঁচ জন ক'রে নয়, একেবারে দশ জন দশ জন ক'রে হলের বাইরে যেতে লাগলেন। সুরু হ'ল ভাগ অঙ্ক। আমি অবশ্য কাল্পনিক একটা গল্প বললুম কিন্তু সত্য কথাটা এই বলা হ'ল যে যোগ, বিয়োগ, পূরণ আর ভাগ নিয়ে আমাদের জীবন, আমাদের সভ্যতা। ভারতবর্ষ মানুষের জীবনটাকে একটা মূর্ত্তিমন্ত গণিতশাস্ত্র জ্ঞান ক'রে জীবনের একাংশে যোগ, একাংশে বিয়োগ, একাংশে পূরণ এবং একাংশে ভাগকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিল। তারই পারিভাষিক নাম চতুরাশ্রম। আশ্রম-চতুষ্টয়ের প্রথম আশ্রম যেটি, তার মূল সদাচার যে বস্তু, তার প্রাণের আধার যেখানে, সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথা আমি বল্‌ব। ব্রহ্মচর্য্য জীবনের যোগ, ব্রহ্মচর্য্য জীবনের ঋদ্ধি, ব্রহ্মচর্য্য জীবনের অভ্যুদয়, ব্রহ্মচর্য্য জীবনের সিদ্ধি। সেই যোগের মহিমা, সেই ঋদ্ধির কৌশল, সেই অভ্যুদয়ের উপায়, সেই সিদ্ধির সাধনপন্থা আমার বর্ণনীয় বিষয়। আমি বৃথা আপনাদের আয়ু অপহরণ কত্তে আসিনি।

পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল বক্তৃতার পর শ্রীশ্রীবাবামণি কালবিলম্ব না করিয়া সভামঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ কিছু জানিবার বুঝিবার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবামণি হলের বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার

কাষ্ঠপাদুকার খট্ খট্ ধ্বনি মাত্র লোককে জানাইয়া দিল যে আজিকের মতন বক্তৃতা শেষ হইয়াছে।

শিলচর

২৫শে মাঘ, শুক্রবার, ১৩৪১

(৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

বক্তৃতা দিতে যাবেন না

প্রাতঃকালেই একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক শ্রীবাবামণির নিকটে আসিয়া নমস্কার জানাইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসিতে বলিলেন।

ভদ্রলোক বলিলেন,—একটী অনুরোধ কত্তে এসেছি। আজ আপনি আপনার বক্তৃতাটি বন্ধ রাখুন।

—কেন বলুন ত'?

—আজ সরস্বতী পূজা। স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা বাণী-বন্দনায় ব্যস্ত? কে আজ বক্তৃতা শুনতে আসবে? সভায় জনতা না হ'লে আপনারও আনন্দ হবে না।

—বেশ! নিরানন্দের মধ্যেই কিছুক্ষণ বাচালতা ক'রে আসব।

—না, তা' বলছি না। আপনার কথাগুলি বড় দামী। ছাত্রেরা যদি না শুনতে পায়, তবে তাদের ক্ষতি হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—না। কথাটি ঠিক তাই নয়। আসল কথাটি কি বলুন তো।

ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তারপরে বলিলেন,—আজকে আপনাকে সভাস্থলে বিশেষ বাধা দেওয়া হবে। এমনও হ'তে পারে যে হট্টগোলের মধ্যে সভা ভেঙ্গে যাবে। যাতে এই অপ্রীতিকর অবস্থাটা না হয়, তার জন্য অনুরোধ কচ্ছি যে, আজ আপনি সভাস্থলে যাবেন না।

—সভা কারা ভাঙ্গবে?

—যারা আপনার বিরুদ্ধবাদী।

—তারা কারা?

—আমি নাম প্রকাশ কত্তে অনিচ্ছুক।

—অনিচ্ছার কারণ?

—তাও প্রকাশ কত্তে চাই না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তার চেয়ে এক কাজ করুন না। আপনি ঐসব ভদ্রলোকদের কাছে গিয়ে বলুন যে, আমাকে যেন আমার বাসস্থান থেকেই বেরুতে দেওয়া না হয়। তা হ'লেই আর সভাস্থলে যাব না।

এক বস্তা চিঠি

ভদ্রলোক কয়েকটী নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পত্র লিখিতে বসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ একটী ভদ্রলোক ছাড়া আর কেহ সারাদিনে শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত সাক্ষাৎ করিতেও আসিল না। গৃহস্বামী দুঃখ করিলেন,—আপনি শ্রীহট্ট সহরে যখন বক্তৃতামালা

বিতরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই সহরে অনেকেই আমার কাছে খোঁজ নিয়েছেন আপনার বিষয়ে এই কথা জেনে যে, আমার মতন দরিদ্র একটী লোকের অস্থায়ী এ আস্তানায় আপনার মত মহাপুরুষের চরণধূলি পড়বে। কিন্তু আজ ছুটির দিন, তবু একটী কাক-প্রাণীর দেখা নেই।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভালই ত' হ'ল। কত কাজ আমার জমে আছে। সেইগুলি আস্তে আস্তে কমাব। দেখেছেন এই এক বস্তা চিঠি।

দুর্য্যোগকে সুযোগ কর

কুমিল্লা-জেলান্তর্গত মতলবগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুর্য্যোগ দেখিয়া ভয় পাইও না। দুর্য্যোগকে সুযোগ-রূপে পরিণত করিতে হইবে। পরিস্থিতির উপরে তোমার যদি অতটা কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে দুর্য্যোগকে সুযোগ-রূপে গ্রহণের চেষ্টা করিবে। জগতে এমন কোনও বিরুদ্ধ অবস্থা নাই বা থাকিতে পারে না, যাহাকে বৃহৎ কোনও সাফল্যের সূচীপত্র বা মহৎ কোনও কৃতিত্বের সোপান রূপে গ্রহণ করা যায় না। তুমি ও আমি পরিস্থিতিকে যখন যেরূপ হইতে বলিব, সে তখনি তাহা হইবে বা তুমি ও আমি পরিবেশকে যখন যে রূপান্তর গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ দিব, সে তৎক্ষণাৎ সেই রূপটিই বরণ করিয়া নিবে, এইরূপ আশা করিতে

থাকার নামে আকাশকুসুম-রচনা মাত্র। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়াও নির্ভীক প্রাণে কাজ করিয়া যাইতে হইবে, বিরুদ্ধ পরিস্থিতিকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া কর্ম্মানুরাগ-দীপ্ত বজ্রবাহুকে উত্তোলিত করিতে হইবে। তোমার চরিত্র বল যদি অটুট হয়, তোমার কর্ম্মশীলতা যদি বিশ্রামবিমুখ হয়, তোমার আত্মবিশ্বাস যদি প্রগাঢ় থাকে, তোমার কর্মনৈপুণ্য যদি আত্মশ্রদ্ধী ও অনলস হয়, তবে আজ যেখানে কর্দমাক্ত জলাভূমিতে দাঁড়াইয়া পঙ্ক-কূপে নিজেকে বন্দি-দশাপ্রাপ্ত স্থবিরের ন্যায় মনে হইতেছে, সেইখানেই তোমার জন্য পঙ্ক-কর্দ্দম ভেদিয়া সুদৃঢ় শৈলশৃঙ্গের আবির্ভাব হইবে, যাহার উপরে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে তুমি সমগ্র দেশকে ডাক দিয়া বলিতে পারিবে, এই দেখ আমি আসিয়াছি আমার স্বর্ণভৃঙ্গার লইয়া, আমি তোমাদিগকে অমৃত পান করাইয়া অমর করিব, আমি তোমাদের মৃত্যু-নিবারণ করিব। এস তোমরা সরল বিশ্বাসে এবং অকুণ্ঠ আস্থায় আমাকে অনুসরণ কর।"

শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ কর

কুমিল্লা-নিবাসিনী জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া যখন জগতের কিছু কিছু সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছ, তখন এই সুযোগের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা দেখাই তোমার উচিত।

প্রতিষ্ঠানটীর ভিতরে তোমার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিকাশের পক্ষে বিঘ্নজনক কিছু না থাকিলে তুমি প্রতিষ্ঠান পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিও না। আজ যেটুকু সেবা-শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছ, কাল হয়ত তাহা নাও পাইতে পার। যতক্ষণ বাঁচি, ততক্ষণ শিখি। যতটুকু শিখি, ততটুকুই কাজে আসিবে, যদি তাহা কুশিক্ষা না হয়। যতক্ষণ শিক্ষার সুযোগ পাইতেছ, ততক্ষণ সেই সুযোগকে পুরা দমে ব্যবহার কর।"

বিভূতি ও প্রচার

রাজসাহী-নিবাসিনী অপর এক পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিবিষ্টভাবে নামের সাধন করিতে করিতে আপনা আপনি নানা প্রকার অলৌকিক দর্শন হইতে থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক দর্শন আমি মনে করি, চক্ষু বুজিলেই ইষ্টদর্শনকে। ঘুমাইতে গিয়া শুইলে চক্ষের পাতায় কে যেন তুলি বুলাইয়া তোমার প্রাণের প্রভুর অভয় মূরতি আঁকিয়া দিল, এই বিভূতির চেয়ে একাধারে শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বিভূতি আর কিছু হইতে পারে না। তোমার তাহাই হইয়াছিল। তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু মা, এই কথা ঢাক পিটাইয়া প্রচার করিতে গিয়া তুমি নিজের ক্ষতি করিয়াছ। এই জনাই এমন আনন্দপ্রদ দর্শন

এখন তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আর এই জাতীয় ভাগ্যের কথা লোকের কাছে প্রচার করিও না।"

আমার প্রাণ কাঁদিয়াছে

নোয়াখালী জেলান্তর্গত ছাগলনাইয়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি যে অবিরাম শ্রম করিতেছি, তাহা কোনও লাভের লোভে নহে। লাভের লোভে যে কাজ করে, সে সাফল্যে স্ফীত হইয়া উৎসাহিত হয় এবং অসাফল্যে হতাশ হয়, অলাভজনক কাজ ছাড়িয়া দেয়। আমি তরুণ কৈশোরে যে কাজ হাতে নিয়াছি, তাহা ছাড়িতে পারিতেছি না শুধু এই জন্য যে, তোমাদের সকলের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাই নিজেকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াও থামাইতে পারিতেছি না। যাহারা কাঁদে, তাহারা চিরকালই একটু অবুঝ। আমি অবুঝ বলিয়াই এত ছুটাছুটি করিতেছি, অবুঝ বলিয়াই বক্তৃতা দিয়া আসিয়াই কোদাল ধরি, আবার কোদাল ছাড়িয়াই লেখনী ধরি, আবার লেখনী ছাড়িয়াই ভ্রমণ সুরু করি। সবই তোমাদের মুখপানে তাকাইয়া করিতেছি,—আমার নিজের দেহ, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, পরিতৃপ্তি, সাফল্য, যশ বা প্রতিপত্তির দিকে তাকাইয়া নহে। ছোটকালে ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াও আমি শেষের বেঞ্চেই গিয়া পুনরায় বসিতাম, আমি রঙ্গমঞ্চের দীপ্ত আলোকের সমক্ষে আসিতে চাহি না, নেপথ্যে

আমার আত্মদান, অনেকেই ইহা জানিবে না, কাহারও জানিবারও প্রয়োজন নাই। আমি যে তোমাদের জন্য কাঁদিয়াছি, ইহাই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ। কার জন্য কাঁদিয়াছি, কতখানি কাঁদিয়াছি, কেন কাঁদিয়াছি, না কাঁদিলে আমার কি ক্ষতি হইত, ইহার হিসাব আমি চাহি না, অপরে তাহা জানুক, তাহাও চাহি না। ক্রন্দনের এই বিগলিত অশ্রুধারা আমাকে সবল রাখিয়াছে, সুদৃঢ় করিয়াছে এবং আমৃত্যু কর্ম্মক্ষম রাখিবে।"

সাধনে একনিষ্ঠা ও বহুদেববাদ

কুমিল্লা জেলান্তর্গত রহিমপুর-নিবাসিনী জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"লক্ষ্মী, কালী, ভগবতী, সরস্বতী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভগবানকে পূজা করিবার বা অঞ্জলি দিবার তোমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। তোমরা এমন এক মহামন্ত্রের সাধনা করিতেছ, যাহার ভিতরে কালী, লক্ষ্মী, প্রভৃতি সকলেই আছেন, সকলেরই নাম যাহার ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে। একটী জিনিষের ভিতরে নিজেকে অর্পণ করিলে যখন সকলের পূজা হইতে পারে, তখন কেন তোমরা শত শত দেবতার পূজায় মত্ত হইয়া নিজেদের ধ্যান ও মনের একতানতা নষ্ট করিবে? বারো মাসে তেরো দেবতার পূজা না করিয়া বারো মাসে বারো বার একটী

অখণ্ড-বিগ্রহ ওঙ্কারের পূজা কর। তিনশত পঁয়ষট্টি-দিনে তিন শত পঁয়ষট্টি জন দেবতার চরণে মাথা না খুঁড়িয়া তিন শত পঁয়ষট্টি দিন তিন শত পঁয়ষট্টি বার একমাত্র অখণ্ড-বিগ্রহের চরণেই মাথা নত কর। একটী দিনে তিন বেলা তিন জন দেবতার তিন মূর্ত্তি ধ্যান ও তিন রকমের পূজা না করিয়া একই দিনে তিনবার একমাত্র অখণ্ড-বিগ্রহেরই ধ্যান কর, অখণ্ড-মন্ত্রেরই জপ কর, অখণ্ড-সাধনারই নিমগ্ন হও। নিজের অভ্যাসকে কেন তোমরা বারংবার বারো দিকে পরিচালিত করিয়া বিগড়াইয়া দিবে? অভ্যাসকে খাঁটি রাখ এবং একনিষ্ঠ কর। একটী বস্তুর মধ্যে সব-কিছু আছে, ইহাই তোমার সর্ব্বস্ব-ধন ইহাই তোমার পরম রত্ন, ইহাই তোমার জীবনের পরমাবলম্বন, ইহাই তোমার প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। একথা জানিয়া সমালোচকদের সুতীব্র সমালোচনার প্রতি একেবারে উদাসীন হও। কাণে তুলা দাও। শুধু কাণে তুলা দিলেই চলিবে না, পিঠেও কুলা বাঁধিতে হইবে। কেন না, তোমার একনিষ্ঠা দেখিয়া সাধন-পিপাসার একমুখিনী গতির দৃঢ়তা দেখিয়া তোমাকে কেহ উৎপীড়নও করিতে পারে। সুতরাং সেই উৎপীড়নকে অগ্রাহ্য করিবার জন্যও তীব্র সঙ্কল্প পোষণ কর। বহু দেববাদ তোমাদিগকে মিলিত হইতে বাধা দিতেছে, তোমাদের ঐক্য, সঙ্ঘবদ্ধতা, পারস্পরিক সপ্রেমতা, অঙ্গাঙ্গিভাব এবং একের প্রতি অপরের পরম-মমত্ববোধকে বিনাশ করিয়াছে। যে যাহা বলিবার বলুক, কর্ণপাতও করিও

না, নিজের মতে দৃঢ় থাকিয়া সাধন-মার্গে একনিষ্ঠাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আবশ্যকতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লও।

"অবশ্য যাহারা বহু দেবতার পূজা করে, তাহাদের তোমরা শান্তি-ভঙ্গ করিও না, কায়িক, বাচিক বা মানসিক কোনও প্রকারে তাহাদের উদ্বেগের কারণ হইও না, কোনও রূপে তাহাদের মনে ক্লেশোৎপাদন করিও না। কিন্তু নিজের ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা রাখ অব্যভিচারিণী। স্বপ্নেও কখনও অন্য মন্ত্র, অন্য বিগ্রহ বা অন্য সাধনের বিষয় কল্পনা করিবে না।"

যৌবনের চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রশমনের উপায়

কুমিল্লা জেলান্তর্গত হাজিগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যৌবনে মন পঙ্কিল হইয়াই থাকে। ইহা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তুমি সেই পঙ্কিল মনকে প্রত্যাহার-সাধনের দ্বারা সর্ব্বদা পরিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা কর। নারী-মাত্রকেই মাতা জ্ঞান করিয়া এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হয়। যৌবনে নারীদেরও মনের এই উদ্দাম অবস্থা আসিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা অনেকেই পূর্ণযৌবনপ্রাপ্তা হইবার আগেই বিবাহিতা হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের মনের সকল উদ্দামতা তাহাদের প্রিয় স্বামীকে কেন্দ্র করিয়া চলে। ইহার এক ফল মনের

বিপথে না যাওয়া, অপর ফল স্বামীর প্রতি প্রীতি, অনুরাগ ও মমত্ববোধ বৃদ্ধি পাওয়া। কিন্তু যাহারা যৌবন-প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা হয় না, তাহাদের মন অনেক সময়ে উচ্ছৃঙ্খল হইতে চেষ্টা করে কিন্তু পারিবারিক প্রতিবেশ ভাল হইলে বিবেক-বিচার দ্বারা, সদসদ্ বিবেচনার দ্বারা, চিন্তা ও কার্য্যের পরিণাম-চিন্তা দ্বারা, আবাল্য-পোষিত সংসংস্কার-সমূহের দ্বারা, পুরুষ মাত্রেরই প্রতি সন্তান-ভাব পোষণের দ্বারা এবং ভগবানকেই নিজের একমাত্র জীবন-প্রভু ও সকল প্রেমের পাত্র বলিয়া জ্ঞান করতঃ ইহারা অনায়াসে এই নক্র-কুম্ভীর সমাকুল যৌবন-সমুদ্রের তরঙ্গাকুল আক্রোশ তুচ্ছ করিয়া পূর্ণ শুদ্ধতার পবিত্র তীরভূমিতে গিয়া উপনীত হয়। তোমার এক্ষণে অবলম্বনীয় হইতেছে ইহিই। বৃথা বিবাহের চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়া দিয়া মনকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিও না।

যৌবনের সদ্ব্যবহার কর

"অনেকে বলিয়া থাকেন, যৌবনকে ভোগ করিয়া লও, যৌবন চলিয়া গেলে আর ভোগ করিবে কখন? তাঁরা বলেন, শেলী-শেক্স্‌পীয়ার সংযমের ধার ধারিতেন না, আমাদের দেশেরও নামজাদা কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক বাহিরের আচরণে নিতান্ত বেপরোয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের প্রতিভার বিকাশের কোনও বাধা হয় নাই। এসব

উন্মত্তের প্রলাপ তোমরা শুনিও না। এমন কথার ভিতরে স্ববিরোধী কত উক্তি যে আছে, বলিবার নহে। এই সব কথায় কর্ণপাত করিয়া মনকে তোমরা দুর্ব্বল করিও না। যাহারা অন্তরে অন্তরে ভোগের চর্চ্চা করিয়া একেবারে জীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু বংশানুক্রমিক মেধাশক্তির অধিকারী হইয়া সেই ভিতরের জরাজীর্ণ হীনাবস্থাকে ভাষার জৌলুষে ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, এসকল হইতেছে তাহাদের উক্তি। অন্তঃসারহীন আত্মসুখাভিলাষী বিলাসীর সাহিত্যরসপ্রক্ষিপ্ত পাপস্তনে শ্রদ্ধা করিয়া তোমরা তোমাদের জীবনের বীর্য্যে জলাঞ্জলি দিও না। আমি তোমাদিগকে যৌবনের সহিত অসহযোগ করিবার উপদেশ দেই নাই, উপদেশ দিয়াছি যৌবনকে চিরস্থায়ী করিবার উপদেশ। নায়ক নায়িকা না হইলেই জীবনে কাব্য ফুটিবে না, ইহা মানুষের অন্ধ কুসংস্কার। তোমরা মানুষের সকল কুসংস্কারে উপেক্ষা করিয়া মেরুদণ্ডের দৃঢ়তার পরিচয় দাও। যৌবনের আবেশের তোমরা অধীন হইও না, যৌবনকে তোমরা তোমাদের জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনের সুশিক্ষিত বাহন কর, যৌবনের সদ্ব্যবহার কর। জিনিষের অপব্যবহারে হিসাবের প্রয়োজন আসে না, কিন্তু সদ্ব্যবহার করিতে হইলেই হিসাব আসে, সংযম আসে। নিজের চিন্তা, ইচ্ছা, উক্তি ও কর্ম্মকে হিসাব করিয়া পরিচালিত করিবার নাম সংযম,—নিজেকে অনন্ত কাল অপীত অভুক্ত রাখিয়া কুম্ভকর্ণকে করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া দিবার নাম সংযম

নহে। তোমার যৌবনকে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে আনিবার জন্যই তোমার সংযম প্রয়োজন, তোমার যৌবনকে অসার্থক, মিথ্যা ও অনর্থক করিয়া দিবার জন্য সংযম নহে।"

এক পত্নী থাকিতে পুনঃ পত্নী-গ্রহণ

কুমিল্লা জেলান্তর্গত ঘোয়ালিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার প্রথমা পত্নী অবাধ্য, কলহ-পরায়ণা, পরশ্রীকাতরা, কুৎসিত ও বোকা বলিয়া যে তুমি আর একটী বিবাহ করিতে চাহিতেছ, তোমার সেই দ্বিতীয়া পত্নী দেখিতে যে সুশ্রী হইবে, ইহা বরং চক্ষু দিয়া পরখ করিয়া লইতে সমর্থ হইলে, কিন্তু সে শান্তস্বভাবা সুবিনীতমনা ও বুদ্ধিমতী হইবেই, তাহা তুমি তাহার মুখের শ্রী আর গাত্রচর্ম দেখিয়া কি করিয়া স্থির করিবে? এখন তুমি দেখিতে কালো এক আফিমের গুলি সেবন করিতেছ, যাহার বাহির ও কুৎসিত, ভিতর ও কুৎসিত। কিন্তু তখন হয়ত এক মাকাল ফল সেবন করিয়া অধিকতর বিষের জ্বালা সহ্য করিতে বাধ্য হইবে, যাহার বাহিরখানা লাল টুকটুকে কিন্তু ভিতরটা একেবারে শ্মশানের অঙ্গার। আজ একটী স্ত্রীর ভিতরে দয়া, মায়ার অভাব দেখিয়া আর একটী স্ত্রী গ্রহণের কথা কত উৎসাহে ভাবিতেছ, কিন্তু অপরা স্ত্রীটি হয়ত নির্মমতার অবতার হইতে পারে, নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ হইতে পারে। বর্ত্তমান পত্নী তোমাকে অমান্য করে, কলহ করে, ভাবী-পত্নী হয়ত নিজ হাতে তোমাকে হলাহল পান করাইয়া হত্যা পর্য্যন্ত করিতে সক্ষমা হইতে পারে। তুমি যেমনটী চাহিতেছ, তোমার ভাবী দ্বিতীয়া পত্নী ঠিক্ তেমনটীই হইবে, নিজের মনকে তুমি এমন ভরসা কিসের বলে দিতে সাহসী হইতেছ?

"অথবা বাহির হইতে আর একটী ভালো মেয়েই তোমার পত্নীরূপে জুটিয়া গেল। সে আসিয়া এই অবাধ্য ও ঝগড়াটে সপত্নীর সহিত স্বামী লইয়া নিত্য অস্বস্তিকর কলহে পড়িতে বাধ্য হইয়া কি ক্রমশঃ নিজের ধীরতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, বিনয়, নম্রতা, কোমলতা ও মাধুর্য্য সবই আস্তে আস্তে হারাইবে না? অসৎ সংসর্গে পড়িয়া একটী কোমলা বালিকা কতদিন নিজের চরিত্রের মধুরতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইবে? যুদ্ধক্ষেত্রের এক পক্ষে ধর্ম্মভীরু, জিতেন্দ্রিয়, ক্ষমাপরায়ণ, মিতভাষী, সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ যুধিষ্ঠির থাকা সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্রের মহারণ কুরুকুল ও পাণ্ডবকুল উভয় কুলই সমূলে নির্ম্মূল করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা মনে রাখিও।

"যদি বল যে, দ্বিতীয়া পত্নীকে ঘরে আনিবার পরে প্রথমা পত্নীকে তাহার দাসীর ন্যায় থাকিতে বাধ্য করিবে, তাহা হইলেও বিবেচনা করিয়া দেখ, অবিচারই তুমি করিবে। স্বামীর সম্পর্কে স্ত্রী, অন্তরের অনুরাগ থাকিলে দাসী হইয়াও কৃতার্থ বোধ করে, সপত্নী সম্পর্কে তাহা হওয়া ত' স্বাভাবিক

নহে। সুতরাং একদিকে তোমার তরফ হইতে হইবে অবিচার, অপর দিকে তোমার প্রথমা পত্নীর তরফ হইতে সুরু হইবে তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণের চেষ্টা।

"যদি বল যে, দ্বিতীয়া পত্নীকে ঘরে আনিবার পরে প্রথমা পত্নীকে তাহার পিতার গৃহে ফেরৎ পাঠাইবে, তাহা হইলে, তাহার পিতা তাহাকে প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। বিবাহ দিবার কালে সেই ভদ্রলোক জামাতা-বাবাজীর সন্তোষের জন্য কম অর্থ ব্যয় করেন নাই এবং কন্যাকে তিনি চিরকাল ভরণ-পোষণ করিতে পারিবেন না বলিয়াও তাঁহাকে পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। আসিবে খোর-পোষের মামলা, হইবে অপযশ ও কেলেঙ্কারী। এগুলি একেবারে চিন্তা না করিয়া কোনও কাজ কি তুমি করিতে পার?

"আরও একটী কথা আছে। মানুষ-মাত্রেরই জান্তব একটা দিক্ আছে। তোমার যে স্ত্রী তোমার মনোরঞ্জন করিতে পারিল না বলিয়া তোমার দ্বারা আজ পরিত্যক্তা হইতে যাইতেছে, তাহার ভিতরের ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা যদি তাহাকে ব্যভিচারে প্ররোচিত করে, সেই ব্যভিচারের দায়িত্ব কে নিবে? একটী স্ত্রী দুর্বিনীতা বলিয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়া দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করতঃ তাহার সঙ্গে চির ব্রহ্মচর্য্য ত' আর পালন করিবে না, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাও মিটাইবে। বলিতে কি, তোমার পুনরায় দার-পরিগ্রহের আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে

ইহাই হয়ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ। তুমি যদি ভোগ-সুখের প্রমত্ততা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে না পার, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীকে তুমি পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া ব্যভিচার বর্জ্জন করিয়া চলিতে বাধা করিবে কোন্ নৈতিক আদর্শের দোহাই দিয়া, কোন্ নৈতিক দৃষ্টান্তের প্রভাব দিয়া? পুরুষে বহুনারী সেবন করিলে দোষ হইবে না আর নারীরা বহু-পুরুষের আস্বাদন করিলেই দোষ হইয়া যাইবে, ইহা কোন্ দেশী বিচার? সুতরাং তোমাকে তোমার প্রথমা পত্নীর উপরে এই অধিকারও ন্যস্ত করিতে হয় যে, সে বৈধভাবে সামাজিক সম্মতিতে দ্বিতীয় পতি সংগ্রহ করিয়া নিতে পারিবে। আর, ইহা করিতে গেলেই বিবাহটাকে আইনসিদ্ধ করিবার প্রয়োজনে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ করাইয়া নিতে হয়, যেই আইনটা সম্পর্কে দুই একজনে দুই একবার যে মাঠে ঘাটে প্রস্তাব তুলিয়াছে, তাহাতেই তোমরা খড়্গহস্ত হইয়া তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছ।

"যদি বল যে, প্রথমা-পত্নীকে পিতৃগৃহেও নির্ব্বাসিত করিবে না কিম্বা পত্যন্তর গ্রহণের অধিকারও দিবে না, পরন্তু নিজ গৃহেই দুই জনকে রাখিয়া দুই জনের প্রতি সম-ব্যবহার করিয়া চলিবে এবং একজনে যখন নিজ নিকৃষ্ট স্বভাবের দ্বারা অন্তরে পীড়া উৎপাদন করিতে থাকিবে, তখন অপর জনের মৃদুমধুর প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা চিত্তে শান্তির প্রলেপ লাভ করিবে। শারীরিক ভাবে দুই জনের প্রতি সমব্যবহার

করিয়া চলিবে এবং তোমার কোনও প্রকার দৈহিক উপেক্ষার জন্য তোমার প্রথমা-পত্নী পুরুষান্তরে অনুরাগ পোষণ করিতে প্ররোচিতা না হয়, ইহা সর্ব্বদা দেখিবে। এই কথা তুমি বলিতে পার না, তাহা নহে। কিন্তু বাছা, উন্নত মনের কতকগুলি লক্ষণ আছে। তাহার মধ্যে একটা এই যে, দম্পতীর মধ্যে গভীরতম প্রেম সঞ্চারিত না হইলে একে অপরের দেহকে ব্যবহার করা সম্পর্কে একেবারে নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। ভালবাসার গভীরতা মুখকে মুখে, বুককে বুকে সংলগ্ন করে। যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে রমণ একপ্রকারের শারীরিক ব্যভিচার। দুই জনকেই সমান ভালবাসিতে পারিবে না, অথচ দুই জনকেই সমান ভাবে দৈহিক পরিতৃপ্তি দিয়া যাইবে, উন্নত মনের দিক্ দিয়া ইহা এক অতীব অস্বাভাবিক ব্যাপার। তদুপরি একই দেহ দিয়া যে তুমি দুইটী রমণীর ইন্দ্রিয়-সেবা চালাইয়া যাইবে, ইহাতে তোমার দেহটী লজ্জিত হইবে না? পশ্চিমারা পাইখানার ঘটিটা পুরাতন হইয়া গেলে নূতন ঘটি আমদানী করিতে লজ্জিত হয়, কেন না, নিজের গুপ্ততা একজনের সম্পর্কেই পরোয়াহীন হইতে পারে, জনে জনের কাছে নহে। বিবাহের মধ্যে যখন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার একটা রহিয়া গিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের গুপ্ততার বিষয়ে যখন সভ্য মানব একটা বদ্ধমূল সংস্কার গঠন করিয়া লইয়াছে, তখন একই সময়ে একাধিক নারীর নিকটে সেই সংস্কারকে বিসর্জ্জন দেওয়া এক-প্রকারের অসভ্যতা কিনা ভাবিয়া দেখিও।

"সুতরাং আমি বলি কি জানো? যতদিন প্রথমা পত্নী জীবিতা আছে, ততদিন দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণের কল্পনা ত্যাগ কর। আর যদি তার পরমায়ু তাহাকে দীর্ঘকালই বাঁচাইয়া রাখে, তবে তাহাকে লইয়া ঘর করিয়া জীবনে সহিষ্ণুতার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। একদা তুমি কল্পনা করিতেছিলে যে, আমৃত্যু-ব্রহ্মচারী থাকিয়া দেশের সেবা করিবে। সেই তুমি একণে পত্নীর পর পত্নী গ্রহণ করিয়া বিপত্তির পর বিপত্তি আহরণ করিতে প্রলুব্ধ হইও না। অন্তরের বাসনা বড়ই মায়াময়ী, সে ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলিয়া বুঝাইয়া দিবে। সে তোমার সহিত ছলনা করিবে। তাহার ছলনায় ভুলিও না। একান্ত ভাবে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ কর। ঈশ্বরে আত্মসমাহিত হইয়া বাহিরের অশান্তি ভুলিতে চেষ্টা কর। দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিলেও তোমার প্রথমা পত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মিবে। কিন্তু তুমি ভগবানকে ভুলিয়া রহিয়াছ বলিয়া তোমারই ঔরসজাত এই সন্তানগুলি মাতার দোষই পাইবে, তোমার গুণগুলি পাইবে না। তুমি সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত অধ্যবসায় করিয়া ঈশ্বর-নিষ্ঠার গুণে নিজের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলির বিকাশ কর।

"অবশ্য আমি একটা স্থলে এক পত্নী থাকিতেও আরও পত্নী গ্রহণ সমর্থন করি। সেইটী হইতেছে, দেশের বা জাতির এমন বিপজ্জনক অবস্থা, যেই সময়ে তাহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন পড়িয়াছে। প্রত্যেকটী পত্নীকে তখন

দেশের কুশল চাহিয়া গর্ভ ধারণ করিতে হইবে, প্রত্যেকটী পতিকে তখন সেই একই লক্ষ্যে গর্ভাধান করিতে হইবে। একদা যখন পরশুরামের ক্ষত্র-নিধন-ব্রতের ফলে পৃথিবী ক্রমাগত এক-বিংশবার নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছিল, তখন ক্ষত্রিয়-রমণীরা ক্ষত্র জাতির পুনরভ্যুদয়-মানসে হিমালয়ের গুহাবাসী তপশ্যারত ব্রাহ্মণ ঋষিদের কাছে ঔরস গ্রহণ করিয়া নিজ জাতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। লোকাচারে এইরূপ ব্যাপার দূষণীয় হইলেও আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে ইহা তাঁহাদিগকে করিতে হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সেই ক্ষত্রজাতির বংশধরেরা ভারতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই বরং পরস্পর আত্মকলহে প্রমত্ত হইয়া খাল কাটিয়া বারংবার এদেশে কুমীর আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু পরশুরামের ভুজ-বীর্য্যে নিহত ক্ষত্রিয়কুলের কুমারী কন্যা ও বিধবা পত্নীরা সেই সময়ে নিজ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য আপদ্ধর্ম্মের অতি প্রশংসনীয় সুপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বহুবিবাহেরও সেইরূপ সুপ্রয়োগ প্রয়োজন হইলে তোমরা করিবে। ভাবী কালের আইন যদি তোমাদিগকে এই বিষয়ে বাধা দেয়, তাহা হইলেও তোমাদের ধর্ম্মগুরু হিসাবে এই অধিকার আমি তোমাদিগকে দিয়া যাইতেছি। হজরৎ মহম্মদ তাঁহার শিষ্যগণকে চারিটী পর্য্যন্ত বিবাহের যে অধিকার দিয়া গিয়াছেন, ভারতের আইন তাহাকে বিলোপ করিবার সাহস রাখে না। আমিও তোমাদের ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে

তোমাদিগকে যেই অধিকার দিয়া গেলাম, ভাবিকালের কোনও আইন তাহার বিরুদ্ধে প্রণীত হইলেও জাতির প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে তোমরা তাহার পরোয়া রাখিও না, রাখিতে বাধ্য নহ। কিন্তু সেইরূপ গুরুতর আপৎকাল ইহা নহে।

জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর পাইবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি ঐ পত্রেই লিখিলেন,—

"আরও একটী কথা তোমাদের প্রত্যেকের মনে রাখিতে হইবে যে, নিজ ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের বাসনাকে দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে সাজাইয়া মানুষ দুই চারিজন প্রতিবেশীকে ঠকাইতে পারে বা আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে পারে কিন্তু পরমেশ্বরকে ঠকাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহ এবং স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্যে বিবাহ কদাচ একই ফল প্রসব করিতে পারে না, করিবে না। অনেকে দয়া দেখাইবার জন্য অতিরিক্ত বিবাহ করে কিন্তু এই দয়া দয়া নহে, প্রচ্ছন্ন কাম। অনেকে অনাথাকে আশ্রয় দিবার জন্য বিবাহ করে, এই সেবা পরসেবা নহে, নিজের ইন্দ্রিয়-লোলুপতারই সেবা। কুযুক্তি দিয়া নিজেকে বিপথ-চালিত করিও না। ভাল করিয়া যুক্তি বিন্যাস করিতে পারিলেই কামকে কখনও প্রেম বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিবে না। কাম চিরকাল সন্তাপ আনিবে, প্রেম চিত্তকে দিবে মনোহারিত্ব

ও পূর্ণতা। কাম দিবে জ্বালা ও দুঃখ, প্রেম জ্বালা নিবাইবে, দুঃখ হরণ করিবে। বিষপিণ্ডকে রসগোল্লা বলিয়া গলাধঃকরণ করিলে রসগোল্লা-ভোজনের সুফল পাইবে না, পাইবে বিষেরই দাহন। যে সকল বক্তৃরা তোমার চারিপাশে বসিয়া নানা সময়ে নানা বিজ্ঞোচিত উপদেশ মাথা ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া জোরের সহিত দিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি স্থিতপ্রজ্ঞ জ্ঞানবান্ পুরুষ না হন, তবে তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যে এবং যুক্তিতে যে সহস্র সহস্র ভুল থাকিয়া যাইতে পারে, এই কথাটি ভুলিও না। সাধারণ মানুষ এইরূপ দশ বিশ জনের কথা শুনিয়া অনুমান করে যে, বিশ্বের জ্ঞান বুদ্ধি ইঁহাদের কণ্ঠকে ও ওষ্ঠকে আশ্রয় করিয়াছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানবানের মুখেই যথার্থ জ্ঞানোপদেশ উচ্চারিত হয় এবং জগতে তেমন ব্যক্তির সংখ্যা সর্ব্বদাই কম। সুতরাং মনকে ভগবৎ-সাধনের দ্বারা প্রশান্ত কর এবং সেই প্রশান্ত মনকে বারংবার প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইবার চেষ্টা কর যে, কখন তোমার প্রকৃত কর্ত্তব্য কি? একাগ্র অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলে জিজ্ঞাস্যের উত্তর নিজের কাছেই পাইবে।"

অভিমান বিসর্জ্জন দাও

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত আমিলাইশ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অভিমান বিসর্জ্জন দাও। অভিমানীর উন্নতি অসম্ভব। ছোট কাজকে ছোট বলিয়া মনে করিও না। সকল কাজই প্রয়োজন মত তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি শুধু বড় কাজগুলিই করিবে, ছোট কাজগুলি করিবে কে? নিজেকে গুণশালী এবং নেতা বলিয়া ভ্রম করিয়া অনেক ভাল ভাল ছেলে-মেয়ে নিজেদিগকে ক্রমশঃ কর্ম্মের অযোগ্য করিয়া ফেলে। মেথরের ন্যায় পুরীষ-ভাণ্ড পরিষ্কার করিবার মত মনের বল তোমাদের থাকা চাই। কেহ কোনও কটূক্তি বা সমালোচনা করিলে তাহা নীরবে সহ্য করিবার বা একেবারে উপেক্ষায় উড়াইয়া দিবার সামর্থ্য তোমাদের থাকা চাই। কেহ তোমাকে মানিল না, গণিল না, কেহ তোমার শ্রমের মূল্য দিল না, সেবার মর্য্যাদা রাখিল না, কেহ তোমাকে আদর করিয়া, সান্ত্বনা দিয়া উৎসাহিত করিল না, তাই বলিয়া নিজের কর্ত্তব্যে ঢিলা দিও না। জগতে কেহই কাহাকে বড় করিতে পারে না। তোমার নিজের কর্ম্ম তোমাকে বড় করিবে।"

অজ্ঞানতা ও আলস্য

জলপাইগুড়ির অন্তর্গত কদমতলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের শুভ হউক, দেশ হইতে অচিরে অজ্ঞানতা

আর আলস্য এই দুইটী মহাশত্রুকে দূর করা। এই দুইটী মহাশত্রুই আমাদের দেশকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞানতা ও আলস্য পরপদলেহীর নিত্য সঙ্গী। যে পরপদলেহন করিবে, অজ্ঞানতা তাহার অবশ্যম্ভাবী, আলস্য তাহার সুনিশ্চিত। আর যে অজ্ঞানতা দূর করিবে না, অলসতাকে সবলে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কর্ম্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্য আগাইয়া আসিবে না, চিরপরাধীনতা তাহার নিত্যকালের ললাট-লিখন। গ্রামে গ্রামে জ্ঞানের মশাল লইয়া তোমরা প্রবেশ কর, অজ্ঞানতার আড্ডাগুলি জ্বালিয়া পুড়িয়া ছারখার করিয়া দাও। পুরুষকারের উদ্যত কৃপাণ লইয়া গৃহে গৃহে প্রবেশ কর এবং আলস্য-তন্দ্রিত ভারতবাসীকে অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিতে বাধ্য কর। বিলম্ব করিবার অবসর নাই, কাল-প্রতীক্ষার অধিকার নাই। মহাবীর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও আত্মকলহে যাহা হারাইয়াছ, আজ তাহা পুনরায় লাভ সম্ভব কর, সর্ব্বপ্রথমে অজ্ঞানতা ও আলস্যকে ধ্বংস করিয়া। অজ্ঞান জাতি কর্ম্মপর হইলে জগতে বড়জোর অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া বর্ব্বরতার রোমাঞ্চকর কাহিনী সমূহ রাখিয়া যাইবে। অলস জাতি জ্ঞানবান্ হইলে জগতে বড়জোর কতকগুলি পুঁথি-পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়া কাগজে কলমে মহত্ত্বের অহমিকা রাখিয়া যাইবে। তোমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে জ্ঞানের সহিত কর্ম্মকে সুসমঞ্জস করিবার জন্য।"

শুচিতা ও শুচিবায়ু

ঢাকা রহমৎগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বদা শুচি থাকিতে চেষ্টা করিবে। দেহে বা মনে অপবিত্র স্পর্শ কোনও দিক্ দিয়া না আসিতে পারে, এই বিষয়ে সতর্কতা ঐহিক ও আধ্যাত্মিক দিক্ দিয়া মঙ্গলজনক। কিন্তু তজ্জন্য শুচিবায়ুগ্রস্ত হইবে না। সর্ব্বদা পবিত্রতা-স্বরূপ পরম প্রভুকে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে তাঁর মধুময় হাসি লইয়া বিরাজিত বলিয়া ধ্যান করিবে। তাঁর জ্ঞানশক্তি তোমাকে অজ্ঞানের সহিত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দিবে, তাঁর প্রেমশক্তি তোমাকে কামের ঊর্দ্ধদেশে স্থাপিত করিবে, তাঁর নিত্যশুচিতা তোমাকে স্বভাবতই ভিতরে বাহিরে শুচি করিয়া দিবে। তাঁহার নামের প্রবাহে নিয়ত অবগাহন করিবে। তাঁহার নামের স্পর্শে দেহ-মনকে নিয়ত স্নিগ্ধ ও পবিত্র রাখিবে।"

বিদ্যাভ্যাসের আবশ্যকতা

ঢাকা টিকাটুলী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

'বিদ্যাভ্যাস কোনও অবস্থাতেই বন্ধ রাখিও না। বিঘ্ন, বিপত্তি বিপর্য্যয় যেই দিক্ দিয়াই যত আসুক, বিদ্যার্জ্জন বন্ধ

থাকিতে পারে না। হাজার বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়াও বিদ্যার্জ্জনশীলতা অটুট রাখিতে হইবে। এক একটা দেশে মহামারী লাগে, যুদ্ধ বাঁধে, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তার ভিতরেও শিক্ষা দিয়া যান। যে দেশে ইহার অন্যথা হয়, দেখিতে না দেখিতে সেই দেশ বন্য বর্ব্বরের দেশে পরিণত হয়। গৃহদাহ, নারী-ধর্ষণ, লুণ্ঠন প্রভৃতি অপকার্য্য করিতে বিদ্যার প্রয়োজন পড়ে না, সভ্যতা বা কৃষ্টির কোনও ধার এসব কাজ ধারে না। কিন্তু জগতের বুকে শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বনমানুষের মত বাঁচিয়া না থাকিয়া প্রকৃত মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে বিদ্যার্জ্জনের অবাধ ব্যবস্থা রাখিতেই হইবে।"

সামঞ্জস্যের জীবন

ঢাকা নবাবপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের প্রত্যেকের কর্ম্মপথ জ্ঞানময়, তপঃপথ প্রেমময় এবং দেহমনপ্রাণের প্রত্যেকটী তরঙ্গ মঙ্গলময় হউক, নিয়ত এই আশীর্ব্বাদ করি। তোমাদের জীবন হউক সামঞ্জস্যের জীবন। কর্ম্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তি চিরকাল নাকি কলহই করিয়াছে। তপস্যার সম্পর্কে প্রেম নাকি চিরকাল সংস্পর্শ বাঁচাইয়া চলিয়াছে। মানবের দেহমনপ্রাণের তরঙ্গগুলি চিরকাল

নাকি অবিরাম অমঙ্গলই প্রসব করিয়াছে। আমি চাহি, তোমরা তোমাদের জীবনের প্রত্যোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়া মানব-মনের সেই কল্পনাকে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত কর। কর্ম্ম কর জ্ঞানী হইয়া, তপস্যা কর প্রেমী হইয়া, দেহমনপ্রাণের তরঙ্গগুলিকে সহস্র গুণ বাড়াইয়া বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দুরন্ত আক্রোশের মধ্য দিয়া আহরণ কর শুধু অবিমিশ্র মঙ্গল।"

কাজে লাগিয়া থাক

ঢাকা নারিন্দা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাজ-কর্ম্মের মন্দা দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না। লাগিয়া থাক। ছোট হউক, বড় হউক, নিজের কাজে নিজে জিদ্ করিয়া লাগিয়া থাকিলে একদিন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, একদিন সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। তুমি সেই সময়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া নিজেকে নিরুপায় ভাবিয়া কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে, হয়ত তাহার একটী মাস পরেই এমন এক সুযোগ আসিয়া যাইবে, কাজ ছাড়িয়া দেওয়ার দরুণ আর যাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছ না। দশ দিকে মন না দিয়া শত বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়াও নিজ কাজে লাগিয়া যাও। যে লাগিয়া থাকে, জয় তাহারই হয়। বারংবার কর্ম্মে বিরতি দিলে সিদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পায়, পুনঃ পুনঃ মত-পথ বদলাইলে কোনও কল্যাণকেই আয়ত্ত করা যায় না।"

ভগবদনুরাগকে গোপন করা বনাম প্রকাশ করা

ঢাকা আরমানিটোলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অন্তরের সুগভীর ভগবদনুরাগকে সযত্নে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বাহিরে সাধারণ মানুষের ন্যায় জীবন যাপন করা এক মহাকৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু সামান্য ব্যক্তি কখনও এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। ভিতরের অনুরাগকে গোপন করিবার জন্য বাহিরে ভগবদ্বিদ্বেষী বা নাস্তিক সাজিবার চেষ্টা কিন্তু আবার বড়ই আত্মঘাতমূলক। সেইরূপ চেষ্টা কখনই এবং কোনও অবস্থাতেই প্রশংসনীয় বা সমর্থনযোগ্য নহে। অন্তরের অনুরাগকে বাহিরে প্রকাশ করিলে লোকমান আসে, এজন্য ইহা অবাঞ্ছনীয়। কেননা, লোকমান যেভাবে সাধকের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমন ক্ষতি অন্য ভাবে খুব কমই হইয়া থাকে। ভগবৎ প্রেমের অতি উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া লোকমানের দৌরাত্ম্যে মহান্ সাধকেরও হঠাৎ গভীর নিম্নে অধঃপতন ঘটিয়া যায়। কিন্তু অন্তরের ভগবদনুরাগকে বাহিরে প্রকাশ হইতে দিবার পশ্চাতে যদি লক্ষ্য থাকে অনুরাগ-বৃদ্ধির আনুকূল্য সৃষ্টি করা, দশ জনকে ভগবদ্-বিশ্বাসী করিয়া নিজের প্রতিবেশকে ভজন-অর্থে বাধাহীন করা, চতুর্দ্দিকের নানা দুষ্প্রবৃত্তি ও প্রলোভনের শক্তি হ্রাস

করা, তাহা হইলে প্রাণের প্রেমকে বাহিরে প্রকাশ করিতে দেওয়া দোষের ত' নহেই, বরং গুণের; ক্ষতির ত' নহেই, বরং লাভের। কিসে প্রকৃত লাভ, কিসে প্রকৃত ক্ষতি, তাহার বিচার করিয়া প্রাণকে প্রকাশ কর বা ঢাকিয়া রাখ। এই বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বা সকল অবস্থায় নির্বিচারে একই উপদেশ হইতে পারে না।"

সপরিবারে ঈশ্বর-সাধন

শ্রীহট্ট জেলান্তর্গত ইনাথগঞ্জ-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পরিবারস্থ প্রত্যেকটী প্রাণীকে ডাকিয়া লইয়া এক সঙ্গে সমযত্নে ভগবদারাধনা করিবে, ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? বিরুদ্ধবাদিনী স্ত্রী, বিপথগামী পুত্র, বুদ্ধিহীনা কন্যা সকলকে আনিয়া ভগবানের চরণ-তলায় ফেলিয়া দিবার গৌরব নগণ্য বস্তু নহে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃবধূ, ভগিনীপতি, শ্যালক ও শ্যালিকা সকলকে আনিয়া আধ্যাত্মিক-গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতঃ সকলকে লইয়া ভগবানকে ডাকা, সকলকে লইয়া নামজপ, নামকীর্ত্তন, সমবেত উপাসনা করা, সকলকে লইয়া ইষ্ট অনুরাগবর্দ্ধক সাহিত্য বা শাস্ত্র পাঠ, শ্রবণ ও আলোচনা করা গৃহস্থের পক্ষে এক পরম গৌরব। এই গৌরব ও সৌভাগ্য হইতে কেন তুমি বঞ্চিত রহিবে? নিজের নিষ্ঠার অকপটতা

নিয়া, নিজের অনুরাগের গভীরতা দিয়া তোমার প্রত্যেকটী আত্মীয় বা পরিজনকে ভজন-কেন্দ্রে টানিয়া লও। যে যেই জীবিকা নিয়া যেখানে থাকুন, তাহার প্রাণটী যেন তোমার পরমপ্রাণারাম বিশ্বদেবতার বিগ্রহটীর পায়ে নিয়ত লুন্ঠিতাবলুন্ঠিত হইতে থাকে,—এমন ভাবে তাহাকে আকর্ষণ কর। একজনকেও ছাড়িয়া দিও না, একজনকেও বাদ দিও না, একজনকেও দূরে সরিয়া যাইবার সুযোগ দিও না। সকলকে প্রেমালিঙ্গনে জড়াইয়া ধর, সকলকে প্রাণের গভীর আকর্ষণে টানিয়া আনিয়া একত্র সম্বদ্ধ কর, বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থিত প্রত্যেককে আনিয়া একটী স্থানে নিবেশিত কর, ভেদ-বিচ্ছেদ-দূরত্বে অভ্যস্ত প্রাণগুলিকে আনিয়া এক কর, অভিন্ন কর। ভগবানকে ডাকিবার কালে যে বুকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল না, ভগবন্নামের মধুর স্তোত্র-কীর্ত্তনের কালে যে তার নিজের কণ্ঠ তোমার কণ্ঠের সাথে মিলাইল না, সে তোমার কিসের আত্মীয়, কিসের বান্ধব? ইহাদিগকে বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করা ত' নরকের সহিত সখ্যতা স্থাপন মাত্র।"

ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কাশিমবাজার-নিবাসী এক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব কতখানি গভীর এবং কতখানি ব্যাপক, তাহা আপনারা চিন্তা করিতে চেষ্টা করুন।

ছাত্রকে সিলেবাস্ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকে পণ্ডিত করিয়া তাহাকে দিয়া পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাওয়াইয়া পাশের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলেই আপনার স্কুলের গৌরব বাড়িবে না। আপনার ছাত্র পরবর্ত্তী জীবনে দেশ, সমাজ এবং জগতের কল্যাণের জন্য কোথায় কি মহনীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হইল, তাহা দিয়া আপনার বিদ্যালয়ের গৌরব, আপনার শিক্ষকতার গৌরব। কত শিক্ষক কত ছাত্রকে বি-এল-এ গ্রে, সি-এল্-এ গ্রে শিখাইলেন, ছাত্র যাইয়া অধীত বিদ্যা পরপীড়নে, পরস্বাপহরণে, পরানিষ্ট-সাধনে, অন্যায়াচরণে, কদর্য্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করিল। তাহাতে শিক্ষকের বা শিক্ষালয়ের কোন্ মর্য্যাদাটা বাড়িল? কিন্তু যে শিক্ষকের ছাত্রেরা, যে শিক্ষালয়ের ছাত্রেরা দেশের জন্য প্রাণ দিল, দশের জন্য দুঃখবরণ করিল, ভগবানের জন্য ধ্রুব-প্রহ্লাদের ন্যায় ব্যাকুল হইল, নারদের ন্যায় নামগান করিল, কর্ণের ন্যায় দান করিল, ভীষ্মের বা হনুমানজীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিল, ধন্য সেই শিক্ষক, ধন্য সেই শিক্ষালয়। এই শিক্ষক ও শিক্ষালয় জগতে অমর হইয়া থাকিবেন। উদরের তাড়নায় শিক্ষকতা-বৃত্তি নিয়াছেন বলিয়াই আপনারা আপনাদের এই মহৎ দায়িত্ব এবং গৌরবকে ভুলিয়া থাকিবেন? মানুষ-হিসাবে ভাবিয়া দেখুন, সেই অধিকার আপনাদের আছে কিনা। শিক্ষক ছাত্রের শুধু শিক্ষাদাতাই নহেন, পিতাও বটেন। ভাবিয়া দেখুন, চরিত্রগঠনের দিক্ দিয়া, মনুষ্যত্বের উদ্দীপনের দিক্ দিয়া, কর্ত্তব্যজ্ঞানের উন্মেষণের দিক্ দিয়া

নিজেদের আচরণে, নিজেদের বাক্যে ও চিন্তায় সেই পিতৃ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন কিনা। নানা প্রকার উন্মার্গগামিনী চিন্তার সংস্রবে আসিয়া ছাত্রেরা শিক্ষকগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ হারাইয়া ফেলিতেছে, ইহা সত্য। কিন্তু ইহার সবটাই তাহাদের দোষ নহে। আপনারা নিজেদের কর্ম্ম বা চিন্তা দ্বারা, বাক্য বা প্রভাব দ্বারা তাহাদের অন্তরে শ্রদ্ধাকে, সম্ভ্রম-বোধকে, ভালবাসাকে উদ্রিক্ত করিতে পারিতেছেন না। আপনারা ছাত্রদিগকে এক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, নিজের পুত্রকে অপর দৃষ্টিতে দেখেন। ঔরসজাত পুত্র হইতে ছাত্ররা যে ভিন্ন নয়, এই কথাটি তাহাদের মনে আপনারা জাগাইয়া দিতে পারিতেছেন না। অশিক্ষিত গ্রাম্য পিতা পুত্রের প্রতি যে কর্ত্তব্যগুলি পালনে অসমর্থ বিধায় পুত্রের জীবন অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে, শিক্ষিত শিক্ষক ছাত্রদের প্রতি সেই কর্ত্তব্যগুলি পালনে যত্নবান্ হইতেছেন না। ফলে, তাহাদের ভিতরে শ্রদ্ধার সাত্ত্বিকী বৃত্তি উন্মেষিত হইতে পারিতেছে না। আপনাদের আচরণ ছাত্রদের বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হউক যে, আপনাদের ঋণ তাহাদের অপরিশোধ্য। তাহারা বুঝিতে সমর্থ হউক যে, পিতা মাতা ও শিক্ষক প্রায় সমান সম্মানের পাত্র। তবে ত' তাহারা প্রাণ ভরিয়া আপনাদিগকে ভালবাসিবে, ভক্তি করিবে এবং আদেশ পালনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইবে। আপনারা কেন আজ ভুলিয়া যাইতেছেন যে, আপনারাই বলদৃপ্ত,

বীর্য্যবরীয়ান্, মহাশক্তিশালী, রণদুর্ম্মদ ভাবী ভারতীয় জাতির সৃষ্টিকর্ত্তার পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন? কেন আপনারা ভারতের ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া চলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন? কেন আপনারা আপনাদের ছাত্রদের জীবন-ধারা একশত বৎসর পরে কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতে, গবেষণা করিতে, পথ-নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন?"

ভগবৎ-প্রেমিকের জন্ম-মৃত্যু

যশোহর জেলান্তর্গত আঠারখাদা-নিবাসী এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জন্মমরণের দুঃখে কাতর হইয়া অনেকেই আর পুনর্জ্জন্ম চাহে না। তোমাদের পক্ষে জন্ম অথবা মৃত্যুকে ভয়ের কোনও কারণই নাই। তোমাদের জীবন ও মরণ, তোমাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব, তোমাদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মগোপনতা, সকলই জানিও এক পরম-লক্ষ্য ভগবৎ-সেবার পানে তাকাইয়া। দেহী বা বিদেহী সর্ব্বাবস্থাতেই তোমরা ভগবানের একান্ত সেবক। ভগবদ্-ভজনেই তোমাদের রতি, ভগবৎ-সেবাই তোমাদের স্বভাব, ভগবৎ-প্রীতি-সম্পাদনই তোমাদের স্বধর্ম্ম। এই নিত্যধর্ম্মে যার অনুরক্তি, জন্ম বা মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি, দুঃখ বা দৈন্য তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে না, মরিয়াও সে অমর, জন্মিয়াও সে অজ,

জরাগ্রস্ত হইয়াও সে অজর, ব্যাধিতে ভুগিয়াও সে নিত্যনিরাময়, দৈন্যে ডুবিয়াও সে অদৈন্য, দুঃখে বারংবার নিষ্পেষিত হইয়াও সে দুঃখহীন। এই কারণেই সে নিত্যাভয়।"

প্রেমকে এককেন্দ্রক কর

কুমিল্লা জেলান্তর্গত শিবপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেখানে যাই, মানুষের ভিতরে অপূর্ব্ব প্রেমভাব দর্শন করি। এই প্রেমভাব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহাকে এককেন্দ্রক করিতে পারিলে এক মহাশক্তির উদ্ভব হইবে, দিব্য জ্যোতির মত স্নিগ্ধ অথচ ভাস্কর তেজে ঐশ্বরিক মহিমা বিশ্ব ব্যাপিয়া এক মহাজাগরণের সম্পাদন করিবে। চতুর্দ্দিকে অপচীয়মান প্রেমকে নিষ্ঠার রজ্জুতে বাঁধিয়া যদি একটী স্থানে আনিয়া কেন্দ্রীভূত করিতে পার, জীবনের সকল অসার্থকতা একটী নিমেষে দূর হইয়া যাইবে। সেই চেষ্টাই কর। সেই চেষ্টা জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার কারণ হইবে। সকল ভালবাসার পরমকেন্দ্র শ্রীভগবান,—মাত্র এই কথাটুকু ভুলিয়া যাইয়া জীব অবিরাম নিত্য নূতন দুঃখের ফসল চয়ন করিতেছে, জীবন ভরিয়া কেবলই হতাশা, মনস্তাপ আর দুর্ভাগ্য কুড়াইতেছে। ভুলের ফসল না তুলিয়া আজ প্রেমের ফসল তোল।"

তোমাদের মধ্যে আমাকেই দেখিতেছি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বাঘাউড়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার স্নেহ সঙ্গহীন, স্বার্থহীন, অফুরন্ত ও অতলস্পর্শ। তোমরা যে যত পবিত্র হইবে, তাহার দৃষ্টি তত স্বচ্ছ হইবে এবং সে তত পরিষ্কার ভাবে এই প্রেমকে উপলব্ধি করিতে পারিবে। মানুষ আমার নিকটে উপলক্ষ, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রেম কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীবকুলকে স্পর্শ করিতে চাহিতেছে। তোমাকে যখন আলিঙ্গন করি, তখন তোমার দুইটী কচি করপুটই আমার বক্ষ স্পর্শ করে না, আমি সেখানে তখন কোটি কোটি জগতের লক্ষ কোটি জীবের প্রেমবিহ্বল করপুটের আবেশ-চঞ্চল আবেগ-বিভোর হস্তাঙ্গুলীগুলির মেদুর স্পর্শ অনুভব করি। একটী মাত্র মানুষের ভিতর দিয়াই আমি অনন্ত বিশ্বের সকলের স্পর্শ পাই। এই বিদ্যাই আমি অকৈশোর শিখিয়াছি। ভালবাসাই আমার ধর্ম্ম, প্রেমই আমার উপজীব্য, সকলকে আপনার আপন, জীবনের জীবন বলিয়া উপলব্ধি করাই আমার সাধনা, এই সাধনাকে সফল করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুখলালসা ও আরাম-প্রিয়তাকে জীবন হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া

সেওয়াই আমার তপস্যা। এই তপস্যায় আমি একনিষ্ঠ, এই সাধনায় আমি একলক্ষ্য, এই উপলব্ধিতেই আমি একাগ্র, এই ধ্যেয়েই আমি আত্মসমাহিত। এই জন্যই আমার উচ্ছ্বাস বন্যার ধারায় বহে না, দুধের মত ইহা তরল কিন্তু ক্ষীরের মত ইহা প্রগাঢ় ও তরঙ্গহীন সুস্থির। তোমাদের মধ্যে আমি আমাকেই দেখিতেছি, জগতে অপর কিছুই আমার দর্শনীয় নাই।"

সম্প্রদায় কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়

খুলনা জেলান্তর্গত কালাপাড়া-নিবাসী অপর এক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পৃথিবীতে অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইয়াছে কিন্তু সকল সময়েই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারা সজ্ঞান-পূর্ব্বক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। অনেকে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার কল্পনা মাত্রও করেন নাই, পরন্তু সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিসের বলে? আদি-গুরুর উপদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সুগভীর মমত্ব-বোধ হইতে। ধর্ম্মভ্রাতা যখন ধর্ম্ম-ভ্রাতার জন্য প্রাণে মমত্ব-বোধ করে, তখন একে অন্যের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহযোগ, বিপদ-কালে সাহায্য, উদ্বেগ-সন্তাপনায় আশ্রয় এবং সর্ব্বাবস্থায় অভয়, সান্ত্বনা ও সৎপরামর্শ প্রদান করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রেরণা অনুভব করে। এরূপ সাধকেরা বিভিন্ন

স্থানে বিভিন্ন ভাবে অবস্থান করিয়াও ক্রমশঃ এই কারণেই এক একটী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া যায়।

সম্প্রদায় কিসে বড় হয়

"কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই বলশালী হয় না। যে সম্প্রদায় নিজেদের মধ্য হইতে যত অধিক পরিমাণে ভেদবুদ্ধি নির্মূলনে সমর্থ হয়, সেই সম্প্রদায় তত অধিক শক্তিশালী হয়, সেই সম্প্রদায় বাহিরের দীন-দরিদ্রকে তত সহজে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া আত্মস্থ করতঃ সম্প্রদায়ের কলেবর-পরিপুষ্টি বিধান করিতে পারে। একের দুঃখে অপরের মনে যত সহজে সমবেদনা জাগরিত করা যাইবে, বুঝিতে হইবে, এই সম্প্রদায়ের ভিতরে তত অধিক ঐক্য, মৈত্রী, এবং আত্মীয়তা সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। মুখে মুখে বসুধাকে কুটুম্ব বলিয়া ঘোষণা করিলে, দার্শনিক তত্ত্বালোচনা-কালে সকলের সঙ্গে আত্মার যোগ জলের মত তরল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, কিন্তু যখন তোমারই সম্প্রদায়ের একটী লোক বিপন্ন হইল, নির্যাতিত হইল, রাজরোষে পতিত হইল, উৎপীড়কের কবলে পড়িল, নরহন্তার বন্দী হইল, অপরের ক্রীতদাস হইয়া নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে নানা অবাঞ্ছনীয় আচারে নিজেকে লিপ্ত করিতে বাধ্য হইল কিম্বা নিজের মর্য্যাদা হারাইল, সম্ভ্রম খোয়াইল, সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত হইল, গৃহত্যাগ করিয়া শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া চক্ষের জল আঁচলে মুছিতে মুছিতে

অনির্দ্দেশ অযুতত্ত যাত্রাপথে বাহির হইল, তখন বলিয়া বলিলে,—"ইহা তাহার কর্ম্মফল, যার যার কর্ম্মফল তাহাকে তাহাকে ভুগিতেই হইবে, ভোগের দ্বারাই ত' প্রারব্ধ-ক্ষয় করিতে হয়,"—এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যে, তোমার সহিত তোমার সম্প্রদায়-ভুক্ত অপরাপরের সহিত আত্মার নৈকট্য বা প্রকৃত আত্মীয়তা একটুও সৃষ্ট হয় নাই। সিন্ধুদেশে তোমার স্বধর্ম্মী একটী নারীর সতীত্বে হাত পড়িলে তুমি যখন আসামে বসিয়াও তাহার জ্বালায় অধীর হও, বুঝিব, প্রকৃত সমভ্রাতৃত্ব তোমার আসিয়াছে। যাহাদের এইরূপ সমভ্রাতৃত্ব আসে, তাহাদের সম্প্রদায়ই জগতে বড় হয়। আজ যাহা ক্ষুদ্র আছে, কাল তাহা বড় হইবে। সুতরাং কাহারই নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রত্ব দেখিয়া ভীত হওয়া উচিত নহে। যদি সমত্ববোধ, মমত্ববোধ, সমানুভূতি, সহানুভূতি তোমাদের মধ্যে থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের ঐক্যই জগতের বৃহত্তম ইতিহাস রচনা করিবে।"

গুরুদেবকে প্রদত্ত অর্থ

নোয়াখালী জেলান্তর্গত বাবুপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুকে তোমরা অর্থ দাও, উত্তম কথা। অর্থ ছাড়া জগতে প্রায় কোনও কাজই করিয়া উঠা যায় না। একমাত্র মানসিক উপচারে ভগবানের নিকট প্রার্থনা বা তাঁহার পবিত্র

নাম জপাদি আধ্যাত্মিক কার্য্য ব্যতীত জগতের সকল কাজই অর্থসাপেক্ষ। অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা যেমন গুরুদেবকে অবিরাম অর্থ দিয়া সেবা করিবে, তাঁহাকে আবার তেমন সেই অর্থ তোমাদেরই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কুশলের জন্য প্রয়োগ করিবার জন্য চেষ্টিত থাকিতে হইবে। তোমাদের প্রতি গুরুদেবের যেমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব আছে, তোমাদের দান যদি বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য হয়, তাহা হইলে তেমন আর্থিক দায়িত্বও যথেষ্ট রহিয়াছে।

"অবশ্য সৎকার্য্যের জন্য বা সৎলোকের নিকটে অর্থদান তোমরা অতি অল্পই কর। যাত্রা গানের আমোদ-প্রমোদের জন্য যদি দশ টাকা চাঁদা স্বেচ্ছায় দিতে পার, তবু ধর্ম্মের প্রচার বা প্রসারের জন্য চারি আনা চাঁদা তোমাদের গলা টিপিয়া না ধরিলে আদায় করা শক্ত। এই প্রকৃতির বশবর্ত্তী তোমরা যখন তোমাদের ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে কখনও কিছু দাও, তখন প্রায়শই তাহা এই দেশ-পর্য্যটনরত ব্যক্তিদের পাথেয়-ব্যয়েই নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমার মত যাঁহারা কোনও কারণেই নিজের অভাব কাহাকেও জানাইবেন না, এবং কোনও কৌশল করিয়াই দান সংগ্রহের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিবেন না, তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে ট্রেণ থাকিতেও পায়ে হাঁটিয়া চলিতে হয়, অনেক সময়ে ট্রেণে উঠিয়াও উপবাস-দগ্ধ উদর লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে হয়। একথা যাহারা তোমার গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিবে,

একদা যাহারা তোমার গৃহের কুলকন্যা ও কুলবধূদিগকে গায়ের জোরে টানিয়া আনিয়া প্রকাশ্যে ধর্ষণ করিয়া মরণাধিক যন্ত্রণা দিবে, একদা যাহারা শাণিত ছুরিকায় তোমার গ্রীবাদেশ বা কণ্ঠনালী ছিন্ন করিবে, এবং সেই একদা হয়ত একটা অতীব দূরবর্ত্তী একদা নহে, অতি নিকটবর্ত্তী, অতীব আসন্ন একদা, তাহারা যখন ধমক দিয়া টাকা আদায় করিতে আসে, তখন তোমরা সুবোধ শিশুটির মত থলির পর থলি বোঝাই টাকা ও নোট সিন্দুক হইতে খুলিয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পার এবং তোমাদেরই টাকায় তোমাদেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিবার সুযোগ তাহাদের হাতে দিতে পার, ইহাতে তোমাদের কুণ্ঠা বা লজ্জার পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু যাঁহারা সত্য সত্য তোমাদের ধর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য গুরুদেব রূপেই হউক, প্রচারক রূপেই হউক, সেবা-সংগঠন-কর্ম্মী রূপেই হউক, বন্যাত্রাতা ও দুর্ভিক্ষ-বান্ধব সেবাব্রতী কর্ম্মী রূপেই হউক, তোমাদেরই কুশল অবিরাম চাহিতেছেন, তাঁহাদের কাজে নিজে যাচিয়া কোনও আর্থিক সহযোগ করিতে তোমাদের দেখা যায় না। আর যে অর্থ তোমরা দাও, তাহাও এমনই অকিঞ্চিৎকর ও পরিমিত যে, প্রকৃত কাজ তাহা দিয়া বিশেষ কিছু হইতেও পারে না।

"তথাপি তাহার হিসাব দাবী করিবার বহর তোমাদের অতীব বিস্ময়কর ভাবে বেশী। যেখানে কোটি মুদ্রার প্রয়োজন,

সেখানে দুই গণ্ডা পয়সা দান করিবার পরে হিসাব চাহিবার প্রবৃত্তি কি মার্জ্জনীয়, না মহৎ? ইহা অতীব জঘন্য আত্মিক অপরিচ্ছন্নতার লক্ষণ। অন্তরে পবিত্রতার সম্ভাবনা না হইলে কেহ দাতা হইতে পারে না। দাতৃত্বের প্রথম সর্ত্ত চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত যাহার শুদ্ধ নহে, সে দান করিবে দায়ে পড়িয়া বা যশের লোভে বা অকাজে। চিত্ত যাহার শুদ্ধ নহে, সে দান করিয়া নিজ দাতৃত্বের অহমিকায় স্ফীত হইয়া দান-গ্রহীতার নিকটে শত বার সহস্রবার ব্যয়ের কৈফিয়ৎ দাবী করিবে এবং দানগ্রহীতাকে নিজের অনুগৃহীত দীন বলিয়া মনে করিবে। তোমরা শুদ্ধচিত্ত হও।

"শিখ গুরুরা শিষ্যদের নিকট হইতে বার্ষিক গ্রহণ বাধ্যকর করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা না হইলে গুরু-গোবিন্দের বিপুল বাহিনী ধর্ম্ম এবং ইজ্জৎ রক্ষার জন্য আত্মপ্রকাশ করিতে অকল্পনীয় বাধা পাইত। এগুলি একেবারেই ভুলিয়া যাইবার যোগ্য কথা নহে। তোমরা যদি রাজার রাজ্যে বাস করিতেছ বলিয়া তাঁহাকে বার্ষিক কর দেওয়া অসঙ্গত জ্ঞান না কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম-গুরুকে কেন তাঁহার প্রণামী দেওয়াকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিবে না? প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা কি দেশের মালিক? রাজা কি দেশের জমি চষেন, না ফসল কাটেন? রাজা কি তোমাদেরই সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সহযোগ ও যোগাযোগ সৃষ্টি করিয়া তোমাদের পার্থিব জীবন-যাত্রাকে সুকর করিবার জন্যই এই অর্থের সদ্ব্যবহারে বাধ্য নহেন?

গুরুদেবকেও যদি তোমরা সে ভাবে অর্থ দাও, তাহা হইলে তিনিও এই অর্থ তোমাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং সময় বিশেষে পার্থিব সর্ব্বপ্রকার কুশলের জন্য ব্যয় করিতে বাধ্য। কিন্তু মহাত্মা ভোলাগিরির শিষ্যদের ন্যায় আয়ের দশমাংশ প্রতি মাসে গুরুর আশ্রমে জমা দিবার নিয়ম প্রত্যেকে পালিয়া চলিবে, তবে ত'।

"যে গুরুদেব শিষ্যদের সর্ব্বপ্রকার কুশলের ব্রত গ্রহণ করিবেন, যিনি একমাত্র আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শনের কার্য্যটুকু সারিয়া তৎপরে শুধু আশীর্ব্বাদ দ্বারাই শিষ্য-শিষ্যাদের কুশল করিয়া তৃপ্ত নহেন, যিনি চাহিবেন, প্রত্যেকের ভিতরে মানুষের প্রয়োজনীয় যুগোপযোগী সর্ব্ববিধ গুণের অবিলম্বে সঞ্চার হউক, সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া দেহে, মনে, বাক্যে, কর্ম্মে, জীবন-যাপন-প্রণালীতে ও জীবিকায় ইহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাবলম্বী এবং অপরিগ্রহ হউক, যিনি চাহিবেন, ইহাদের ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া একটা বিরাট জাতির, বিরাট সমাজের শত বর্ষের আমূল কুসংস্কার-সমূহের ক্ষয় পাইয়া নবমহাজাতির আত্ম-প্রকাশ ঘটুক, যিনি চাহিবেন,জাতিচ্যুত, সমাজ-বহিষ্কৃত, উৎপীড়নের ফলে ভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয়ে গত সর্ব্বপ্রকার ও সর্ব্বশ্রেণীর মানব-মানবী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার মাতৃধর্ম্মের অঙ্কে শোভা পাউক, মাতৃ-সমাজের অঙ্গ পরিপুষ্ট করুক, যিনি চাহিবেন, একটি প্রাণীকেও তাহার কোনও প্রকার ভুল, ভ্রান্তি, ত্রুটী,

বিচ্যুতির জন্য সমাজ-অঙ্গ হইতে দূরে সরাইয়া না দিয়া তাহাকে আত্মসংশোধনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করত সমাজেরই শক্তি-বৃদ্ধিকর সহায় রূপে রক্ষা করিয়া যাইতে, যিনি চাহিবেন, পুরুষানুক্রমিক ভাবে কল্যাণ-সাধনাকে শিষ্য-প্রশিষ্যগণের বংশাবলির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমিক অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে ক্ষুদ্রশক্তি ব্যক্তির বংশধরকে মহাশক্তি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির বংশধরকে কুশাগ্র-বুদ্ধি, অল্পায়ু ব্যক্তির বংশধরকে অমিতায়ু, স্বল্পকর্ম্মা ব্যক্তির বংশধরকে ভীমকর্ম্মা করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে, যিনি চাহিবেন, শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে বংশানুক্রমিক ও ধারাবাহিক, সচ্চিন্তার অনুশীলন ও অসচ্চিন্তার প্রত্যাহার দ্বারা বাঞ্ছনীয় যাবতীয় সদ্গুণের চরমতম বিকাশ এবং অবাঞ্ছনীয় পাপ-সমূহের পরমতম বিলোপ সাধন করিতে, তাঁহার কর্ম্ম পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনের কথা তিনি তোমাদের নিকটে প্রকাশ না করিতে পারেন, কিন্তু তোমাদের প্রতি গুরুদেবের দায়িত্বের বিষয় যখন বিচার করিতে বস, তখন তাঁহার প্রতি তোমাদের এই দায়িত্বটির কথা বিস্মৃত হইবে কোন্ বিবেচনায়? শিষ্য হইয়াই তোমরা গুরুদেবের মাথা কিনিয়া নেও নাই, তোমরা যে কাহারও শিষ্য হইয়াছ, তাহা তাঁহার প্রতি প্রদর্শিত একটী অনুগ্রহ নহে। এই কথাগুলি তোমাদের বোঝা প্রয়োজন।"

সত্যিকারের কাজ

সাড়ে তিনটা বাজিতেই শ্রীশ্রীবাবামণি জামা গায়ে দিলেন। খড়মের বোলায় যেখানে একটা লোহা উঠিয়া আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল, এবং গতদিন যেখানটায় পিটাইয়া সমান করা হইয়াছিল, সেখানকার লোহাটা দেখা গেল, আবার আলগা হইয়া রহিয়াছে। পুনরায় সেটাকে পিটাইয়া লইয়া খড়ম পায়ে দিলেন।

সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী বলিলেন,—আমি বল্‌ছিলুম কি, আর এক জোড়া খড়ম কিনে আনলে হয় না বাবামণি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—দেখি না আর দুটা দিন।

—ততদিনে পা কেটে রক্তারক্তি হোক্!

—অস্থির হচ্ছিস কেন বাবা, নূতন খড়ম আসছে। বৃথা কেন অধীর হ'য়ে ছয় সাত আনা পয়সা খরচ করি।

—পয়সার জন্য আপনার এত মমতা?

—মমতা পয়সার জন্য নয়, মমতা তাদের জন্য, এই পয়সাগুলি খরচ ক'রে যাদের সেবা করা সম্ভব হবে। চতুর্দ্দিকে হাজার হাজার অভাবী। যাকে কিছু সাহায্য করা, সেই হবে উপকৃত। নিজের জন্য কিছু করার মধ্যে কোনো সার্থকতাই নেই। পরের জন্য যেটুকু কর্লাম, সেটুকুই হ'ল সত্যিকারের কাজ।

বিকাল ঠিক চারিটায় শ্রীশ্রীবাবামণি শিলচর নর্ম্মাল-স্কুলে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। অদ্যও সভাস্থলে জনারণ্য ঘটিল, সভাস্থলে তিল-ধারণের স্থানও ছিল না।

সভারম্ভ-কালে কে একজন কাহাকে যেন বলিতেছিলেন,—"দাঁড়িয়ে যাও, আরম্ভ ক'রে দাও।" কিন্তু অপর কেহ দাঁড়াইবার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবামণির কণ্ঠ-নিঃসৃত বক্তৃতা-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। যদিই বা কাহারও বিতণ্ডা করিবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইবার অভিপ্রায় ছিল, ত' তিনি এই স্রোতোধারায় সম্ভবতঃ ভাসিয়াই গেলেন। নিস্তব্ধ সভাস্থলে মাত্র একটী কণ্ঠই শোনা যাইতে লাগিল। সেই কণ্ঠ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের কমনীয় কম্বুকণ্ঠ।

গার্হস্থ্যের বিয়োগ সাধনা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাল বলেছি যোগের কথা, আজ বল্‌ব বিয়োগের কথা। প্রাচীন ভারতকে প্রাচীন ব'লেই মূঢ়, স্থবির, জড় ও অপদার্থ ব'লে গাল দেওয়ার মধ্যে কোনও সার্থকতা নেই, প্রাচীনের কৃতিত্ব এবং তার পটভূমিকা আমাদের স্মরণে নেই ব'লেই তাকে অকিঞ্চিৎকর মনে করার কোনো যুক্তি নেই। একনিষ্ঠ সংযম-সাধনার দ্বাদশবর্ষব্যাপী সুনিপুণ অনুশীলনের ফলে যে দেহ, যে মন, যে বীর্য্য, যে সহিষ্ণুতা শিক্ষার্থীর ভিতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে বংশানুক্রমিক অনুপ্রবেশিকা দ্বারা বৃহত্তর ব্যাপকতা ও

বিশালতর সার্থকতা প্রদানের প্রয়োজনে, ঠিক সেই মহাবস্তুকে এতদিন সযত্নে সংরক্ষণ ক'রে আসা হয়েছে, তাকেই নিজ শরীর থেকে বিযুক্ত ক'রে নব-নরশরীরের আবির্ভাবকে একটা নিতান্তই দৈবাধীন ব্যাপারে পর্য্যবসিত হ'তে না দিয়ে, সাধন-মহাসমুদ্রের মন্থনোত্থ অমৃতে পরিণমিত করবারই হ'ল এই সাধনা। একে বিয়োগ অঙ্ক বলতে পারি। মানুষ ধন ছাড়ে বৃহত্তর সম্পদ আহরণের জন্য, বিয়োগের বা ছেড়ে দেওয়ার যাবতীয় মহিমা এরই মধ্যে বিরাজিত। চিরকাল মানুষ কি আভ্যন্তর উন্নতির একই স্তরে ছিল? স্তর থেকে স্তরান্তরে আস্তে আস্তে সে আরোহণ করেছে এবং তা' করেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, যোগ্যতমের উদ্বর্তনের ধারা ধ'রে, নিত্য নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টার ভিতর দিয়ে। সেখানে সঙ্কল্পের বিশেষ স্থান নেই, সেখানে প্রকৃতির তাগিদ কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে ছড়ি ঘুরিয়ে মানুষকে পরিচালিত করেছে এবং এই ভাবেই আস্তে আস্তে চতুষ্পদ জীব সরল মেরুদণ্ডী দ্বিপদ মনুষ্যে রূপান্তর পেয়েছে, সভ্যতা-সংস্কৃতিহীন আদিম মানুষ আস্তে আস্তে সামাজিক সংস্কার ও যৌথ সদাচারবিধির পত্তন ক'রে ক্রমশ সভ্যপ্রায় মানুষের মূর্ত্তি ধারণ করেছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন মানুষ তার নিজের মনের সন্ধান পেল, নিত্য-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির খোঁজ পেল। জন্ম-মৃত্যুর সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে অতীন্দ্রিয় নিজ অস্তিত্বের দিব্য পরিচয় পেয়ে গেল এবং

নিজেকে, নিজ সম্ভাবনাকে, নিজ কৃতিত্বকে, নিজ দায়িত্বকে, নিজ পৌরুষকে এবং নিজ সামর্থ্যকে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে বিসর্পিত করার কৌশল আবিষ্কার করল বা তার স্বপ্ন দেখল। সুরু হ'ল নির্দিষ্ট গার্হস্থ্য জীবনের এবং সুরু হ'ল পরিণাম-সাফল্যের বিয়োগ অঙ্কের অনুশীলন। একটী মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটী কীটাণু নূতন দেহ-মন-প্রাণের আবির্ভাবকে সম্ভব ক'রে তুলবে অভিনব নৈতিক মূল্যায়নের নিরিখে এবং অভূতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যের পরিপ্রেক্ষিতে,—এই একটী অত্যদ্ভুত ধারণা এল ভারতীয় ঋষি-জগতের ধ্যানলোকে। মানব-সভ্যতার সে এক অভাবনীয় নব-প্রকাশ, যা' কোনো দেশের ইতিহাসে এর আগে দেখা যায় নি। পুত্রোৎপাদন সব দেশের মানুষই অবিরাম ক'রে গেছে কিন্তু একে একটা চারুশিল্পে, একটা উন্নত সাধনায়, একটা ভাবোৎকর্ষ-বিধায়ক অনুশীলনে পরিণত করতে কাউকে দেখা যায় নি, একমাত্র ভারতের আর্য্য ঋষি ব্যতীত। গার্হস্থ্যের বিয়োগ অঙ্ক অনুশীলনের অকল্পনীয় সার্থকতা এখানে। আমাদের আজকের বক্তব্য বিষয় শুধু ইহা।

পূর্ণ আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা চলিল। বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি এক মিনিট কাল নিঃশব্দে সভামঞ্চে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং পরে ধীরে ধীরে সভামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়টুকুর মধ্যেও শ্রোতৃজনমণ্ডলীর মধ্যে একটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। এই

সময় পর্য্যন্ত তিনি চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন না। সুতরাং বক্তৃদের খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়াই তাঁহাকে সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল।

আপনি কি যাদু জানেন

সভাক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি রাস্তায় নামিলে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীজী, আপনি কি যাদু জানেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসু-নেত্রে তাঁহার পানে তাকাইলেন। তিনি বলিলেন,—আজ সভাস্থলে বিশেষ গোলযোগ হবার সম্ভাবনা ছিল। আপনি শ্রীহট্টের বক্তৃতাবলীতে জ্বালামালা বিস্তার ক'রে এসেছেন। আপনি নির্ভয়ে বলেছেন, কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকারী এবং সমাজ-সেবক-নামধারীদের কারো কোনো অধিকার নেই এমন কিছু করার বা বলার, যার দ্বারা নবযুবকদের স্বাদেশিকতার শৌর্য্যময় সত্তা কোনও দিক্ দিয়ে এককণাও দুর্ব্বল বা পথচ্যুত হতে পারে। সাহিত্য-রসের রসিকেরা এই উক্তিগুলিকে সহ্য করতে পারেন নি। শিল্পের জন্য শিল্প, কাব্যের জন্য কাব্য, অর্থের জন্য নৃত্য, এসব চলতে না দিলে তাঁদের রসবোধ ব্যাহত হয়। তাই, তাঁরা সাহস ক'রে প্রচারকর্ম্মে না নেমে আপনার প্রচারকে বাধা দেবার ষড়যন্ত্র করেছেন। আমরা এর জন্য বড়ই উদ্বেগ বোধ করছিলাম। তাই, আজ আমরা দলবদ্ধ

হ'য়ে অনেকে এসেছিলাম, সভাস্থলে জোর ক'রে হলেও শান্তি রক্ষা করতে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আপনার বক্তৃতারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে যে সুকৌশলে বক্তার পাল্টা বক্তৃতা আরম্ভ ক'রে দিয়ে একটা দক্ষযজ্ঞ সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছিল, তার আর সাহস ক'রে ওঠারই কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সত্যই কি স্বামীজী আপনি যাদু জানেন?

উচ্চহাস্যে প্রশস্ত রাজপথ কাঁপাইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাদু আপনারা জানেন, যাঁরা অপরিচিত অখ্যাত এক বক্তাকে যে-কোনও আপৎসম্ভাবনা থেকে রক্ষার জন্য তার অজ্ঞাতে দলবল সহ সভাস্থলে এসে অনেক আগেই উপস্থিত হতে পেরেছেন। অকপট জনসেবা বুদ্ধি ছাড়া আর কোনো যাদু আমার জানা নেই।

আমার ঈশ্বর-সেবা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভাবে

নৈশ ভোজনান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি পুঞ্জীকৃত অপঠিত চিঠিপত্রের দুই একখানা পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন,—আপনার অপূর্ব্ব বৈদগ্ধ্যপূর্ণ মধুর বক্তৃতাবলী শোন্‌বার জন্য সহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আগ্রহাকুল। কিন্তু একদল লোক ঘরে ঘরে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে নানা কদূক্তি শুনিয়ে শুনিয়ে আসছে। আমরা বড়ই দুর্ভাগা যে সমস্ত সহরের

লোককে নিয়ে আয়োজন ক'রে বিরাট একটা ময়দানে ব'সে আপনার বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা কত্তে পারলাম না। সময়টা বড় প্রতিকূল। নামী ও সম্মানী লোকেরাও আজকাল পরের মিটিং পণ্ড করার, পরের অফিস দখল ক'রে বসার ফিকিরে থাকেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সময় হ'লেই শিলচরে মাঠে আর ময়দানে নাম্‌ব। তার জন্যে আফশোষ ক'রে লাভ নেই। আর, সহর থেকে জনপদবাসীরা কেউ ত' আমাকে আমন্ত্রণ ক'রে আনেন নি। আমি নিজের গরজে, নিজের চেষ্টায়, নিজের দায়িত্বে এসেছি। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একটী প্রাণীও আমার পরিচিত নেই। যাঁর বাড়ীতে উঠেছি, তিনি ভিন্ন এক জেলার লোক এবং এখানের অতীব অস্থায়ী এক সাময়িক বাসিন্দা। সুতরাং আফশোষ ক'রে লাভ নেই। কাজ করার চেষ্টা আমি কত্তে পারি, কিন্তু ফলাফল ত' পরমেশ্বরের হাতে। সুতরাং দুশ্চিন্তা ক'রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানো কাজের কথা নয়।

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে বিরাজমান। যেখানে বাধা আসে, সেখানে তাঁকে বাধারূপেই পূজা দিতে হয়, অনুকূলা-প্রার্থনা সেখানে সঙ্গত নয়। বিঘ্ন-বিপদ ভগবানেরই এক একটী পরিচ্ছিন্ন রূপ। আমার ঈশ্বর-সেবা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভাবে। আমি বাধাকে ভয় পাই না।

শিলচর

২৬শে মাঘ, শনিবার, ১৩৪১

(৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

সংযমেই গৃহি-জীবনের সুন্দরতা

অদ্যও অপরাহ্নে ঠিক চারি ঘটিকায় শিলচর নর্ম্মালস্কুল-হলে ভাষণ সুরু হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গার্হস্থ্য জীবন যখন একটা সুনিপুণ শিল্পে পরিণত হয়, তখন তাতে দাম্পত্য ব্যবহারে সংযম একান্তই আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তোমার হাতে রং আছে, তুলি আছে, অঙ্কনের পট আছে এই জনাই তুমি যথেচ্ছ রং ব্যবহার কত্তে পার না, যথেচ্ছ তুলি চালাতে পার না বা পটের যেখানে সেখানে তোমার নিদা ফলাতে পার না,—যদি তোমাকে শিল্প-সম্ভার কিছু সৃষ্টি কত্তে হয়। এই যে যথেচ্ছ নিজ শক্তির ব্যবহার কত্তে না পারা বা না চাওয়া তারই নাম সংযম। গৃহি-জীবনকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে সংযমকে এ'র এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ বা অপরিহার্য্য সর্ত্ত ব'লে মান্‌তে হবেই হবে। শৃঙ্খলার বাহিরে যে সুখ, তাতে শান্তি আছে, কি নাই, তা' ভুক্তভোগীরা নিশ্চয়ই জান্‌বেন কিন্তু শৃঙ্খলার বাহিরে যে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি সম্ভব নয়, একথা বাহিরের লোকেও, এমন কি দূর থেকেও, বুঝতে পারে। সংযমেই গৃহি-জীবনের সুন্দরতা,

সুষ্ঠীতা, শোভনতা। সংযমেই শান্তি, তৃপ্তি ও প্রগাঢ় একাত্মতা-বোধ সুসম্ভব।

সন্ন্যাসীর আদরের ও সম্মানের কারণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সংযমের উপযোগিতার দিকটাও আমরা উপেক্ষা করে পারি না। বর্ত্তমান সময়ের অনেক খ্যাতিমান্ লেখকেরা ভারতের চুয়ান্ন লক্ষ পুরুষের সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণের কত না নিন্দা ক'রে যাচ্ছেন। তাঁরা বল্‌ছেন, এই সকল সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ নিজেদের কর্ম্ম, চিন্তা ও অনুশীলনকে দার-পরিগ্রহণের অনিচ্ছার দ্বারা পক্ষাঘাত-গ্রস্থ ও পঙ্গু ক'রে রেখেছেন, এঁদের আচরণের জন্য এঁদের কৈফিয়ৎ দাবী করবার অধিকার দেশবাসীর আছে। এঁরা যদি বল্‌তেন যে, এই সব সাধু-সন্ন্যাসীরা সমাজের উপরে পরগাছের মতন বিরাজ করেন ব'লে জবাবদিহি দাবী করতে হবে, তবে বরং এর একটা উত্তর দেবার চেষ্টা কেউ কেউ হয়ত করেন। কিন্তু দাবীটার কারণ প্রধানত অন্যরূপ। এঁরা দারপরিগ্রহ করেন না ব'লে জীবন এঁদের অসম্পূর্ণ। কিন্তু একথা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, এই চুয়ান্ন লক্ষ সাধু-সজ্জন বিবাহিত হ'লে প্রতি বৎসরে অন্ততঃ পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ নূতন মানুষের পিতা ব'লে পরিগণিত হ'তে পারেন, যার ফলে প্রতি বৎসর নূতন পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ শিশুর খানা-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সংস্থানের জন্য জাতিকে বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত হতে হ'ত। অচিরকাল মধ্যে জগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এমন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে, যার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দার্শনিক ম্যালথাসের চিন্তানুবর্ত্তীরা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করে লেগে গেছেন জন্ম-নিরোধের জন্য। সেই আন্দোলনের ঢেউ ভারতের সাগর-তীরেও এসে লেগেছে এবং ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলনকে নানা জনে নানা ভাবে দেশের সর্ব্বত্র এবং সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রসারিত করার চেষ্টা কর্চ্ছে। সেদিন জনারণ্যের বিপুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষের তত্ত্বচিন্তা, আত্মচিন্তা, হিতচিন্তা ও বিশ্বচিন্তা সব-কিছু একমাত্র ভোগচিন্তা ও ভোগের অবশ্যম্ভাবী কুফল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার নিতান্ত স্বার্থপরসুলভ পশুবৃত্তিস্রোতে ডুবে যাবে। অবারিত ভোগ করা হবে কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তে দেওয়া হবে না। এই লজ্জাকর আন্দোলন নির্লজ্জ উৎসাহে সর্ব্বত্র মাতামাতি সুরু করবে। এমন এক ভাবী চিত্র চোখের সামনে রেখে যদি কেউ বিচার করে বসে, তবে ভারতের চুয়ান্ন লক্ষ সংসার-সুখ-ত্যাগী সাধুর প্রতিচ্ছবি মহাদানের মাধুর্য্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বে। তখন দেখা যাবে যে, সংসার-সুখে নিঃস্পৃহ মানুষগুলি অন্য দিক্ দিয়ে যদি নিন্দনীয়ও হন, তবু প্রকৃত সুখী এবং তাঁদের দিকে তাকালে দর্শনকারীরাও করে সুখানুভব। এই যে বিভূতি, এইটুকু হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংযমের নৈষ্ঠিক সাধনার অমৃতময় ফল। এজন্যই সন্ন্যাসীর এত আদর, এত সম্মান।

ত্যাগ অঙ্ক বা সন্ন্যাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গৃহীর জীবনে সংযম প্রতিষ্ঠিত হ'লে সংসারে সুখ কমবে না, বরং বাড়বে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিনা চেষ্টায় দেশের জনসংখ্যা সীমিত থাকার হবে আনুকূল্য। সংশিতব্রত সন্ন্যাসীর ত্যাগ-সুন্দর শুভ্র জীবনের দিকে তাকিয়ে অনেক গৃহস্থ নিজেদের জীবনের মধ্যে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করার আবশ্যকতা অনুভব করেন এবং সংযমকে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার চেষ্টাও করেন। এইটিই সন্ন্যাস-জীবনের এক সুমহৎ সাফল্য। সংযমী গৃহী সুখী হন, স্বাস্থ্যবান্ হন এবং সুদূরবর্ত্তী এক ভবিষ্যতের দিকে তাঁর সাধনাকে বিসর্পিত ক'রে দিতে সমর্থ হন। এই জন্যই বানপ্রস্থ আশ্রমকেই বলা হয় পুরুষ অঙ্ক কষার আশ্রম। সত্য সত্য অরণ্যে গিয়েই বাস করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কারণ, ইচ্ছা করলে চিরকালের ঘরবাড়ীকেই মানুষ মানসিকতার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে অনায়াসে তপোবন ক'রে নিতে পারে। এই কৃতিত্বটুকুই বানপ্রস্থীর জীবনের বিশেষত্ব এবং এই সংযত জীবন যাপনের স্বাভাবিক পরিণতিই হচ্ছে নিজেকে তিলে তিলে পলে পলে জগতের নিঃশ্রেয়স হিত-সাধনায় বিলিয়ে দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন, যার নাম ত্যাগ অঙ্ক বা সন্ন্যাস।

বক্তৃতা সোয়া তিন ঘণ্টা কাল চলিল। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার আভাস মাত্রও পাওয়া গেল না। বক্তৃতান্তে বহু শ্রোতা

ও শ্রোত্রীকে বক্তার সমীপস্থ হইয়া নিজ নিজ অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইতে দেখা গেল। জুতা যিনি পায়ে দেন না, তাঁহার আর গত্যন্তর কি? তিনি খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়াই সভাস্থল ত্যাগ করিলেন।

আলস্যের পারিশ্রমিক নাই

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবামণি পুঞ্জিত পত্রসমূহের উত্তর দিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দে মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—বক্তৃতার এত বড় পরিশ্রমের পরে আবার পত্র লেখা?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আলস্যের কোনও পারিশ্রমিক নাই।

তোমার অধঃপাতেই জাতির অধঃপাত

ঢাকা-হলদিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমার অধঃপাতেই জাতির অধঃপাত। তুমি ডুবিলেই তোমার দেশও ডুবিবে, তুমি উঠিলে তোমার দেশও উঠিবে। তোমার ব্যক্তিগত উত্থান-পতনের সহিত তোমার দেশের, তোমার জাতির, তোমার সমাজের, তোমার সম্প্রদায়ের, তোমার গোষ্ঠীর এবং তোমার পরিবারের উত্থান-পতন অতীব

ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। এই কারণেই সমষ্টির কুশলকামী তুমি ব্যষ্টিগত-ভাবে তোমার নিজের উপরে অতীব তীব্র ব্যক্তিগত অভিনিবেশ প্রদান করিতে বাধ্য, জানিও। নিজেকে মহৎ, উন্নত ও উৎকর্ষবান না করিয়া দেশ, জাতি বা সমাজকে মহৎ, উন্নত ও উৎকর্ষ-সম্পন্ন করিবার যে প্রয়াস, তাহাকে বামনের চাঁদ ধরা বলিয়া গণনা করিলে দোষ হয় না। একমাত্র তোমাকে লইয়া একটা বিরাট জগৎ রহিয়াছে। নিজের ব্যক্তিগত সুখতৃষ্ণা বা ত্যাগ-বুদ্ধি, ব্যক্তিগত ভোগলুব্ধতা বা পরার্থপরতা, ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতা বা আদর্শানুগত্য, ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা বা দুর্দ্দম্য কেশরি-বিক্রম, ব্যক্তিগত কাপুরুষতা বা অকুতোভয় দুঃসাহস,—ইহারাই একটা বিরাট জগতের গঠন করিয়াছে। তোমার নিজের মনোবিকার বা আত্মহত্যা একটা ত্রিভুবনব্যাপী সমস্যা বা সমাধান। তোমার নিজের ভিতরে কোটি জগতের সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, শুভ এবং অশুভ ভ্রূণের আকারে অদৃশ্য ভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে। নিজেকে খরতর সাধনা এবং সুতীব্র অনুশীলনের মধ্যে ফেলিয়া অভ্যন্তরস্থ সেই বিশাল বিপুল বিরাট জগতের প্রকৃত দৃশ্য নিজ-নয়ন-সমক্ষে অবিলম্বে উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা কর। জগতে এক এক সময়ে এক এক জন ক্ষণজন্মা মানুষ আবির্ভূত হইয়া যে জগতের ভাগ্যকে নিজ ভাগ্যের তরঙ্গ-তাড়নে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়া যান, নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি, পৌরুষ ও প্রতিষ্ঠার প্রচণ্ড শক্তিতে শত, সহস্র, লক্ষ বা কোটি জনের মনোভঙ্গী,

মনোভাব, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, কর্ম্মরীতি ও লক্ষ্যকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া বহু বৈচিত্র্যের ভিতরেও একটা সুস্পষ্ট সমন্বয়ের রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বিবদমান, বিচ্ছিন্ন, ভেদক্লিষ্ট দেশ, জাতি বা সমাজের মধ্যে ঐক্য, সখ্য-প্রীতি, যূথবদ্ধতা ও লক্ষ্যের একতানতা সম্পাদন করিয়া দিয়া যান, তাহার মূল এই ব্যক্তিগত শক্তিসমূহের প্রকৃষ্টতম অনুশীলনের ভিতরেই রহিয়াছে। সুতরাং তুমি হতাশ হইতে পার না। একা বলিয়া নিজেকে তুমি দুর্ব্বল ভাবিতে পার না। নিখিল জগতের সহিত পরিপূর্ণ যোগ স্থাপনের জন্য অদৃশ্য বিদ্যুতের কেন্দ্র-সমূহ তোমারই ভিতরে বিরাজমান রহিয়াছে। অনুশীলনের দ্বারা 'ফোকাস্'টুকু মাত্র করিয়া লইতে হইবে। জগতে যেখানে যাহা শুভময়, সুখময়, প্রেমময়, আত্মোৎকর্ষ সাধনের দ্বারা তুমি তাহার সব কিছুর সহিত চিরস্থায়ী এবং অচ্ছেদ্য সংযোগ সাধন করিতে পার। আবার, জগতে যাহা কিছু অসত্য, অসুন্দর, অমঙ্গলময় ও অনর্থ, নিজের অধঃপাতকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিবার ফলে তোমার অজ্ঞাতসারে তাহারই সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া নিজের এবং জগতের বৃহত্তম অনর্থ সাধন করিতে পার। সুতরাং সাবধান হও। হতাশও হইও না, উদাসীনও হইও না। দায়িত্ব ভুলিয়া যাওয়া আর নিজেকে অস্বীকার করা এক কথা এবং আত্মাবজ্ঞাই আত্ম-বিনাশের প্রথম সোপান।

আত্ম-সংশোধন ও পর-সংশোধন

"দেশ, জাতি ও সমাজের তথা নিখিল জগতের সকল অনর্থমূল নীচতাকে সংশোধন করিয়া সকলকে মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া এক মঞ্চে আনিয়া সমন্বয়-গত করিতে হইবে। দেবতাসকলকে পশুর শ্রেণীতে অবনত করিয়া জগতের মধ্যে সাম্য-প্রতিষ্ঠা করার বুদ্ধি কুবুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধি। প্রথমে চাই মানব-মনের ক্লেদরাশি ও পাপবুদ্ধির দৌরাত্ম্য বিদূরিত করা, তারপরে চাই মাহাত্ম্যের মহিমোন্নত মঞ্চে সচ্চিন্তাপুঞ্জের সর্ব্বতোভদ্র সমন্বয়। এজন্য একটী একটী করিয়া ব্যষ্টির, একটী একটী করিয়া ব্যক্তির অন্তরের পাপ অতি দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে অপরের দুর্ব্বলতাকে কাঁচি-ছাঁটা করিতে যাইবে, তাহার পূর্ব্বে তোমাকে তোমার নিজ দুর্ব্বলতা-নিসূদনের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। আত্ম-সংশোধনই পর-সংশোধনের প্রকৃষ্ট উপায়। প্রকৃষ্ট এই কারণে যে, তুমি যদি নিজেকে ভ্রমবর্জ্জিত, অপাপবিদ্ধ ও অসত্যমুক্ত করিতে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমার উপদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া দৃষ্টান্তের প্রভাবেই অনেক ভ্রান্ত পাপী বা মিথ্যাচারী সৎপথে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুল হইবে। অপর কারণ এই যে, তুমি নিজে যদি হও সংশোধিত-চরিত্র, তাহা হইলে তোমার বাক্য অপরের পক্ষে অধিকাংশ স্থলেই অলঙ্ঘনীয় হইবে। তৃতীয়তঃ ইহার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ফলে অপরের সংশোধন-কার্য্যে তোমার বল, সাহস ও বিশ্বাস শত গুণ বাড়িয়া যাইবে।"

হতাশা ও স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার

ঢাকা শিমুলিয়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি তোমার চিরস্থায়ী স্বাস্থ্যহীনতা নিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন ও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছ। স্বাস্থ্যকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যাহা যাহা করা প্রয়োজন, তাহা করিতে অবিলম্বে যত্নশীল হও এবং মনের দুর্ব্বলতা ও হতাশা দূর কর। হতাশ ব্যক্তির স্বাস্থ্য-পুনরুদ্ধার অতি অল্পই ঘটিতে দেখা যায়। ঔষধ-প্রয়োগ, বায়ু পরিবর্ত্তন, ব্যায়াম ও যৌগিক আসন-মুদ্রার অভ্যাস প্রভৃতির সঙ্গে অন্তরে আশাশীলতা এবং বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন। দেহপাতকে মৃত্যু বলিয়া গণনা না করিয়া হতাশাকেই মৃত্যু বলিয়া জানিবে। বিশ্বাসের শক্তিতে সকল হতাশা ও অবসাদ, দুর্ব্বলতা ও দুশ্চিন্তা অন্তর হইতে দূর করিয়া দাও।

স্বাস্থ্যহীনতা ও মহৎ কর্ম্ম

"আর, স্বাস্থ্যহীনতার কথাটা মনের মধ্যে অবিরাম জীয়াইয়া রাখিও না। তুমি চিররুগ্ন স্বাস্থ্যহীন এই কথাটা পারিলে যতটা সম্ভব ভুলিয়া যাও। মহৎ কর্ম্মে নিজেকে

নিযুক্ত কর। এমন ভাবে নিজেকে উহাতে লাগাইয়া রাখ যেন তোমার পক্ষে সুস্থতা ও অসুস্থতার চিন্তা করিবার অবসর পর্য্যন্ত না ঘটে। মহৎ কর্ম্মে নিজেকে অবিরত লাগাইয়া রাখিলে মহৎ কর্ম্মের জন্যেই আপনা আপনি স্বাস্থ্য সেই কর্ম্মের প্রয়োজনরূপ নির্দ্দোষতা লাভ করিতে থাকিবে। সচ্চিন্তা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী আরোগ্যদায়িকা শক্তি। সৎ চিন্তাকে একান্ত ভাবে সুস্পষ্ট রাখিয়া যে ব্যক্তি সৎ কার্য্যের অনুশীলনে ব্রতী হয়, তার পক্ষে রুগ্নতা ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের রূপ প্রাপ্ত হয়। জগতের অনেক চিররুগ্ন ব্যক্তি সচ্চিন্তার একাগ্র সাধনের মধ্য দিয়া সৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়া হয় ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, নতুবা এই অসম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া এমন শ্রেষ্ঠ কার্য্য-কল্যাণ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, যাহার তুলনা মিলে না। সুতরাং হতাশ বা নিরুদ্যম না হইয়া মহদাদর্শের পায়ে অবিলম্বে প্রাণ বিকাইবার ব্রত গ্রহণ কর। মহৎ ব্রতের মহিমা জগতে চিরকালই থাকিবে।"

বিপদ সম্পর্কে সজাগ থাক

বরিশাল পিরোজপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একবার যাহার ঘর পোড়া যায়, সে চিরকাল গৃহে অগ্নি-সংযোগ সম্পর্কে সতর্ক ও সচকিত থাকে। একবার যে বিপদ তোমার আসিয়াছে, ঠিক্ সেই দিক হইতে না আসিয়া

অপর দিক হইতে হইলেও, সেই বিপদ দ্বিতীয় বার আসিতে পারে। সুতরাং সর্ব্বদা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও রাজনৈতিক উৎপীড়নের ব্যাপারে এই পুনঃ পৌনিকতা একটা চির-নির্দ্ধারিত ব্যাপার। যে উৎপীড়ন সহিয়াছে, সে বারংবার সহিয়াছে। যে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাকে বারংবার দেশ ছাড়িতে হইয়াছে এবং যতবারই সে যে দেশে গিয়া সুখের নীড় বাঁধুক না কেন, কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তাহার কপাল পুড়িয়াছে। সুতরাং অভিজ্ঞতার আলোকে যাহাকে বিপদ বলিয়া জানিয়াছ, বুঝিয়াছ, দেখিয়াছ, তাহার সম্পর্কে সতর্কতা কোনও সময়েই শিথিল করিও না। ভাবী বিপদ সম্পর্কে সর্ব্বদা সজাগ থাক এবং আত্মরক্ষার জন্য নিয়ত প্রস্তুত হও। কিন্তু জীবনের অগ্রগতির পথে এই বিপদের চিন্তাকে একটা গুরুতর বোঝারূপে কখনও চাপাইও না। বিপদের চিন্তা করিতে করিতে মস্তিষ্ককে এমন ভারাক্রান্তও করিও না, যাহাতে বিপন্নিবারক শক্তি হ্রাস পায় কিম্বা জলাতঙ্ক রোগের ন্যায় নিদারুণ মানসিক বিকলতা ঘটে। বিপদ সর্ব্বাবস্থাতেই পরিহরণীয়, কিন্তু আসিয়া পড়িলে নির্ম্মম মুষ্টিতে কৃপাণ ধরিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিতে হইবে।"

অলসতা ও বাতব্যাধি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত মোচাগড়া-নিবাসী অপর এক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিশ্রামের নাম করিয়া তোমরা অলস যে হইয়া যাইতেছ, তাহা কি খেয়াল করিতেছ? আমি ত' বলিয়া থাকি, বিশ্রাম করিব দেহ-পতনের পর। তোমাদের বিরাট বিরাট দেহগুলি কর্ম্মক্ষম থাকিতেই তোমরা বিশ্রামের জন্য পাগল হইয়া যাইবে? যৌবনে কঠোর শ্রম করিবে না, করিবে কি শ্লথগতি প্রৌঢ়ে আর জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে? তোমরা যে বিশ্রামের নাম করিয়া নিজ নিজ চরিত্রে আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া বেড়াইতেছ, ইহার ফলে আমাকে হয়ত প্রৌঢ়ে বা বার্দ্ধক্যেও অতিশ্রম দিয়া মরিতে হইবে। শরীরকে একটু চাড়া দাও। তোয়াজ করিয়া কাটাইয়া দিবার জন্য যৌবন নহে। আজ যদি শ্রমে কুণ্ঠা থাকে, বার্দ্ধক্যে বিশ্রাম পাইবে পঙ্গুতায়। জানিও, অলসতাই বাতব্যাধির গুপ্ত-প্রণয়িনী।"

অতপস্বীর কথা

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত ভৈরববাজার-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সর্ব্বান্তঃকরণে তপস্বী হও, সর্ব্বতোভাবে তপস্বী হও। বহির্ম্মুখী চিত্ত-বৃত্তিকে সংযত সংহৃত করিয়া ইষ্টমুখী কর। চারিদিকের সহস্র বাচাল কোলাহল হইতে মন তুলিয়া আনিয়া একটী লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত কর। সূক্ষ্মসূক্ষ্ম রবিরশ্মিগুলিকে আতশী কাচের দ্বারা একটী কেন্দ্রে সম্মিলিত করিয়া মানবের নিস্তেজ

মনে আগুন ধরাইবার ক্ষমতা অর্জ্জন কর। জগতের সকল লোকই মাটি কাটিবে না, জল টানিবে না, কাঠ ফাঁড়িবে না, কয়লা খুঁড়িবে না। কেহ কেহ কথাও বলিবেন এবং তাঁহাদের একজনের কথা শুনিয়া সহস্র জন নিজেদের কাজ চিনিবে। এইরূপ তোমরা হও। কথা ত' অনেকেই কহে, কিন্তু অতপস্বীর কথা ভারতের বাজারে বিকাইবে না।"

বিশ্বাসীর নাহি পরাজয়

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত জিয়াগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দুঃখ বিপদ আসিবে, কিন্তু বিপদ কাটিয়া যাইবে। ঘনঘটা যতই দেখ না কেন, আকাশের মেঘ চিরকালই চপল। এ মেঘ কাটিবেই। বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া পথ চল, নির্ভরের শিরস্ত্রাণ তোমার মাথার পর, নিষ্ঠার বর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত কর। বৃষ্টি-বাদলে, ঝড়-ঝঞ্ঝায় তোমার কিছুই করিতে পারিবে না। অবিশ্বাসীরাই পড়ে এবং মরে। বিশ্বাসীর নাহি পরাজয়; বিশ্বাসের তুল্য শক্তি নাই এবং বিশ্বাসীর বক্ষ হিমালয়ের ন্যায় প্রশস্ত।"

আত্মজয়ী ও বিশ্বজয়ী

পাবনা জেলান্তর্গত উল্লাপাড়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগজ্জয়ী হইতে চাও, আত্মজয়ে চেষ্টিত হও। আত্মজয়ী যে, বিশ্বজয়ী সে। আত্মসুখের লালসাই মানুষকে পরাধীন করে, অমানুষ করে,—আত্ম-সুখের লালসাই চির-দুঃখের ধাত্রী। জেতাই সুখী, কিন্তু দিগ্বিজেতা নয়, আত্মজেতা।"

জাগরণের বাণী

বগুড়া জেলান্তর্গত চন্দনবাইশা-নিবাসী অপর এক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আবাল্য আমি জাগরণের গীতিই গাহিয়া যাইতেছি, জাগরণের বাণীই শুনাইয়া আসিতেছি। একটী বালককে, একটী যুবককে আমি আমার বাণী না শুনিয়া আমার নিকট হইতে দূরে সরিতে দেই নাই, প্রেমের বাহু-বন্ধনে তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া আমার পরম প্রেমময় প্রাণ-প্রভুর ধ্যানলব্ধ নির্দ্দেশ তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছি—

অলস তন্দ্রায় আর
কাটায়ো না কাল,
ওঠ, জাগ, কর কাজ
মহিমা-বিশাল।

"এই বাণী কখনই বিফল হয় নাই, কখনও বিফল হইতে পারে না। আমি যাহা প্রচার করিয়াছি, তোমরাও তাহা প্রচারের ভার লও। আমি যাহা একটী কণ্ঠে কহিয়াছি, তোমরা তাহা সহস্র কণ্ঠে কহিয়া যাও। যদি মনে কর

তোমাদের কাহারও কণ্ঠ আমার কণ্ঠের তুল্য বল ধারণ করে না, তাহা হইলে সকলে সমস্বরে বল, সমকণ্ঠে বল, সজোরে বল। তাহাতেও ত' কাজ হইবে।"

দেশের কথা ভাব

কুমিল্লা জেলান্তর্গত মেহার-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে যাহার কথা ভাবে, সে তাহাকে টানে। যে অবিরাম অনুক্ষণ ভাবে, সে অবিরাম অনুক্ষণ টানে। যে নিবিড়-গভীর-ভাবে ভাবে, সে নিবিড়-গভীর-ভাবে টানে। তোমরা যদি দেশের কথা ভাব, দেশ তোমাদের সেই টান অনুভব করিবে এবং তীব্র আকর্ষণের টান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তোমাদের কাছে আসিবে, তোমরা যাহা বলিতে চাহ, তাহা শুনিবে, তোমরা যাহা করিতে চাহ, তাহা করিবে। এই কারণেই আমার উপদেশ এই যে, যে-কোনও একটা কাজ তাড়াহুড়া করিয়া করিবার আগে মনপ্রাণ দিয়া দেশের কথা ভাব, দেশের মর্ম্মব্যথা বুঝিতে চেষ্টা কর, দেশের প্রকৃত অভাব কি, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুভব কর। তাহার আগে যে কাজে হাত দিবে, সেই কাজে হয়ত এমন ভুল, এমন ত্রুটি, এমন চ্যুতি থাকিয়া যাইবে যে, বারো আনা প্রতিমা গড়িয়া পরে আবার সেই প্রতিমা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া খড়ের লেপা

বাঁধিবার প্রয়োজন হইবে। এক কাজ দুইবার করিতে হইলে পরমায়ু অর্দ্ধেক হইয়া যায়।"

ইন্দ্রিয়-সুখ ও বন্ধন-মুক্তি

নোয়াখালী জেলান্তর্গত দাগনভূঁইঞা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ইন্দ্রিয়সুখের মাঝে মগ্ন যার মন,
কি প্রকারে করিবে সে বন্ধন মোচন?—সে নিজের বন্ধনও মোচন করিতে পারে না, পরেরও না। সে বন্ধনের পর বন্ধন রচিয়া নিজেকে চিরদিনের জন্য নরকের দুঃখ-নিগ্রহের ভাগী করে এবং যাহারা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাহার সংস্পর্শে আসিবার দুর্ভাগ্য অর্জ্জন করে, তাহাদের গায়ে নরকের সেই তরল অনল ছিটাইয়া দেয়। সুতরাং মুক্তির জন্য যদি প্রাণ ব্যাকুল হইয়া থাকে, সেই মুক্তি আধ্যাত্মিকই হউক, সামাজিকই হউক, নৈতিকই হউক আর রাষ্ট্রিকই হউক, ইন্দ্রিয়-সুখের লিপ্সাকে অবিলম্বে মন হইতে ঝাড়িয়া পুছিয়া ধুইয়া মুছিয়া দূর করিয়া দাও।"

আনন্দজনক গুরুভ্রাতৃসঙ্গ

ঢাকা টাটারিবাজার-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের দেখিলে যে তোমার প্রাণে

অপরিসীম আনন্দের উদয় হয়, তাহার কারণ এই যে, গুরুদেবকে তুমি প্রাণ দিয়া ভালবাস। গুরুতে যাহার অকৃত্রিম এবং অতলস্পর্শ নিষ্ঠা, সে নিজ গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের ভিতরে স্বয়ং গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে, তাই প্রেমে, মাধুর্য্যে, কমনীয়তায়, কোমলতায় যেন বিভোর-ভাব অনুভব করে। প্রকৃত প্রস্তাবে গুরুতে আর শিষ্যেতে তফাৎ কত? পিতাই পুত্র বা কন্যা হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া বেড়ান। পিতার বীর্য্য, পিতার গুণ, পিতার মহিমা, পিতার চরিত্র, পিতার সম্পদ, পিতার বিভূতি পুত্র বা কন্যাকে অল্প হইলেও মণ্ডিত করে। এই জন্যই গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীকে সাক্ষাৎ গুরু-বিগ্রহের অন্যতম প্রকাশ বলিয়া জ্ঞান হয়।

পরিত্যজনীয় গুরুভ্রাতৃসঙ্গ

"কিন্তু যাহারা গুরুদ্রোহী, গুরুতে সন্দিগ্ধ, গুরুর চিন্তায়, বাক্যে বা আচরণে কপটতার আরোপকারী, তেমন গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর সংস্পর্শে চিত্তে সেই বিমল আনন্দের উদ্বেল উচ্ছ্বাস আসিতে পারে না, আসে না। বরং এই সব স্থলে চিত্তের সহজ দীপ্তি বিষাদের আবিলতায় ঢাকিয়া যায়, সহজ স্ফূর্ত্তি অনিশ্চিত দ্বন্দ্ব, শঙ্কা ও আশঙ্কার মেঘচ্ছায়ায় চাপা পড়িয়া থাকে। গুরুনিন্দাকারী দুর্ভাগা ব্যক্তিরা প্রকৃতই নিতান্তই দুর্গত। তাহাদের যাহারা সংসর্গ করে, তাহাদেরও এই দুর্গতির অংশ গ্রহণ করিতে হয়। বসন্ত বা প্লেগ রোগী ছুঁইতে কি

তোমাদের ভয় হয়? যদি হয়, তাহা হইলে গুরুনিন্দক, গুরুদূষক, গুরুদ্রোহী তথা কথিত গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের সঙ্গ-সম্পর্কে এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা শতগুণ ভয় মনে পোষণ করিয়া চলিও।"

উন্নতির শত্রু

নোয়াখালী জেলান্তর্গত সোমপাড়া-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এত চেষ্টা করিয়াও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছ না বলিয়া লিখিতেছ। কিন্তু একথা ত' ভাবিয়া দেখ নাই যে, উন্নতির শত্রু নিষ্ঠার অভাব। এক কাজে দীর্ঘকাল লাগিয়া থাক না, সে কাজ এখন ঐহিকই হউক, আর আধ্যাত্মিকই হউক, মনের বল লাভ করিতে হইলে দীর্ঘ প্রযত্নে মনের কসরৎ করিতে হয়, দেহের বল লাভ করিতে হইলে দীর্ঘপ্রযত্নে দেহের কসরৎ করিতে হয়। উন্নতি ত' আপনা আপনি হইয়া যাইবে না। তজ্জন্য চাই একনিষ্ঠ অধ্যবসায়। অপর সকল দোষ-ত্রুটি ক্রমশঃ অধ্যবসায়ের গুণেই সংশোধিত হইয়া যায়।"

গ্রামের শত্রু ও কাজের শত্রু

কুমিল্লা জেলান্তর্গত রামচন্দ্রপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের জবাবে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

"একটা কথা তোমাদিগকে আমি বহবার বলিয়াছি যে, গ্রামের শত্রু দলাদলি আর কাজের শত্রু বেশী কথা। গ্রামের যদি উন্নতি করিতে চাহ, তাহা হইলে সকল কাজে হাত দিবার আগে চেষ্টা করিয়া গ্রামের দলাদলি মিটাও, গ্রামে সঙ্ঘবদ্ধতার সৃষ্টি কর, ভেদ-বিসম্বাদ-পরায়ণতার পথে গ্রামের শ্রম শক্তি ও মস্তিষ্ককে অপব্যয়িত হইতে না দিয়া সকল শ্রম ও সকল মস্তিষ্ক যথাসম্ভব একত্র হইয়া সমবেত উদ্যমে গ্রামের সর্ব্বপ্রকার কুশল সম্পাদনে ব্রতী হউক। দ্বিতীয় কথাটি এই যে, কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের বেলা কথার পর কথার বহর না বাড়াইয়া, অবান্তর প্রসঙ্গ-সমূহ বাদ দিয়া প্রকৃত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচনার পরে বৃথা কালহরণ না করিয়া সকলে সবলে যার যার বিভাগ-অনুযায়ী কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়। কর্ম্মী এবং সহকর্ম্মীদের মধ্যে এমন শৃঙ্খলা স্থাপন কর, যেন কোনও কর্ম্মীকে একটী কথা দুইবার বলিতে না হয়। এক কথা দুইবার বলিতে হইলে জীবনের পরমায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়। কাজ সুরু করিবার পরে বারবার তাহার মধ্যে কথার ফ্যাকড়া সৃষ্ট হইলে কাজ মধ্য-পথে থামিয়া যায় এবং এমন ঘটনাও প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে যে, সেই কাজ আর দ্বিতীয় বার ধরিবার সুযোগ ঘটে না। ইহার ফলে অনেক বিদ্যালয়ের ভিত্তিপত্তনের পরে দেওয়াল আর গাঁথা হয় নাই, অনেক ব্যায়ামশালায় জমি বন্দোবস্ত নিবার পরে ঘর আর উঠে নাই।

দলাদলির উৎস

"উদ্দেশ্যের একতানতা স্থাপনের পরে দলাদলি মিটিয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার হয়। যেখানে লক্ষ্যে মিল নাই, সেখানে কর্ম্মে বা কর্ম্মপদ্ধতিতে মিল হওয়া অত্যন্ত কঠিন। উদ্দেশ্যে যেখানে মিল আছে, সেখানে কর্ম্মের বা কর্ম্ম-পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য থাকিলেও এক দলের পার্থক্য অপর দল অনায়াসে গায়ে সহিয়া নেয় এবং এই পার্থক্যের ভিতর দিয়াই উভয় দল নিজেদের মধ্যে একটা সংযোগের মধুরতা ও সহযোগের বান্ধবতা সৃষ্টি করিয়া লয়। জগতে দল থাকিবেই এবং একই উদ্দেশ্যে দুইটী, পাঁচটী, দশটী দলও থাকিতে পারে। কিন্তু দলাদলি ছাড়িতে হইবে। যেখানে প্রশ্ন হইতেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার, যেখানে সমস্যা হইতেছে ক্ষমতা-লাভের, সেখানেই দলাদলির উৎপত্তি হয়। তোমরা সেবক। ক্ষমতালাভের লোভ তোমরা বঙ্গিন্দুতে নিক্ষেপ কর। সেবক করিবে সেবা, তার লক্ষ্য গ্রামের সত্যিকার কুশল, কি করিলে গ্রামের সকল অভাব-অভিযোগ দূর হইবে, ইহাই হইবে তাহার একমাত্র প্রেরণার উৎস। অবশ্য এমন কতকগুলি জনসেবা আছে, যাহা ক্ষমতা হাতে পাইলে সহজে করা যায়। কিন্তু তোমাদের সেবা দেখিয়া যখন জনগণ স্বেচ্ছায় তোমাদের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া ধরিবে, তখন তোমাদের সেই ক্ষমতা হইবে অপ্রতিহত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

শিলচর
২৭শে মাঘ, রবিবার,১৩৪১
(১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

সতীত্ব ও সমাজ

আজও নর্ম্মাল স্কুলের হলে বক্তৃতা হইবে। সময় সকাল সাড়ে সাত ঘটিকা। অদ্যই বক্তৃতাদানের শেষ দিন। শ্রীশ্রীবাবামণি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সভাস্থলে পৌঁছিলেন এবং বক্তৃতার্থে দাঁড়াইলেন। হঠাৎ সহরের একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া প্রস্তাব করিলেন, আজিকার সভায় মাননীয় অমুক সভাপতির আসন গ্রহণ করুন। আর একজন দাঁড়াইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় একজন গিয়া একখানা চেয়ারে বসিলেন। উপস্থিত জনতার মধ্য হইতে কোনও করতালি-ধ্বনি অবশ্য উত্থিত হইল না, যেমনটী এইরূপ স্থলে সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন সভার মেজাজটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতারম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—পুরুষের চরিত্রবল যেন কংক্রিটের টুকরো, কংক্রিট পিটিয়ে তার উপরে ইমারৎ গড়লে তার আর দেওয়াল ফাটে না। কিন্তু নারীর সতীত্ব হচ্ছে সমাজের সিমেন্ট। অনুজন, পরিজন, প্রতিবেশী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্যপালন হচ্ছে যেন কর্দ্দম-মুক্ত বিশুদ্ধ বালি। এই তিনের যথাযোগ্য সংমিশ্রণ

ঘটিলে এমন শক্ত বনিয়াদ হয়, যার উপরে সাত-তালা দশ-তালা, বিশ-তালা দালানও উঠ্‌তে পারে। প্রচুর পাথরের টুকরাতে স্বল্পতর পরিমাণ সিমেন্টের প্রয়োজন হয় কিন্তু সিমেন্টের অভাব ঘটিলে কেবল পাথর দিয়ে স্থায়ী নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না। যে সিমেন্টে ভেজাল যত কম, সেই সিমেন্টে ইমারৎ তত শক্ত ক'রে গাঁথা যায়। যে সমাজে নারীর সতীত্ব যত অটুট, সে সমাজের দৃঢ়তা তত অধিক হ'তে বাধ্য। সতীত্ব হচ্ছে সেই থার্ম্মোমিটার, যা' দিয়ে সভ্যতার প্রকৃত অবস্থা নির্ণীত হবে। নারীর সতীত্ব-বর্জ্জিত সমাজ পশুর সমাজ। যে সমাজ নারীর অসতীত্বকে কতকটা বিধির আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখে কোনও প্রকারে চালু থাক্‌তে দেয়, তা' অর্দ্ধ-মানবের সমাজ। যে সমাজ নারীর সতীত্বকে তার অস্তিত্বের প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত-রূপে গ্রহণ করে, সে সমাজই প্রকৃত মানবের সমাজ বা দেবতার সমাজ। নারী যে দেবী, এই প্রত্যয়ে সেই সমাজের লোকেরাই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, যারা নারীকে সতীরূপে, সাধ্বীরূপে, একপরায়ণা ও নিষ্ঠাবতী-রূপে দেখ্‌তে ও জান্‌তে অভ্যস্ত। একই রমণী দশবার দশ জনের কাছে নিজের দেহমনকে নিয়ে বেশাতি চালাবে আর তাকে দেবী ব'লে বন্দনা ক'রে কৃতার্থ হ'তে হবে, এ আদর্শ মানুষের নয়, বন-মানুষের। বারংবার পতি-পরিবর্ত্তন আইনের সাহায্যেই হোক্ কিম্বা প্রথার সাহায্যেই হোক্, দেব-মানব-সমাজের বন্দনীয় কোনও অবস্থাতেই হবে না।

নারীর সতীত্ব ও পুরুষজাতির কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু সতীত্বের আদর্শটা মুখে মুখে মেনে নিলেই চল্‌বে না। নারী যাতে নিজ সতীত্ব অটুট রেখে সমাজে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে চল্‌তে পারে, সেই ব্যবস্থাও পুরুষজাতিরই কর্ত্তে হবে। একটী সীতাকে হরণ করার ফলে লঙ্কাপুরী ছারখার হ'য়েছিল, রাক্ষস-বংশ নির্ব্বংশ হয়েছিল। আমাদের সমাজে যদি আমরা তেমন ব্যবস্থা রাখ্‌তে পারি, তবে বলা চল্‌বে যে এটা আদর্শ-সমাজ। বড় বড় বুলি কপ্‌চালেই কোনো সমাজ আদর্শ হয় না, সেই কথাগুলি কার্য্যে পরিণত করার সুব্যবস্থাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। মুখে সতীত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কচ্ছি, আর দুর্ব্বৃত্ত এসে আমার মা, বোন্, কন্যার গায়ে হাত দিলে মুখ বুঁজে তা' সহ্য ক'রে যাচ্ছি, আদর্শ-সমাজ-গঠনের এটা উপায় নয়। নারীর মর্য্যাদা যেখানে লঙ্ঘিত হবে, সেখানে আমার উদ্যত কৃপাণ কাউকে ক্ষমা কর্ব্বে না, এই হবে আমার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি। আমরা যদি হই কাপুরুষ পশু, আমাদের নারীদের সতীত্বের কোনও প্রয়োজনই নেই। আর নারীদের সতীত্ব রক্ষার ব্যবস্থা যদি আমাদের সর্ব্বস্ব দানের বিনিময়ে কর্ত্তে সর্ব্বদা প্রস্তুত না থাকি, তাহ'লে আমাদের পশুতে পরিণত হ'তে বাকীও কিছু নেই। আমরা ঋষির বংশধর, আমরা

উত্তম সভ্যতার অধিকারী, আমরা জগতের প্রাচীনতম জ্ঞানের ধারক ও বাহক, এই সব গর্ব্বোদ্ধত কথা আর প্রলাপ-বচন সমান কথা, যদি না নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার আগেই মর্য্যাদার প্রতি আততায়ীকে ধ্বংস ক'রে দিতে পারি। আমাদের চোখের সাম্‌নে আমাদের কন্যা, ভগিনী, মাতাকে দুর্ব্বৃত্ত শয়তান এসে টেনে নিয়ে যাবে, আর আমরা নীরবে সহ্য কর্ব্ব, এই প্রত্যাশা ক'রেই কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের জন্য বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ও গীতা রচনা ক'রে রেখে গেছেন? এসব শাস্ত্র কি কাপুরুষদের জন্যই রচিত হয়েছিল? আমার কন্যাকে দুষ্ট লোকে কেড়ে নিয়ে গেল, আর আমি পুলিশ আদালতে দৌড়াদৌড়ি ক'রেই কর্ত্তব্য সেরে নিলাম, আমি পিতা নামের অযোগ্য। আমার ভগিনীকে দুর্ব্বৃত্তেরা গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, নিত্য নূতন উপদ্রবকারী তার পবিত্র অঙ্গে কলুষিত স্পর্শ দিচ্ছে, আর আমি খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে নিদারুণ হাহুতাশ ক'রেই কর্ত্তব্য সমাপন কর্‌লাম, আমি ভ্রাতা নামের অযোগ্য।

সতীত্বনাশকারীর প্রতি ক্ষমা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেকের মুখেই ক্ষমা নামক পরম ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন শুন্‌তে পাওয়া যায়। কেউ সে কথা বুঝে বলেন, কেউ বা বলেন না-বুঝে। কিন্তু অক্ষমের ক্ষমা—ক্ষমাই নয় এবং আমরা এতকাল ধ'রে যত প্রকারের ক্ষমা

যত অবস্থায় ক'রে এসেছি, তার অধিকাংশই ত' কাপুরুষতা। নারীর সতীত্বে হস্তক্ষেপকারীকে ক্ষমা কর্ত্তে যে উপদেশ দেয়, সেই ব্যক্তিও ক্ষমার অযোগ্য। এই সব ক্ষেত্রে আমরা হিংসা-অহিংসার তাত্ত্বিক গবেষণায় সময় নষ্ট কর্ব্ব না, করা উচিত নয়। হিংসা ভালো কি অহিংসা ভালো, সেই কথার বিচার অন্য ক্ষেত্রে হবে। সতীত্ব হচ্ছে আমাদের সভ্যতার বনিয়াদ। এই বনিয়াদের উপরে যে হাত দিতে আস্‌বে, তার সম্পর্কে হিংসা বা অহিংসার বিচার নাই। যে ভাবে পারি, তাকে ধ্বংস কর্ব্ব, যে ভাবে পারি, সতীর চক্ষের অশ্রু মুছাব। ভীম যে দুঃশাসনের রক্ত পান করেছিলেন, অনেকেই এটাকে অতীব বীভৎস ব্যাপার ব'লে মনে করেন। কিন্তু দ্রৌপদীর অপমানের কথা স্মরণ কর্লে আমার মনে হয় যে, শুধু রক্ত পানে যথেষ্ট হয় নাই, দুঃশাসনের মাংস কেটে কেটে চর্ব্বণ করাও মন্দ হ'ত না। অবশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেনের তত অবসর ছিল না। রাজা যে সবংশে নির্ব্বংশ হ'ল, এজন্য কারো প্রাণে বেদনা হয় না, হ'তে পারে না। সতীত্ব নাশকারীর প্রতি ক্ষমা, তার কুকার্য্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা-কারীদের প্রতি ক্ষমা অসম্ভব। এ ক্ষমা পশুতে কর্ত্তে পারে, মানুষে পারে না। পারা উচিত নয়। এরূপ ব্যাপারেও যে ক্ষমা কর্ত্তে পারে, সে মানুষ নামের অযোগ্য। সতীর লাঞ্ছনাকে যারা অন্তরের শুধু সহানুভূতি নিয়ে নীরবে দূর থেকে দর্শন করে, সতীর নির্য্যাতনে যারা—যে কোনও কারণেই হোক—

আনন্দিত হয়, তারাও মানব-সমাজের শত্রু। এক সমাজের সতীর লাঞ্ছনা অনেক সময়ে অপর সমাজের সম্প্রদায়-পরিপুষ্টির সহায়ক হয়। সেরূপ স্থলে ভিন্ন সমাজের সতীর লাঞ্ছনা, ভিন্ন সমাজের নারীহরণ, কোনও কোনও সমাজের অনেক ব্যক্তির আন্তরিক সমর্থনের বিষয় হয়ে দাঁড়ানো বিচিত্র নয়। জানতে হবে, এরূপ সমর্থনকারীরা সমগ্র মানব-সভ্যতার পরম শত্রু। নারীনির্য্যাতনকারী দুর্ব্বৃত্তদিগকে আদর্শ শাস্তি অবিরাম দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ঐরূপ নীরব সমর্থনকারীদের মনের ভিতরে আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন আসতে বাধ্য। সুন্দর সুন্দর যুক্তিগর্ভ ললিতভাষণে এ পরিবর্ত্তন আসতে পারে না। কাতর অনুনয়-বিনয়-প্রার্থনার দ্বারাও নয়।

জঘন্যতম পাপ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পৃথিবীর সকল সমাজ অপর সকল সমাজের সাথে যাতে মিলে মিশে বাস কত্তে পারে, তেমন অনুকূল অবস্থার নাম মানুষের সভ্যতা। কিন্তু কখন সেই অবস্থাটী সম্ভব হয়? যখন একের ধন অপরে অবৈধ ভাবে কেড়ে নেবার চেষ্টা করে না, যখন একের নারীকে অপরে নির্য্যাতন বা অপহরণ কত্তে ঘৃণা বোধ করে। পরদ্রব্যে লোষ্ট্রদৃষ্টি, পরদারে মাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হ'লে জগতের সকল বিরুদ্ধ সম্প্রদায় একত্র মহাশান্তিতে বাস কত্তে পারে। জগতে যত পাপ আছে, তন্মধ্যে নারীর সতীত্বে আঘাত দেওয়ার

চাইতে বড় পাপ আর কিছু নাই। এর চেয়ে জঘন্যতম পাপের আবিষ্কার বা কল্পনা জগতের কোনো অপরাধী ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত কত্তে পারে নি। এই পাপের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হওয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব, যুবকের যুবকত্ব। একথা আমরা কদাচ বিস্মৃত হতে পারি না।

সতীত্বের মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে পরোক্ষ সহায়তাকারিগণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অনেক মহদাশয় ব্যক্তি অনেক সময়ে না বুঝে সমাজমধ্যে এমন সব নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করেন, যার ফলে অপ্রকাশ্যে অনেক নারীর সতীত্বে ক্রমশঃ আঘাত পড়তে থাকে, অপ্রত্যক্ষে অনেক পুরুষ নারীদের সতীত্বে আঘাত কত্তে প্রলুব্ধ হয়। এ সকল নবপ্রবর্ত্তনের সম্পর্কেও আমাদের উদাসীন হ'তে হবে। বড়লোক কেউ প্রবর্ত্তন করেছেন ব'লেই আমরা বিনা প্রতিবাদে নারীর সতীত্ব-বোধের শ্লথতা-বিধায়ক বিধান মেনে নেবো কিম্বা নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রমের প্রতি যাতে পুরুষের শ্রদ্ধা আস্তে আস্তে অপচিত হ'তে পারে, এমন ব্যবস্থাকে স্বীকার কর্ব্বো, এ ক্লৈব্য, এ দৌর্ব্বল্য যেন আমাদের কখনো না আসে। নারীর পবিত্র অঙ্গে হাত দিয়ে তার কটিতটের বস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে বলাৎকার কল্লেই সতীত্বের অমর্য্যাদা করা হ'ল, তা' নয়। যারা শিল্পে, সাহিত্যে, নাট্যে, বক্তৃতায়, চিত্রে, বিজ্ঞাপনে বা

জীবনযাত্রার প্রণালীতে পরোক্ষ ভাবে সতী-নারীর মনে সতীত্ব-সম্পর্কিত পবিত্র ধারণা শিথিল করার সাহায্য করে বা পুরুষ-সাধারণকে সতীত্বের মূল্য সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ কর্ত্তে প্রলোভনা বা প্ররোচনা যোগায়, তারাও সমাজের ঘোরতর শত্রু। তাদের প্রতিও আমাদের যা' কর্ত্তব্য, তা' আমরা ভুলে থাকতে পারি না।

সতীত্ব বিপন্ন হইলে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু আরও গভীরতর কর্ত্তব্য আমাদের মেয়েদেরই প্রতি। তাদের বুকে সতীত্ব-রক্ষার আগ্রহ দিতে হবে, সাহস দিতে হবে, বল দিতে হবে। যে যেখানে টেনে নেয়, চিত্র-পুত্তলিকার মত তার টানের চোটেই ঘুরে না বেড়িয়ে অন্য অস্ত্র না পায় ত' ঘরের বঁটি দা-খানা দিয়েই সে আততায়ীকে আক্রমণ কর্বে, নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য তাকে হত্যা কর্বে এবং তাকে বা তার দলবলকে কিছুতেই কাবু কর্ত্তে না পারলে নিজের বঁটিতে নিজে প্রাণ দেবে। জীবন দিতেও সে স্বীকৃতা থাক্‌বে, কিন্তু পশুর কাছে লাঞ্ছনা সে স্বীকার কর্বে না। বঁটিখানাও যদি সে না পায় ত' তার নখ আছে, তার দাঁত আছে। নখ দি'য়ে সে পশুটার চক্ষু অন্ধ ক'রে দিক্, মুখের কাছে মুখ নিয়ে দাঁত দিয়ে সে তার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে সাত টুকুরো ক'রে দিক্। সতীত্বই যখন যাবে, তার আগে ঘৃণা এবং প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিতে

হবে। পশুরা এসে বলাৎকার ক'রে যাবে, আর তারপরেও বেঁচে থাক্‌বে, জীবনের প্রতি এমন হীন প্রকৃতির মমতা সমাজের একটী মেয়েরও যেন না থাকে। প্রেমশীলা, মমতাময়ী, স্নেহপরায়ণা, কুসুমকোমলা, মধু-ভাষিণী, মৃদুস্বভাবা, ভদ্রচরিতা নারীর অন্তরেও অন্ততঃ এই সময়ের জন্য কঠোর পরুষতা, নিদারুণ রুক্ষতা এবং রুদ্র রোষ সৃষ্টি করার অনুকূল শিক্ষা তাদের ছোট্ট কাল থেকেই দিয়ে দিতে হবে।

সতীত্ব-নাশকারী দুর্ব্বৃত্তকে কাবু করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রত্যেক মেয়েকে যুযুৎসু শিখানো আমাদের এক সুমহৎ কর্ত্তব্য। যুযুৎসু যে শিখেছে, অনেক সময়েই সে গুপ্ত-ঘাতকের ছুরিকা আর সতীত্ব-নাশকারীর বলপ্রয়োগের হাত থেকে নিজেকে সহজে মুক্ত ক'রে নিতে পারে। কিন্তু যার এসব শিক্ষা নেই, সে নিতান্ত অবলা হ'লেও লম্পট আক্রমণকারীকে অতি সহজ কৌশলে কাবু কর্ত্তে পারে। কুমীরে কাউকে ধরলে সে যদি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-সম্পন্ন হয়, তাহ'লে কুমীরের চ'খ দুটোকে জোর ক'রে চেপে ধরে। কুমীরের চ'খ চিংড়ি মাছের চ'খের মতন বাইরে ঝুলে থাকে। চখের উপরে হাতের চাপ যত বেশী পড়তে থাকে, কুমীর ততই অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হ'তে থাকে। শেষে যন্ত্রণা একেবারে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে

কুমীর তার বড় সাধের শিকার ত্যাগ ক'রে নিজের প্রাণ নিয়ে ছুটে পালায়।

আদর্শপরায়ণ মহাজাতির সৃষ্টি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমাদের নিজ সমাজের ভিতরেই কতকগুলি লম্পট আছে, যারা গোপনে বা প্রকাশ্যে নারীর সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কচ্ছে। সেই লোকগুলি সম্পর্কে আমাদের ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু থাকা চলবে না। কেন আমরা আমাদের সমাজকে এমন ক'রে গ'ড়ে তুলব না, যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রত্যেকে বিনা প্রমাণে বিশ্বাস কত্তে পারে যে, তাদের জন্ম এমন পিতার ঔরসে, যিনি একটী নারী ব্যতীত দ্বিতীয়া নারীতে আসক্ত হন নাই, তাদের জন্ম এমন মাতার গর্ভে, যিনি একটী পুরুষ ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষের সংস্পর্শ করেন নাই। সৎ পিতা ও সতী মাতার মিলন-জাত সন্তান-সন্ততিরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশগুলিকে বৃদ্ধিশীল করতে সমর্থ হউক। একটা আদর্শপরায়ণ, মহানুভব এবং আদর্শস্থানীয় জাতির সৃষ্টি-ব্যাপারের এইটীই হ'ল মূল কথা।

পূর্ণ তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতাদানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি সভাস্থলে জবর দখলকারী ভদ্রলোকদের কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। খড়ম যখন তাঁহার চরণে এবং সভাস্থলটী যখন পাকা-মেঝে, তখন কর্ণপীড়াদায়ক

খট্‌খট্‌ শব্দটী যে হইলই, ইহা উল্লেখ করিতেই হইবে। (এস্থলে উল্লেখ করিবার আরও একটী কারণ রহিয়াছে। কয়েক দিন পরে কলিকাতার দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় শিলচরে কাহারও প্রেরিত একটী সংবাদ প্রকাশিত হইল "সংযম-প্রচারকের অসংযম" হেডিং দিয়া এবং তাহার প্রধান খবর হইল এই যে, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব খড়মের খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।)

গুণ্ডামি ও সত্য আন্দোলন

সভাস্থলের বাহিরে ছোট্ট একটী ষ্টলের মত করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির বিক্রেয় পুস্তক রক্ষিত ছিল। নিজ যাতায়াত-পাথেয়ের জন্যও ইনি কদাচ চাঁদা তোলেন না বলিয়া বা অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হন না বলিয়া এই ষ্টলটী সত্য সত্যই একটী প্রয়োজনীয় জিনিষ। সভাস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি দেখিলেন, ষ্টলটী লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং কতকগুলি পুস্তক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা দিকে ছুড়িয়া ফেলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুণ্ডামি দ্বারা কেউ কখনো সত্য আন্দোলনকে দমন ক'রে রাখতে পারে না। লুণ্ঠন, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি কোনও কিছু দ্বারাই তা' সম্ভব হয় না।

সব ভাল, যার শেষ ভাল

অনুসন্ধানে জানা গেল, একদল উদ্ধত মানুষ যখন এই অপকার্য্যটিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন অপর একদল বিবেকবান্ পুরুষ এই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন এবং অপকার্য্যকারীদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রারম্ভটা ভালই হ'ল। যার আরম্ভ দুর্য্যোগে তার উপসংহার ঠিক বিপরীত ভাবেই হবে। একদিন এই সহরে এবং এই জেলায় আমার সহস্র সহস্র সমর্থকের আবির্ভাব হবে। সব ভাল, যার শেষ ভাল। চারিদিকে ছড়ান সব অত্যুৎকৃষ্ট উপাদান, তাকে আদর ক'রে কাছে টেনে গড়ে তোলা প্রয়োজন। তখন দেখা যাবে যে, সাধারণ মানুষেরা কেবলই সাধারণ নয়, তারা অসাধারণও বটে। সময় হ'লে, সুযোগ হ'লে আমি সমগ্র জেলাটা ঘুরব এবং শিলচরকে কিলচড়ের বিনিময়ে স্নেহ-ভালবাসা বিলিয়ে যাব।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি যুক্ত-করে বলিলেন,—প্রভু, আপনার এ মহাবাক্য সত্য হোক্, সফল হোক্।

অদ্য দ্বিপ্রহরের আহারের ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র দেব মহাশয়ের গৃহে নহে। নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র পুরকায়স্থ মহাশয়ের ভবনে দ্বিপ্রহরের প্রসাদ দানের আমন্ত্রণ। নর্ম্মাল স্কুলের অতি সন্নিকটেই সেই বাসস্থান। সঙ্গীয়-ব্রহ্মচারী রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত।

গুরু ও শিষ্যের বিচ্ছেদের অধিকার

পুরকায়স্থ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন,—কেউ যদি আগে এক গুরুর কাছে দীক্ষিত হয়ে থাকেন এবং পরে আর একজনের কোনও বিশেষত্ব দেখে সেই দ্বিতীয় গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তবে কাজটা ভাল হয়, না মন্দ হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এক কথায় এ'র জবাব দেওয়া চলে না। প্রথমে যিনি গুরু হ'লেন তিনি যদি অযোগ্য ব্যক্তি হন, তবে গুর্ব্বান্তর ছাড়া শিষ্যের গত্যন্তর নেই। কিন্তু যিনি শিষ্য হ'লেন, তিনিও যদি মহান গুরুর শিষ্য হবার যোগ্য না হন এবং নিজেকে এমন গুরুর যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তোলার যদি তাঁর দারুণ প্রতিবন্ধক কিছু থাকে, তবে নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকেই পুনরায় গুরুরূপে গ্রহণ ব্যতীত তাঁরও গত্যন্তর কোথায়? কে কেমন গুরু আর কে কেমন শিষ্য, এই দুইটী প্রশ্নের জবাবকে ভিত্তি করেই এস্থলে শেষ সিদ্ধান্তটী নির্ণীত হবে। গুরু পথ দেখিয়ে নিয়ে আগে আগে চল্‌বেন, সুতরাং গুরুতে আর শিষ্যতে প্রকৃতিগত একটা সমতার ভাব থাকা একান্ত আবশ্যক। গুরুদেবের চরিত্রের ঢংই যদি এই হয় যে, তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ কর্‌বেন, তবে জাত্যভিমানী উচ্চবর্ণের লোকদের পক্ষে এইরূপ গুরুই শ্লাঘ্য হবেন, সন্দেহ নেই। গুরুদেবের চরিত্রের বিশেষত্ব যদি

এই হয় যে, তিনি স্ত্রী-শূদ্র-চামার-চণ্ডাল প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থার সর্ব্ব-জীবকে আদরের বস্তু ব'লে মনে কর্বেন, তা' হ'লে উচ্চবর্ণসুলভ জাত্যভিমান যাদের নেই, এমন লোকেরাই তাঁর ছত্রচ্ছায়াতলে এসে দাঁড়াবেন। কে কার গুরু হওয়ার উপযুক্ত আর কে তার শিষ্য হওয়ার যোগ্য, এই বিষয়ে পূর্ণ প্রতীতি না থাকার দরুণ অনেক গুরু ভুল লোককে শিষ্য করেন, অনেক শিষ্য ভুল মানুষটীকে গুরু করেন এবং কিছুদিন পরে গুরুর দায় এসে যায় শিষ্যটির কাছ থেকে দূরে থাকায়, শিষ্যের প্রয়োজন প'ড়ে যায় অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করার। গুরু এবং শিষ্যের এই প্রয়োজনের দাবী মেটাবার স্বাধীনতার দিকে তাকিয়ে বিচার কর্ল্লে নিশ্চয়ই বলতে হবে যে, কেউ যোগ্যতর গুরু পেলে অন্য গুরুর আশ্রয় নিতে পারে।

গুর্ব্বন্তর-গ্রহণের বিপদ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এতে বিপদও কম নয়, এতে ঝুঁকিও যথেষ্ট আছে। আমি যাঁকে অযোগ্য ব'লে বর্জ্জন কর্লাম, তাঁর চেয়ে বেশী অযোগ্য কি তিনি হ'তে পারেন না, যাঁকে দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বার গুরুরূপে বরণ কর্লাম? প্রথম পতিটি কাণে শোনেন না ব'লে স্বেচ্ছাচারের দেশের মেয়েরা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে কিন্তু তারপরে যদি টের পায় যে দ্বিতীয় জন আবার চোখে দেখেন না, তখন কেমন

অবস্থাটা হবে? পুনরায় তৃতীয় পতি গ্রহণ হ'লে পরিত্রাণ। কিন্তু পরে যদি দেখা যায় যে, তৃতীয় পতির পতিজনোচিত আসল গুণটীরই অভাব, তখন কি চতুর্থবার পত্যন্তরের বিধান দিতে হবে না? এই দুর্ভোগ থেকে ছেলেমেয়েদের বাঁচাবার জন্য Companionate Marriage (পরীক্ষামূলক বিবাহ) প্রচলিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এই অবস্থাটা যাতে না হয়, তার জন্যই ত' এদেশে ব্যবস্থা রয়েছে যে, গুরু করার আগে এক বৎসর তাঁকে পরীক্ষা কর, শিষ্য করার আগে এক বৎসর তাকে পরীক্ষা কর, এভাবে দুইটি বৎসর চলে যাবার পরে বিচারে বিভ্রম ঘটবার সম্ভাবনা যাবে কমে। মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, অতি গুরুতর এবং অতি ভয়ঙ্কর কারণ কিছু না থাক্‌লে একজন গুরুর উপদেশেই চলা সব চেয়ে ভাল, দশ দিকে তাকান ঠিক নয়।

শিলচর-মহাকাব্যের উপসংহার

হঠাৎ পুরকায়স্থ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাল কি আপনি আমার গৃহে এসেছিলেন?

—না তো!

—আমি আপনাকে দেখেছি।

—কোথায়? কখন?

—আমার এই ঘরে। রাত দশটার সময়।

—না, আমি আসিনি। আমি শিলংপট্টিতে প্রতাপ বাবুর

ঘরে ব'সে চিঠিপত্র লেখায় ব্যস্ত ছিলাম। আমি তখন আস্‌ব কি ক'রে? আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।

—না, আমি জাগ্রত ছিলাম। আপনি এসে বল্লেন, আমার এক জোড়া মোজা চাই, এক জোড়া খড়ম চাই। মোজা এবং খড়ম আমি কিনে রেখে দিয়েছি। কিন্তু মোজা পায়ে খড়ম পরবেন কি ক'রে? আপনার এক জোড়া জুতোর প্রয়োজন। তার জন্য আমি এই দশটি টাকাও রেখেছি।

খলখল হাসিতে ঘরখানা ভরিয়া দিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জুতোর টাকা নিব না কিন্তু মোজা আর খড়ম আমার এখনি চাই। আমি যদিও আমার প্রয়োজনের কথা বল্‌তে এখানে কাল আসিনি, তবু শিলচর-মহাকাব্যের উপসংহার এই এক জোড়া শুভ্রবর্ণ মোজা দিয়ে চমৎকার ভাবেই হ'ল।

পুরকায়স্থ মহাশয় শ্রীশ্রীবাবামণির চরণদ্বয়ে মোজা জোড়া পরাইয়া দিয়া নূতন খড়ম জোড়া পায়ের কাছে রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

হাইলাকান্দি (কাছাড়)
২৮শে মাঘ, সোমবার, ১৩৪১
(১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

আজ প্রাতে আট ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি হাইলাকান্দি পৌঁছিলেন।

বীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত

একটী তরুণ শ্রীশ্রীবাবামণিকে বলিলেন,—আজ প্রায় সাত-বৎসর ধ'রে প্রত্যেক রাত্রিতে আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। স্বপ্নেই আপনার চেহারা চিনেছি, স্বপ্নেই আপনার পরিচয় জেনেছি। এখানকার অনেককে জিজ্ঞেস করেছি যে, এই নামের কোনও সাধুসজ্জনকে তাঁরা জানেন কিনা। কেউ বল্‌তে পারেন নি। হঠাৎ একদিন এখানকার যশস্বী উকিল গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্যের বাসায় ব'সে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। তিনি বল্লেন, এ নাম আমার পরিচিত। আমার শ্বশুর-বাড়ীর দেশে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হাজার হাজার লোক এই নামটী জানে, এই মানুষটীকে চিনে। তুমি প্রতীক্ষা কর, সময় মত তোমার দর্শন লাভ ঘটবে। তাঁর কাছে আপনার বিষয়ে খোঁজ পেয়ে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি এবং দর্শনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পুপুন্‌কী আশ্রমে চিঠিপত্র লিখেছি। আজকে আমার সেই দর্শন হ'ল। আমি ধন্য।

তরুণটীর নাম বীরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত।

তরুণের নিকটে প্রত্যাশা

শ্রীশ্রীবাবামণিকে অত্যধিক সংখ্যায় পত্র লিখিতে ব্যস্ত দেখিয়া শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র বলিলেন,—আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনার পত্রগুলি লিখে যাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করিলেন। তিনি

বলিয়া যাইতে লাগিলেন আর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র দত্ত লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।

ঘণ্টাখানিক পরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অফুরন্ত পত্র লেখা আমার এক দুরন্ত ব্যসন। আমি যত অবলীলাক্রমে পত্র লিখে যাব, তুমি কি ততটা পারবে? তবু তুমি যেচে এসে প্রথম দর্শনের দিনই কাজ চেয়ে নিয়েছ। এইটিই প্রকৃত তরুণের নিকটে আমার প্রত্যাশা।

জাতীয় জীবনে চেতনার লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজ অনেক রকম। হাত দিয়ে কাজ, কণ্ঠ দিয়ে কাজ, মন দিয়ে কাজ, কত প্রকারে যে কত জনে কতকাজ কত্তে পারে, তার কূল-কিনারা নেই। পঙ্গুর মতন চুপ ক'রে বসে না থেকে সবাই বা অধিকাংশ যখন কাজ করার জন্য ব্যগ্র হয়, বলতে হবে যে, জাতীয় জীবনে চেতনা এসেছে। নিরন্তর কর্ম্ম-পরায়ণতাই জাতীয় জীবনে চেতনার লক্ষণ।

ভাঙ্গা এবং গড়া

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাঙ্গা আর গড়া, দুটিই কাজ। গড়তে হ'লে যেমন হিসাব লাগে, ভাঙ্গতে হ'লেও তা চাই। গড়তে হ'লে যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন, ভাঙ্গতে হ'লেও তা চাই। কি ভাঙ্গা, কি গড়া, বেহিসাবী

হাতে পড়লে দুটিরই সর্ব্বনাশ হ'তে পারে। গড়ার যেমন উদ্দেশ্য চাই, ভাঙ্গারও তেমন চাই। শুধু গড়ার জন্য গড়া অনেক সময়ে খামখেয়ালি মাত্র, শুধু ভাঙ্গার জন্য ভাঙ্গা অনেক সময়ে উন্মত্তের আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম আর কর্ম্মহীন উদ্দেশ্য, দুইটিই সমান প্রহসন।

দীর্ঘায়ু লাভ লোভনীয়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা সাধারণত সারাদিনে সারা রাত্রিতে যতগুলি কাজ করি, তার অধিকাংশই অকারণ কর্ম্ম বা পণ্ডশ্রম, শ্রম করি অথচ তার ফলটুকু না পাই নিজে, না পায় জনসাধারণ। এর দরুণ শ্রম আনে ক্লান্তি, ক্লান্তি দেয় অবসাদ। অবসাদ ঘটায় আয়ুর অপচয় আর অল্পায়ুতা হয় সুদীর্ঘ-প্রযত্নে কোনও সুমহৎ উদ্দেশ্যকে করায়ত্ত করার অন্তরায়। কঠোর পরিশ্রম আর দীর্ঘ-বিলম্বিত ধৈর্য্য ছাড়া খুব বড় রকমের কোনও সাফল্য মানুষের জীবনে আসতে পারে না। এই জন্যই দীর্ঘায়ু লাভ লোভনীয়।

দীর্ঘায়ু লাভের উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীর্ঘায়ু লাভ হয় নিশ্চিন্ততায়, নিরুদ্বেগ জীবন-যাপন-প্রণালীতে, শান্ত চিত্তে সত্যানুসন্ধানে, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল সদভ্যাসে আর ব্রহ্মচর্য্যের যথাসাধ্য অনুশীলনে। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা এই কথাটিই উঁদের

বংশধরদের মনে স্থায়ী ভাবে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেবার জন্য যত্নবান ছিলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ হস্তেই পত্র লিখিতে মনোনিবেশ করিলেন।

অন্তরের অশুদ্ধতা ও উপাসনা

কুমিল্লা জেলান্তর্গত শিবনীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের যে উপাসনায় অরুচি লক্ষ্য করিতেছি, তাহা তোমাদের অন্তরের অশুদ্ধতার পরিচায়ক জানিও। যাহার অন্তর যত শুদ্ধ, সে উপাসনায় তত অধিক রুচি, অধিক আগ্রহ, অধিক আনন্দ অনুভব করিবে। তোমরা অন্তরকে প্রাণপণ যত্নে শুদ্ধ কর। তোমাদের চিন্তা, বাক্য এবং দৃষ্টিকে তোমরা শুদ্ধ কর। তবে ত' উপাসনা ভাল লাগিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি উপাসনাকে এই যুক্তিতে অনাবশ্যক বলিয়া পরিহার করিবে যে, 'অন্তর ত' তোমার অশুদ্ধই, তবে আর উপাসনা করিয়া কি লাভ হইবে? না, তাহা নহে। কেননা, অন্তর তোমার যত অপরিচ্ছন্নই হউক, উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহা নির্ম্মল এবং স্বচ্ছ হইবে। অরুচি যতই থাকুক, তোমরা জোর করিয়া উপাসনায় বসিও। বালকের ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে একথা সত্য কিন্তু বিকারগ্রস্ত রোগী যখন নিজে ঔষধ খায় না, তখন তাহার আত্মীয়-বর্গ তাহাকে

জোর করিয়া ঔষধ খাওয়ায়, জোর করিয়া তাহার মাথায় বরফের থলি চাপিয়া ধরে।"

সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও নামের শক্তি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত ভবানীপুর-নিবাসিনী অপর এক পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসারের ঝঞ্ঝাটকে মা গ্রাহ্যই করিও না। যতকাল সংসার আছে, ঝঞ্ঝাটও ততকাল থাকিবে। আর, যতকাল তোমার দেহটা আছে, ততকাল সংসারও থাকিবে। তথাকথিত আত্মীয়-পরিজনদের দূরে সরাইয়া দিলেও দেখিবে, তোমার হাত, পা, চখ, মুখ, নাক, কাণ, বক্ষ, উদর, প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিই তোমার কি প্রকার ভজনবাধা, সাধন-শত্রু ও ধ্যানবিঘ্ন। ঝঞ্ঝাট এড়াইবে কি করিয়া? সর্ব্বপ্রকার অধীরতা ও অসহিষ্ণুতা সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্দত্ত এবং নিজ কর্ম্মসৃষ্ট অসুবিধাগুলিকে নতশিরে মানিয়া লইয়া অবিরাম, অবিশ্রাম, নিরন্তর ও অনুক্ষণ ভগবানের মঙ্গলময় নাম করিয়া যাও। নামের মহিমা অফুরন্ত, নামের প্রতাপ অতুলনীয়, নামের শৌর্য্য অকল্পনীয়। নাম করিতে করিতে দেখিবে, তোমার নিজের তরফ হইতে কোনও পৃথক্ চেষ্টা ব্যতীতই জগতের সকল অশান্তি ও অসুবিধা আপনা হইতেই

পলাইবার পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আগন্তুক বা আশু অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য মনকে ইষ্ট হইতে তুলিয়া না নিয়া বরং অধিকতর প্রযত্নে মনকে নামে নয়রত কর। দেখিবে, তুমি যাহাকে প্রলয়-ঝঞ্ঝা বহাইয়াও চুলমাত্র স্থানচ্যুত করিতে পার না, একটা সামান্য ফুৎকারে সে কখন কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। নামের এই মহীয়সী শক্তিতে বিশ্বাস কর মা। একদা এই ভারতে ভগবানের পরমপবিত্র নামের শক্তিতে নির্ভর করিয়া জাতিগঠনপরায়ণ যোগীরা অসত্য দমনের যোদ্ধারূপে অবতীর্ণ হইবে। আমি সুস্পষ্ট সেই শুভ দিনের আনন্দপ্রদ দৃশ্যাবলি সহর্ষ নেত্রে দর্শন করিতেছি। আজ তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতি প্রতীকারে নামকে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিয়া সেই পরবর্তী কর্ম্মি-কেশরী-সমূহের আবির্ভাব-সম্ভাবনাকে দ্রুততর কর মা।"

ইন্দ্রিয়-মধ্যে ভগবদ্-ধ্যান

কুমিল্লা জেলান্তর্গত সরিফপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় অধীর হইয়াছ। ইহা কোনও নূতন সংবাদ নহে। ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্ম্মিত হইলেও তাহারা যখনই সুযোগ পায়, তখনই উদ্দাম এবং অনাচারী হইবার জন্য প্রলুব্ধ হয়। এই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রলুব্ধতা তাহাদের স্বভাব-রূপে অন্তর্নিহিত। তাই তাহাদের চাঞ্চল্য দেখিয়া অধীর বা বিহ্বল হইবে না। বরং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুক্ষণ তোমার প্রাণারাধ্যকে ধ্যান কর। তোমার সকল উত্তেজনা এভাবে থামিবে। ইন্দ্রিয়চক্রের তিনিই যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই কথা বিশ্বাস কর এবং সেইমত ধ্যান চালাও। চক্ষুর চঞ্চলতা, রসনার চঞ্চলতা, উপস্থের চঞ্চলতা সবই এভাবে থামিবে। উপস্থ অশ্লীল হেয় অঙ্গ বলিয়া তাহাতে ইষ্টধ্যান চলিবে না, এইরূপ কুসংস্কার রাখিও না, উপস্থকে শয়তানের অধীন না করিয়া পরম-প্রেমবিগ্রহস্বরূপ শ্রীভগবানের অধীন করিয়া লও। উপস্থ তাহার প্রত্যেকটী কর্ত্তব্য ভগবানের দাস-রূপে প্রতিপালন করুক। ধ্যানবলে ভগবানের মোহন-মূর্ত্তিকে তাহার মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে ভগবদিচ্ছার অনুগত দাস-রূপে প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া জগতের কুশল বর্দ্ধিত কর, নিজেকে নিষ্কলুষ রাখ। এই অপূর্ব্ব কৌশল ভারতের যোগীরা ছাড়া আর কেহ জানিত না। ভারতীয় যোগীরা ইন্দ্রিয়-নিচয়কে ইন্দ্রিয়ের অতীত জগতে ঠেলিয়া তুলিয়া নিয়াছেন, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা-রূপে ভগবানকে স্বীকার করিয়া, সর্ব্বেন্দ্রিয়-চেষ্টাকে ভগবানের আনুগত্যে আনিয়া। তুমি তোমার সব-কিছু ভগবানের তুষ্ট্যর্থে সমর্পণের শুভ সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হও, ভিতরের পশুকে দেবতায় পরিণত কর।"

গুরুদ্রোহী গুরুভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য

কুমিল্লা গাড়ের-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুদ্রোহী গুরু-ভ্রাতাদের সঙ্গ করা উচিত নহে। ইহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করাও অন্যায়। যাহাদের সংস্পর্শ গুরুতে বিশ্বাস বাড়ায়, ইষ্টনিষ্ঠাকে নিবিড় করে, অহংবুদ্ধির ঔদ্ধত্য কমাইয়া চিত্তকে সেবাপরায়ণ ও বিনম্র করে, মাত্র তাহাদিগকেই গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনী বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। গুরুদেবের কাছ হইতে কোনও কালে কেহ দীক্ষা নামক সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই তাহাদের কার্য্যে বা বাক্যে গুরুদ্রোহ, গুরুদ্বেষ, গুরুতে অনাস্থা, গুরুর অবমাননা বা মর্য্যাদালঙ্ঘন দর্শন করিবার পরেও তাহাদিগকে গুরুভ্রাতার মর্য্যাদা দিতে হইবে, তাহা নহে। তাহাদের সহিত অনর্থক যুদ্ধ করিয়া তুমি তোমার শক্তিক্ষয় করিও না। কিন্তু সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের সঙ্গ, সংশ্রব এবং ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন কর। নতুবা ধীরে ধীরে তাহাদের অন্তরের দোষ, ত্রুটী, পঙ্কিলতা, অবিশ্বাস, অনাস্থা এবং অনার্য্যোচিত চপলতা তোমাকে অদূর কালের মধ্যেই আক্রমণ করিবে।

"তোমরা কি জান যে, বড় বড় মহাপুরুষগণের শিষ্য বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিলে লোকের নিকটে যে

মর্য্যাদাটুকু পাওয়া যায়, তাহার লোভে জগতে অনেক ব্যক্তি উক্ত মহাপুরুষদের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিয়াও নিজেকে শিষ্য বলিয়া জাহির করিয়া থাকে? এমন দৃষ্টান্তও আছে যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই অভিনয় চালাইয়া যখন প্রকৃত ব্যাপার ধরা পড়িবার আশঙ্কা ঘটে, তখন এই সকল শিষ্য নামধারীরা নামে মাত্র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং দীক্ষার পরে গুরুদেবের পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া অনুনয় করে যেন, সে বা তাহারা যে অদ্যই মাত্র দীক্ষা নিল, এই কথাটি সতীর্থবর্গের মধ্যে প্রচারিত না হয়। অহেতুক কৃপাসিন্ধু উদারচেতা গুরুদেব মনে করেন, যার যেটুকু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া কোনও লাভ নাই এবং এই বিষয়ে শিষ্যের অনুরোধ রক্ষা করেন। কিন্তু এই সকল কপটী শিষ্যেরা পরবর্ত্তীকালে নিজেদের প্রতিপত্তি-হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা মাত্র গুরুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া সুকৌশলে সঙ্গোপনে দিনের পর দিন ধরিয়া কেবলই অপপ্রচার করিয়া বেড়াইতে থাকে। সেই অপপ্রচারের তরঙ্গাভিঘাত সকলের অজ্ঞাতসারে সমগ্র শিষ্য-মণ্ডলীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং কতকগুলি অগঠিত-চেতা আত্মপরায়ণ উদ্ধত ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রথমে ইহার প্রভাবাধীন হয়। সরলচেতা ব্যক্তিরাও আস্তে আস্তে কুটিল হইতে থাকে, অকপট বিশ্বাসীর মনেও সন্দিগ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং যেই গুরু নিজের সুখের পানে, নিজের বিশ্রামের পানে, নিজের হিতের পানে, একদিনের জন্য একটী

মুহূর্তের জন্য তাকাইতেন না, তাঁহার প্রত্যেকটী অনিন্দনীয় স্বাভাবিক কার্য্যের মধ্যেই সহস্র নিন্দা ও অস্বাভাবিকতা আরোপ করিয়া সমগ্র জগতের শান্তিভঙ্গ করে, নিজেদের সর্ব্বনাশ করে, গুরুদেবের সমুদ্রতুল্য প্রশান্ত মনে ক্ষোভ এবং বেদনার সঞ্চার করে।

"তথাপি প্রকৃত গুরুরা ইহাকে গ্রাহ্যে আনেন না। মনের ব্যথা যতটা সম্ভব মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিয়া ক্ষেত্রান্তরে জীবসেবার জন্য তাঁহারা অন্য দিকে আগাইয়া যান। জীবসেবার জন্যই যাঁহারা জন্মিয়াছেন, জীবসেবার জন্যই যাঁহারা তনুমন সমর্পণ করিয়াছেন, ইহপরত্র জীবনে জীবসেবাই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র ব্রত, তাঁহারা শত ব্যথার কারণ সত্ত্বেও জীবের প্রতি সেবা-হস্তকে কোনও অবস্থাতেই সঙ্কুচিত করেন না। তবে, সেহেতু বিনিময়ে যাহারা করিয়াছে লগুড়াঘাত, প্রেমের বিনিময়ে যাহারা করিয়াছে পৃষ্ঠদেশে ছুরিকা-বেধ, ভালবাসার বিনিময়ে যাঁহারা দিয়াছে অকৃতজ্ঞতা ও কৃতঘ্নতা, শিষ্যদের সহস্র ত্রুটির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া লোক-সমাজে তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিবার বিনিময়ে যাহারা করিয়াছে অবিরাম শুধু অপপ্রচার, তাহাদের কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া এই সকল জীবহিতৈষী মহাত্মা অন্যতর কর্ম্মক্ষেত্রে নূতনতর পরিবেষ্টনে বৃহত্তর জনসেবার আয়োজন, উদ্বোধন এবং সম্প্রসারণ করেন। তাঁহারা বসিয়া থাকিবার জন্য আসেন নাই, বসিয়া থাকিবেনও না।

"জগতের সকল মহদ্ব্যক্তিকে এই দুর্দ্দৈবের সাক্ষাৎ পাইতে হইয়াছে। বৃহৎ কর্ম্মে ব্রতী ইঞ্জিনীয়ার যেমন দুর্ব্বল যন্ত্রপাতি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে যাইয়া হঠাৎ নাকাল হইয়া যান, কাজ সম্পূর্ণ হইবার আগেই দুই চারিটা যন্ত্র ভাঙ্গিয়া বা বিকল হইয়া চেষ্টায় নিদারুণ বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চয়তা আনিয়া দেয়, এই ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। জগতের কয়জন মহৎ ব্যক্তি নিজের উপযুক্ত সহকর্মী পাইয়াছিলেন? বিশাল বট গাছের নীচে কতকগুলি এবাইচ আর অপামার্গই সর্ব্বত্র জন্মিয়াছে, বটের তলে আম, কাঁঠাল, দেবদারু কদাচিৎই দেখা গিয়াছে। আর জগতের প্রায় সকল মহৎ ব্যক্তিকেই অন্তরঙ্গদেরই বিরুদ্ধতায় বিপত্তির সাগরে ভাসিতে হইয়াছে। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া মারিবার পথে সাহায্য কি তাঁহার দ্বাদশ জন অন্তরঙ্গ শিষ্যেরই একজনে করে নাই? বুদ্ধকে ভণ্ড তপস্বী বলিয়া গালি কি তাঁহারই প্রথম পাঁচ জন শিষ্য দেয় নাই? সহাধ্যক্ষেরা যদি সেনাপতির আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিত, তাহা হইলে জগতের অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রেই রণজয়ের ইতিহাস বর্ত্তমান ইতিহাসের বিপরীত ভাবে লিখিত হইত।

"তুমি তোমার আপন হিসাব ঠিক রাখিও, নিজের জমা-খরচের দিকে তীব্র লক্ষ্য দিও। যাহারা গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনী বলিয়া তোমার নিকটে নিজেদিগকে পরিচিত করিতেছে,

তাহারা গুরুনিষ্ঠায়, গুরুভক্তিতে, গুরুবাক্য-পালনের দৃঢ় সঙ্কল্পে, গুরুদেবের জগন্মঙ্গল অভিপ্রায় পূরণের জন্য স্বার্থত্যাগে ও আত্মত্যাগে প্রতিক্ষণ কায়মনোবাক্যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া তোমার নিষ্ঠা, সঙ্কল্প এবং ত্যাগকে প্রবর্দ্ধিত করিতেছে ত'? যদি করে, তবেই তাহারা গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনী। নতুবা তাহারা তোমার পক্ষে রাস্তার অপরিচিত লোক মাত্র। ইহার অধিক সম্মান বা মর্য্যাদা তাহাদিগকে দিতে পার না।

"গুরুভ্রাতা বা সমনীতিক ব্যক্তিদের ঐক্য দ্বারা জগতে অনেক কুশল হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে এই ঐক্যের মূল হইবে গুরুতে অবিচল নিষ্ঠা, গুরুবাক্য পালনের, গুরুর অভিপ্রায় পূরণের অকুণ্ঠ আগ্রহ। এই মূলকে কাটিয়া যেখানে আগায় জল দিবার চেষ্টা হয়, সেখানে দুদিন যাইতে না যাইতে আত্মপ্রাধান্য লইয়া নিদারুণ কলহের সৃষ্টি হয়। সেই স্থানে কর্ত্তৃত্বের অধিকার সেই সবলে কাড়িয়া নেয়, যাহার কণ্ঠ বেপরোয়া, যাহার আচরণ অমানদ, যাহার ঔদ্ধত্য আকাশস্পর্শী, যাহার বিজ্ঞম্মন্যতা সকলের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী এবং অসদুপায়ে বিপুল বিত্ত অর্জ্জন করিয়া তৎপরে যে নিজেকে সাধু এবং মহৎ বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। এই সকল সঙ্ঘে প্রকৃত সেবাবুদ্ধি-সম্পন্ন সাত্ত্বিক-চরিত্র লোকের স্থান নাই। তোমরা এইরূপ সঙ্ঘ গঠনের জন্য কখনও প্রলুব্ধ হইও না। গুরুদ্রোহীরা জগতের সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য এবং চূড়ান্ত অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি। ইহা জানিয়া গুরুদ্রোহীদের

সংস্পর্শ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া চলিবে, ইহাদের প্রস্তাবিত সঙ্ঘে যোগদান ত' দূরেরই কথা। ইহারা যখন সঙ্ঘ গড়ে, তখন বাহ্যত মুখের বুলি যাহার যাহাই থাকুক, এক এক জন পাণ্ডা এক একটা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া চলে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরের প্রকৃত অভিপ্রায় সঙ্গোপনে অপরের নিকটে গোপন রাখিয়া বাহিরে একটা ঐক্যের মায়াজাল সৃষ্টি করে। কেহ চাহে নবগঠিত সঙ্ঘের উপরে নেতৃত্ব করিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনের তৃষ্ণা মিটাইতে, কেহ চাহে ফাঁকতালে কিছু ধন লুটিতে, কেহ চাহে অন্তরের প্রসুপ্ত প্রতিহিংসার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে, কেহ চাহে নৈবেদ্যের উপরে মণ্ডার মত নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিয়া কৃত্রিম গম্ভীরতার আচরণে নিজ বুদ্ধির দৈন্য ও নিজ কর্ম্মশক্তির অভাবকে ঢাকিয়া রাখিয়া লোক-সম্মান কুড়াইতে। যেখানে গুরুর প্রতি নিষ্ঠা নাই, সেইখানে গুরুভ্রাতাদের সঙ্ঘ এই অবশ্যম্ভাবী প্রকৃতিকে ও পরিণতিকে অনুসরণ করে। সুতরাং, তোমার ন্যায় প্রকৃত কুশলকামী ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ গুরু-ভ্রাতাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করা উচিত নহে।

"কথা যদি বলিতে যাও, দেখিবে, ইহারা মস্ত মস্ত আদর্শের দোহাই দিবে। কথার ফুলঝুরি দিয়া ইহারা তোমাকে বোকা বানাইয়া দিতে চাহিবে। যুক্তির মায়াজালে ইহারা তোমাকে যাদুমুগ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে। কিন্তু যাহারা গুরু

হইলে গুরুদেবের অকুণ্ঠিত শুশ্রূষা নিয়াছে, যাহারা দৈন্য-পীড়িত হইলে গুরুদেবের অর্থে পেটের অন্ন জুটাইয়াছে, যাহারা অকর্মণ্যতা সত্ত্বেও গুরুদেবের অনুগ্রহে কর্মীর সমাজে ঠাঁই পাইয়াছে, যাহারা অত্যন্ত কলুষিত পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে জন্ম পাইয়াও ক্ষমাময় গুরুদেবের অপার কৃপায় দেবতার বন্দনীয় হইয়াছে, যাহারা হীনকার্যে জীবিকার্জনকারী, নীচ ও অনাচরণীয় ব্যক্তি গৃহে জন্মিয়াও গুরুদেবের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণবৎ পূজা পাইয়াছে, এবং গুরুদেবেরই অনুগ্রহে লোকে যাহাদের জাতি, জন্ম, জীবিকা ভুলিয়া গিয়াছে, সেই সকল লোক যখন গুরুদ্রোহী হয়, তখন জানিতে হইবে যে, এই অকৃতজ্ঞ পশুদের সহিত বাক্যালাপের দ্বারা যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা ধৌত করিতে শতবর্ষ গঙ্গাস্নান আবশ্যক। সুতরাং ইহাদের সংস্পর্শ বর্জন করিও। প্রকৃতই ইহারা আদর্শবাদী নহে, ইহারা সুবিধাবাদী। কুস্তির প্যাঁচে গুরুদেবকে চিৎ করিয়া ফেলা গেল না, ইহা যখন দেখিবে, তখন ইহাদের মধ্যেই বড় বড় পাণ্ডারা আবার গুরুদেবের চরণ-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইবে, গুরুদ্রোহের গুপ্ত ষড়যন্ত্রগুলিকে সযত্নে গোপন রাখিয়া নূতন করিয়া গুরুসেবার অভিনয় সুরু করিবে, নিজে যাহা করিয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে দেখিলে প্রাণপণ যত্নে সেই দোষের বোঝা অপরের স্কন্ধে ফেলিয়া দিয়া নিজে নিরীহ সাজিবে, বাহিরে গুরুদেবের অনুগত ভৃত্য সাজিয়া গোপনে গুরুদ্রোহী

অপরাপর সঙ্গীদের সহিত অন্তরের গভীর হৃদ্যতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে, গুরুগতপ্রাণ কোনও গুরুভ্রাতা দূর দেশ হইতে অভুক্ত অবস্থায় আসিয়া তাহার গৃহে পৌঁছিলে পরম বিনয় সহকারে নিকটবর্তী হোটেল দেখাইয়া দিবে এবং একই সময়ে, গুরুদ্রোহী-সঙ্ঘের কোনও সদস্য ক্ষুধার্ত না থাকিলেও তাহার জন্য দূরবর্তী প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার হইতে প্রচুর মিষ্টান্ন আনিয়া পরিবেশন করিবে এবং দিনের পর দিন কেবলই প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে যে, কুস্তির পরবর্তী প্যাঁচটা হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে কোন্ সময়ে গুরুদেবের উপরে সে নিজে কষিবে, কিম্বা অপরকে দিয়া কষাইবে। জানিও, ইহারা কালসর্প। তুমি যখন নিজের কুশল চাহ, তখন ইহাদের সংসর্গও তোমার বর্জন করিয়া চলা উচিত।

"দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব? শুনিয়াছ, গুরুদেব বড়ই পীড়িত, তোমরা কয়েকজনে উদ্যোগী হইয়া চিকিৎসক ও অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা করিলে। হঠাৎ একজন গুরুভাই আসিয়া দাবী করিল,—'জানেন? আমি আপনাদের দশ বৎসর আগে দীক্ষা নিয়াছি। আমি বারংবার গুরুদেবকে বলিতে শুনিয়াছি,—'ওরে, আমার জন্য তোরা কিছু করিতে চেষ্টা করিস্ না, আমারটা আমিই করিব, তোরা কেবল সাধন কর, অন্য কর্তব্য তোদের কিছুই নাই', কথার দাপটে তোমরা থামিয়া গেলে, প্রত্যক্ষ গুরুসেবার সুযোগ গ্রহণে বিরত হইলে। বল, তোমরা একজন গুরুদ্রোহীরই কথায় কর্ণপাত করিয়াছিলে

কিনা? গুরুদেব একটা প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন, অর্থের ত' নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তোমরা দশ জনে কিছু অর্থের সংস্থানে আগ্রহী হইলে। হঠাৎ একজন বক্তৃত্বশক্তিসম্পন্ন ধনী গুরুভ্রাতা আসিয়া ধমক দিয়া তোমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিল। বলিল,—'আপনারা গুরুদেবের কথা কি আর জানেন? তিনি বলিয়াছেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তিনি নিজেই নিজের প্রতিষ্ঠান গড়িবেন। আমরা অমুক স্থানে তিনটা মঠ গড়িয়া গুরুদেবের কীর্ত্তি রাখিয়াছি, একটী কপর্দ্দকও গুরুদেবকে পাঠাইতে চাহি নাই। গুরুদেব ইহাতে মোটেই রুষ্ট হন নাই, তিনি সন্তোষেই প্রকাশ করিয়াছেন। গুরুর অভিপ্রায় বুঝিয়া কাজ করিতে হয়। টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।' বল, এই ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন গুরুদ্রোহী বা শত্রুর গুপ্তচর কিনা।

"বিশ্বাস এবং নির্ভর হইতে অভয় আসে। জীবনের নির্ম্মম সংগ্রামে এই অভয় তোমার পরম সঙ্গী। গুরুতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা এই অভয়কে স্থির এবং স্থায়ী করে। যাহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংশ্রবে তোমার এই বস্তু হইতে চ্যুতি সুনিশ্চিত আসিবে, তাহাদিগকে ভ্রাতা, ভগিনী বা বন্ধু বলিয়া তুমি কোন্ সাহসে গণনা করিবে? পাত্রপূর্ণ হলাহল পান করা আর ইহাদের সংশ্রবে যাওয়া এক কথা। বৃশ্চিক-পরিবৃত বিবরে প্রবেশ করা আর ইহাদের সঙ্গ করা এক কথা। ক্রুদ্ধ গুখরা সাপকে কণ্ঠে জড়ান আর ইহাদিগকে বন্ধু, আত্মীয় বা পরিচিত বলিয়া স্বীকার করা এক কথা।

"তাই বলিয়া কি ইহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে? তাহাও নহে। যে যাহাকে বিদ্বেষ করে, সে বিপরীত-ক্রমে তাহার ধ্যান করে। ধ্যানের ফল হইতেছে ধ্যাত ব্যক্তির স্বভাব-প্রাপ্তি। সুতরাং ইহাদিগকে বিদ্বেষ করিয়া নিজের ক্ষতি করিও না। ইহাদের প্রতি একেবারে উদাসীন হও। ইহারা যে জগতে আছে কিম্বা ছিল, এই কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাও। ভুলিয়া যাও, ইহাদের কাহারও সহিত একদা দেখা হইয়াছিল, চেনা-পরিচয় হইয়াছিল, কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, হৃদ্যতা ও অন্তরঙ্গতা ঘটিয়াছিল। যাঁহাকে লইয়া সেই দেখা, পরিচয়, কথাবার্ত্তা হৃদ্যতা ও অন্তরঙ্গতা, তাহারা যখন তাঁহাকেই মানিতে কুণ্ঠিত, তখন এই দেখা ত' অদেখা, এই পরিচয় ত' অপরিচয়। প্রাণপণ' যত্নে ইহাদিগকে ভুলিয়া যাও। অন্তরের নিষ্ঠা, ভক্তি, একাগ্রতা, সৎসঙ্কল্প এবং প্রসাদ গুণ-বর্দ্ধনের জন্য যাঁহাদের সঙ্গ করা তোমার একান্ত আবশ্যক, তাঁহাদিগকে নব-পরিচিত গুরুগতপ্রাণ সাধকগণের মধ্যে খোঁজ। তোমার এই অন্বেষণ কখনও ব্যর্থ হইবে না। প্রতীক্ষার শক্তিতে তুমি কিছুদিন-মধ্যে প্রাণসম প্রিয়, জীবনের উন্নতিবর্দ্ধক, আধ্যাত্মিক সাধনের উত্তর-সাধক ভ্রাতা-ভগিনীদের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে।"

কাজে হাত রাখ

কুমিল্লা জেলান্তর্গত পাইকপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজ লইয়া থাক। বিনা কাজে কেহই কালকর্ত্তন করিও না। বৃথা বসিয়া দিন-গুজরাণের মত পাপ নাই। ইহা শুধুই পাপ নহে, সকল পাপের ইহা জনক। উচ্চ বা নীচ বিচার না করিয়া অবিলম্বে প্রত্যেকে এক একটা কাজে হাত রাখ। এমন কাজ কর, যাহাতে নিজের জীবিকার সাথে সাথে অপরের জীবিকারও প্রত্যক্ষ বা গৌণ সহায়তা হয়। এমন কাজ কর, যাহাতে মনোবৃত্তি নিম্নগামিনী না হয়।

কাজ ছাড়িবার সময়

"কিন্তু জাতির জীবনে এমন সময় আসে, যখন প্রত্যেককে নিজ নিজ ব্যক্তিগত সহস্র জরুরী কাজ ও কর্ত্তব্য ছাড়িয়া দিয়া সকলের পক্ষে সাধারণ কোনও মহত্তর কাজে যোগ দিতে হয়। যখন জাতির দীর্ঘকালব্যাপী গ্লানি ও পরাধীনতা বিদূরণের কোনও অপ্রত্যাশিত সুযোগ সহসা উপস্থিত হয়, তখন সেই সুযোগকে পরিপূর্ণ রূপে গ্রহণ করিবার জন্য এইরূপ করিতে হয়। যখন জাতির উপরে কোনও অকল্পিত আকস্মিক অত্যাচার বা উৎপীড়ন এমন ভাবে আসিয়া পড়ে যে, তাহার প্রতীকার অবিলম্বে না করিলে জাতির সমূল ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তখন এইরূপ করিতে হয়। ভূকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি উৎপাত যখন অত্যন্ত ব্যাপক

আকারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়। বিদেশী জাতি যখন দেশ আক্রমণ করে অথবা স্বদেশীদের মধ্যেই যখন এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর প্রতি মারাত্মক মনোভাব লইয়া ব্যাপক ভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি এবং অন্যান্য জঘন্য অত্যাচারে উদ্যত হয়, তখন এইরূপ করিবার প্রয়োজন হয়।

চাকুরীয়ার মনোবৃত্তি

"জগতের সকলেই ব্যবসা করিবে না, করিতে পারিবেও না। অধিকাংশকেই কাহারও না কাহারও অধীনে চাকুরী করিতে হইবে। চাকুরী করা বড়ই অবমাননাজনক। দাসত্বের মত দুর্ভাগ্য আর কিছু নাই। কিন্তু চাকুরীর একটা মোহ আছে। একবার চাকুরীতে ঢুকিলে মাস-কাবারের মাহিনাটার প্রতি একটা অস্বাভাবিক নির্ভর ও আসক্তি আসিয়া যায়। শত প্রয়োজনের সময়েও এই নির্ভরটুকু ছাড়িয়া মেরুদণ্ড সরল করিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইতে চাহে না। সমাজ বা দেশের গুরুতর দাবী সম্মুখে আসিয়া চাকুরী-ত্যাগের আদেশ করিলেও ইহার আসক্তি বর্জ্জন করা তখন অতীব কঠিন বলিয়া মনে হয়। তাই, যদি চাকুরী কর, তাহা হইলে মনের এইরূপ সবলতা নিয়া চাকুরীতে থাকিতে হইবে যেন দেশ ও জাতির গুরুতর প্রয়োজনের দিনে প্রসন্ন মুখে নির্ভীক মনে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া অনিশ্চিতের পথে নামিতে পার। চাকুরী

করিবার কালে মনিবের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য তুমি ষোল আনা পালন করিয়া নিজের ধর্ম্মের ইজ্জৎ রক্ষা করিও কিন্তু দেশ এবং জাতির গুরুতর প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে যাঁর চাকুরী তাঁকে বুঝাইয়া দিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে সরিয়া পড়িবার সাহস, আত্মপ্রকৃতি ও জাগৃতি নিজের ভিতরে সর্ব্বদা উদ্যত রাখিও।

ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি

"যাহারা ব্যবসায় করে, তাহাদের আবার ব্যবসায়ের প্রতি এইরূপ একটা মত্ততা আসিয়া যায়। লাভের নেশা ইহাদিগকে পাইয়া বসে এবং ক্ষতি হইলেও ইহারা নিজেদের বৃত্তির পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হয় না। ইহা যেন কতকটা ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাজি রাখিবার নেশার মত। শতবার ঠকিয়াও পুনরায় বাজি না ধরিয়া পারা যায় না। ব্যবসায়ীর ভিতরে প্রথমে থাকে মাত্র নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে প্রতিপালনের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু ক্রমশঃ সেই আকাঙ্ক্ষা অবিরাম ধন-সঞ্চয়ের অত্যাসক্তিতে পরিণত হয়। তখন চক্ষে আর পরদা থাকে না, নির্লজ্জ বেহায়ার মত অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও কেবলই ধনাহরণের চেষ্টা চলিতে থাকে। এ ধন হয়ত নিজের কোনও কাজেই আসিবে না, তবু সে বেপরোয়া হইয়া, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদগুলিকে পর্য্যন্ত কাটিয়া ছাঁটিয়া খাটো করিয়া, যক্ষের মত কেবলই ধন-সঞ্চয়ে মনোযোগী হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান, পাপ-পুণ্যের বিচার,

সত্যাসত্যের বিবেচনা সব শ্মশান-চুল্লীতে জ্বলিতে থাকে, অনির্ব্বাণ অক্ষয় হইয়া তার অন্তরে বিরাজ করে একমাত্র ধনাহরণের প্রবৃত্তি। তুমি নিজেকে কতই উদ্দীপনা-সম্পন্ন সজাগ ব্যক্তি বলিয়া মনে কর, কিছুকাল যে-কোনও ব্যবসায় করিলেই এবং সেই ব্যবসায়ে বেশ একটু সাফল্যের সূচনা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, তোমার বংশ-দুলাল একমাত্র শিশু পুত্র, যাহার নিকটে পিণ্ডোদকের প্রত্যাশা কর, যে ভবিষ্যতে তোমার বংশের মান রাখিবে, তাহার দুধের বাটি হইতে দুধের পরিমাণ কমাইয়া তোমাকে ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে প্ররোচিত হইতে হইতেছে। সঞ্চয়-লালসা-নাম্নী রাক্ষসী নিজে পূতনা-রাক্ষসীর রূপ ধরিয়া তোমার শিশু পুত্রকে হত্যা করিতে অক্ষমা হইয়া তোমার কাণে সঞ্চয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া করিয়া তোমার দ্বারা তোমার পুত্র সম্বন্ধে পূতনা-রাক্ষসীর কাজ করাইয়া লইতেছে।

আত্মোৎসর্গের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক

"এইরূপ নানাবিধ মনোবৃত্তি চাকুরী এবং ব্যবসায়কে অবলম্বন করিয়া তোমাকে ঘিরিতে চাহিবে। কিন্তু তোমাকে এমন ভাবে অবিরাম অবিশ্রাম আত্মগঠনে দৃষ্টিশীল থাকিতে হইবে যেন তুমি দেশ, জাতি ও জগতের অতীব গুরুতর প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে এই সকল অলক্ষ্য অকল্যাণের নাগপাশ

স্থির করিয়া সিংহ-বিক্রমে বাহির হইয়া পড়িতে পার। এইরূপ মহত্তম প্রয়োজন একটা মানুষের জীবনে দুই, দশ বা বিশবার আসে না, একবারই আসে। অনেক সময়ে তিন পুরুষের ভিতরেও হয়ত একটীবার আসে না। এমন গুরু-প্রয়োজনের মুহূর্তে যে ব্যক্তি প্রয়োজনটীকে চিনিতে পারে না, সে অতীব দুর্ভাগা ব্যক্তি এবং তোমরা সঙ্কল্প কর যে, এইরূপ, গুরু-প্রয়োজন সত্যই যদি তোমাদের জীবৎ-কালে কখনও আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে নিজেদের বয়স, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, অসুবিধা বা ক্লেশের কথা ভুলিয়া সেই মহাপ্রয়োজনের নরমেধযজ্ঞে হবিঃ রূপে আত্মবিসর্জ্জন দিতে কোনওক্রমেই কুণ্ঠিত হইবে না। সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, কেননা কেহই বলিতে পারে না যে, সেই মহাপ্রয়োজন কি এক শতাব্দী পরে আত্মপ্রকাশ করিবে, না আজই এক মুহূর্ত্ত পরে আসিবে।"

জাতিভেদের অভিসম্পাত

ঢাকা জেলান্তর্গত মুরাপাড়া-নিবাসী অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জাতিভেদ-প্রথা এবং এই প্রথাজনিত সংস্কার-সমূহকে নিয়ত পরিপোষণ, পরিতোষণ ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা তোমরা নিজেদের মধ্যে যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আনিয়াছ, তাহার রাষ্ট্রনৈতিক কুফল যে বড় তুচ্ছ হইবে, ইহা তোমরা মনে করিও না। আমি জোর করিয়া জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিবার

উপদেশ তোমাদের কখনই প্রদান করি নাই। কিন্তু ইহাও সুস্পষ্ট বুঝিতেছি যে, জাতিভেদের বিচ্ছিন্নতা যদি তোমরা অবিলম্বে পরিত্যাগ না করিতে পার, তাহা হইলে একদা হয়ত তোমাদের পরম গর্ব্বের হিন্দু-সভ্যতা এক নিকৃষ্টতর সভ্যতার কাছে পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইবে। অতীতের সংস্কৃতি এবং শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা যদি তোমাদের কর্ত্তব্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিও, তোমাদের ভাবী বংশধরদের প্রতিও তোমাদের কর্ত্তব্য আছে। সেই সকল অনাগত বংশধারক পুত্রকন্যাদের উপরে তোমরা অনাগত এক অতীব মর্ম্মন্তুদ সঙ্কটের বোঝা চাপাইয়া যাইতে পার না। জাতিভেদের নাগপাশ একদা তাহাদের সমূল ধ্বংসের সহায়ক হইবে, ইহা আমি সুস্পষ্ট বুঝিতেছি। গুরুনানক এবং গুরুগোবিন্দ সিংহ একদা পাঞ্জাবে বসিয়া যাহা করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন, আজ আমি নিখিল ভারত জুড়িয়া তাহাই করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেছি। অনুমান নয়, কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছি। জাতিভেদকে জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়া আমরা তথাকথিত উচ্চবর্ণ-সমূহের অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগুলিকে পর করিয়া দিতে চাহি না। ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল। আবার জাতিভেদকে বর্ত্তমান অবস্থায় চলিতে দিয়া আর্য্য সভ্যতার সকল উত্তরাধিকারীকে ভবিষ্যতের বিপুল সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষ-সমূহের মধ্যে অকালনিহত হইতে দিতেও

সম্ভব হইতে পারিতেছি না। সভ্যতায় যে নিকৃষ্ট, ঐক্যবলে সেও জগতে প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সভ্যতায় তোমরা উৎকৃষ্ট থাকিয়াও ঐক্যের একটী মূলসূত্রের অভাবে ক্রমশঃ শূন্যে বিলীয়মান হইয়া যাইতেছ। তোমাদের এই সর্ব্বনাশা ক্ষয় তোমরা আজ চক্ষে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পরে দেখিতে পাইবে যে, তোমরা ভারতে এক অতি নগণ্য এবং হেলার যোগ্য জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছ। তখন যদি চতুর্দ্দিক হইতে একযোগে লক্ষ জল্লাদের লক্ষ খড়্গ তোমাদের শির লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হয়, তাহা হইলে হয় তোমাদিগকে বিনা যুদ্ধে সদলে বিবেক বিসর্জ্জন দিতে হইবে, নয়ত তোমাদিগকে স্বল্পকালেই নিঃশেষ হইতে হইবে। দুইটীই নিশ্চিহ্ন হইবার পন্থা, ইহাদের মধ্যে একটীও অপরটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। তোমরা নির্ম্মূল হইয়া যাইবার পরে তোমাদের বেদ, উপনিষদ, গীতার মহিমা অপরে আসিয়া প্রচার করিবে, ইহা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা। তোমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার পরে তোমাদের রামায়ণ, তোমাদের মহাভারত যাদুঘরের আলমারীতে যত্ন করিয়া রাখিবারও হয়ত লোক থাকিবে না। সেই মর্ম্মান্তিক ভবিষ্যৎ ছবিকে শতাব্দীর এই পার হইতে দর্শন করিয়াই আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। তোমাদের জাতিভেদের কুসংস্কার, তোমাদের জাতিভেদের গোঁড়ামি তোমাদের জীবন্তে সমাধির কারণ হইবে, তোমাদের জন্য সবংশে নির্ব্বংশে হইবার অভিসম্পাত

স্বরূপ হইবে। এই অভিসম্পাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় তোমরা এখনই বাহির কর। বিলম্ব করিলে চলিবে না। শাস্ত্র মানিতে দোষ নাই কিন্তু কালের পরিবর্ত্তন সহকারে শাস্ত্রার্থকে উপযুক্ত ভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার করিও না। কালের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিবার চেষ্টা অতীতে আমাদের শাস্ত্রকারেরাও বহুবার করিয়াছেন। ইহা প্রমাণিত সত্য, ধ্রুব সত্য।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা

"সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতা, এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী আসিয়া যে হঠাৎ একদিন তোমাদের জীবনযাত্রার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিবে এবং বক্ষে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বদেশে ছুরিকাঘাত করিবে, তাহা অনুমান করা আজ শক্ত ব্যাপার। ভবিষ্যৎকে গণিয়া বাছিয়া বাহির করিবার মতন data বা মূল উপকরণ আমাদের হাতে কিছুই নাই। ইংরাজি ১৯০৫ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জন-মনে যতগুলি ধারণার স্থান হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রেম স্থিতিশীল হইতে পারে নাই। যে স্বদেশ-প্রেম জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের উপজীব্য হইলে একদিনে দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইতে পারে, তাহার স্থানে কুৎসিত প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা এবং জঘন্য সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা চারিদিকে শিকড় মেলিয়া যাইতেছে। ভারতের এক প্রান্তে বাস করিয়াও কোটি কোটি মানুষ অপর

প্রান্তের মানুষকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতেছে, আবার এই ভারতেই জন্ম লভিয়া, এই ভারতেই পুষ্ট ও প্রতিপালিত হইয়া কোটি কোটি মানুষ মনে মনে ভারতীয় ঐক্যকে শত্রুতার দৃষ্টিতে দেখিতেছে। ইহার ফলে হঠাৎ একদিন যে-কোনও অঞ্চলে বা প্রদেশে অসাধারণ অশান্তির সৃষ্টি ঘটিতে পারে, যাহার ফল আত্মপ্রকাশ করিবে গৃহদাহ, লুণ্ঠন, নারী-নির্য্যাতন, শিশুহত্যা এবং খাদ্যে ও পানীয় জলে ব্যাপক ভাবে বিষমিশ্রণের কুচেষ্টা-রূপে। ইংরাজ এই দেশে আরও কয়েক শতাব্দী কাল দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়া যাইবার কল্পনা করিতেছে এবং এই সকল ভেদ-বিরোধের বীজাণু সঞ্চারিত করিয়া দেশবাসীর বলক্ষয় করিবার চেষ্টা পাইলে তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক হইবে না। কিন্তু দেশটা আমাদের। এদেশ ছাড়িবার প্রয়োজন হইলেও আমরা ছাড়িতে পারিব না। কেননা, আমরা ইরান-তুরাণ হইতে আসিয়াছি বলিয়া আমাদের স্মরণে পড়ে না। আমরা সপ্তসমুদ্রের ওপার হইতে আসিয়াছি বলিয়া আমাদের অধিকাংশেই বিশ্বাস করি না। এদেশ আমাদের পিতৃভূমি, মাতৃভূমি, জন্মভূমি। যাহারা এদেশের মাটিকে মা বলিয়া বন্দনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করে, তাহারা তাহা করুক কিন্তু আমরা আমাদের মায়ের অঙ্গে দুর্বৃত্তের করস্পর্শ ঘটিতে দিব না, এই সঙ্কল্প আমাদের প্রয়োজন। তাহা হইলেই মায়ের প্রতিটি সন্তানের প্রতি আমাদের মমত্ব-বোধেরও প্রয়োজন। এক মায়ের সন্তান বলিয়া যাহারা

নিজেদিগকে মনে করিবে, মানিবে, বিশ্বাস করিবে এবং ঘোষণা করিতে গৌরব বোধ করিবে, তাহাদের মধ্য হইতে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদবুদ্ধি যত দ্রুত অপসারিত হয় ততই মঙ্গল। ভেদাভেদবুদ্ধি দূর হইলে সাম্প্রদায়িকতা-দোষ বা প্রাদেশিকতার বিকার আপনা আপনি দূর হইয়া যাইবে। ইতিহাসের ঘটনাবলী তোমার আমার মর্জ্জি-মাফিক চলিবে না, যেখান দিয়া ঢালু পাইবে, জল সেখান দিয়াই গড়াইবে। জাতিভেদের গোঁড়ামি যেখানে যেখানে সর্ব্বজনীন সঙ্গত মিলনের বাধা হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেখানে সেখানে তোমাদের সাহস ও পৌরুষের প্রয়োগ একান্তই প্রয়োজনীয়।

সদাচার-ভিত্তিক অধ্যবসায় ও সমবেত উপাসনা

“অবশ্য, সংস্কার-কার্য্য ও সংহার-কার্য্য এক নহে। জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার নাম করিয়া তোমরা কদাচারী হইতে পার না। কদাচার কি? যে আচারে দৈহিক অবনতি ও নৈতিক অধোগতি ঘটে। সদাচার কি? যে আচারে দৈহিক উন্নতি ও নৈতিক অভ্যুদয় ঘটে। পরিচ্ছন্নতা, স্নানাবগাহন, শুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান, সুমেধ্য খাদ্যাদি গ্রহণ দৈহিক সদাচার। সত্যভাষণ, সত্যচিন্তন, সত্যপথানুবর্ত্তন, হিংসা-দ্বেষাদি বর্জ্জন, দানশীলতা, পরোপকার ও অনুদ্ধত জীবন যাপন নৈতিক সদাচার। জগতের অধিকাংশ সদাচারই

প্রায় সকল দেশে, প্রায় সকল কালে, প্রায় সকল সমাজে একরূপ বা কাছাকাছি। জগতের অধিকাংশ কদাচারই প্রায় সকল দেশে, প্রায় সকল কালে, প্রায় সকল সমাজে একরূপ বা কাছাকাছি। সুতরাং সাধারণ একটুখানি বুদ্ধি খাটাইলে কোন্ আচারটী গ্রহণীয় আর কোন্‌টী বা বর্জ্জনীয়, তাহা নির্ণয় করিতে কষ্ট হইবার কথা নহে। জাতিভেদ-প্রথাজনিত যে অনাত্মীয়তার বোধ সকলের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া পুঞ্জিত ও পরিপোষিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে দিনের পর দিন খর্ব্বিত করিয়া সকলের প্রতি সকলের সমান প্রেম ও সমান দরদ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজনে যতগুলি অধ্যবসায়ে তোমরা প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের হওয়া চাই সদাচারভিত্তিক। আমি মনে করি, আমাদের প্রবর্ত্তিত সমবেত উপাসনা তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"

গুরু-ভ্রাতার প্রতি গুরু-ভ্রাতার কর্ত্তব্য

কুমিল্লা জেলান্তর্গত রূপসদী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একদা লক্ষ লক্ষ মানব-মানবী তোমার গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী হইবে। তখন এই সকল গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর প্রতি তোমার কর্ত্তব্যও আসিয়া পড়িবে। একটী ব্যক্তিও যাহাতে বিপথে চলিয়া হোঁচট্ না খায়, একটী ব্যক্তিও যেন

নিজ চরিত্র দ্বারা তোমার ধর্ম্মসঙ্ঘের উপরে কলঙ্ক আরোপ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব তোমার উপরে আসিবে। একটী ব্যক্তিও যাহাতে অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে, শিক্ষাভাবে কষ্ট না পায়, এই দায়িত্ব তোমার সামগ্রিক ভাবে সমস্ত মানবজাতিরই সম্পর্কে কিন্তু একটী ব্যক্তিরও নৈতিক অধঃপতনের দ্বারা তোমার সঙ্ঘ কলুষিত, ক্লেদাক্ত ও দুর্নামগ্রস্ত না হয়, তাহা দেখা তোমার পৃথক্ আর একটী কর্ত্তব্য। জগতের প্রত্যেকটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি পুরুষ ও প্রতিটি নারী যদি এই ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়াধীন প্রত্যেককে নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত দেখিতে চাহে, তাহা হইলে জগতের মানচিত্র নূতন বর্ণাঢ্যতায় ও মহত্ত্বগরিমায় অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয় হইয়া উঠিবে। গুরু-ভ্রাতার প্রতি গুরু-ভ্রাতার কর্ত্তব্য প্রধানত নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। ব্যবহারিক স্বার্থের সহিত এই কর্ত্তব্যের সম্পর্ক যত গৌণ হয়, ততই ভাল কিন্তু তাহাদের আপদে বিপদে নিঃস্বার্থ ভাবে তোমাদিগকে ছুটিয়া যাইতে হইবে। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে জগতের প্রত্যেকটী মানুষের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য সমান কিন্তু তোমার গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের প্রত্যেককে এক একটী করিয়া জগৎ-কল্যাণ-কর্ম্মী রূপে গড়িয়া তোলা তোমার এক মহত্তর কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহাদের মধ্যে একটী মানুষও যাহাতে উদ্বাস্তু হইয়া গৃহহীন, পরিজনহীন, লক্ষ্যহীন জীবন যাপন করিতে

বাধা না হয়, সেই দায়িত্ব আসিবে। একটা বন্যা হইল আর দুর্ভিক্ষ হইল, একটা মহামারী হইল আর বৈদেশিক আক্রমণ ঘটিল, একটা সাম্প্রদায়িক উৎপাত ঘটিল আর শ্রেণী-বিশেষের উপরে অন্যতর শ্রেণীর অত্যাচার চলিল,—এই সকল আকস্মিক ব্যাপারে সাময়িক 'রিলিফ' কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকাই যথেষ্ট নহে। জানিতে হইবে, প্রত্যহই কোথাও না কোথাও একটা বন্যা হইতেছে, প্রত্যহই কোথাও না কোথাও বৈদেশিক আক্রমণ চলিতেছে, প্রত্যহই কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক অত্যাচার চলিতেছে। ইহা জানিয়া প্রত্যহই প্রয়োজনীয় দিকে নিজেদের সেবা-শক্তিকে 'রিলিফের' কাজে পাঠাইতে হইবে। গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের প্রতি তোমাদের এই দায়িত্ব রহিয়াছে। তিন বৎসর পর পর একটা অতি ভয়ঙ্কর ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া হঠাৎ ছয়মাস কাল সাময়িক একটা রিলিফ কাজ চালাইলাম আর তার পরক্ষণেই ঝিমাইতে বসিলাম, ইহা হইলে চলিবে না। দুই তিন বৎসর পর পর বা দশ বিশ বৎসর পর পর যে সকল অতি মর্ম্মচ্ছেদক ঘটনা ঘটিয়া এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোককে চমকিত করিয়া দেয়, একটু সজাগ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, প্রতিদিনই ছোট আকারে তাহা ঘটিয়া যাইতেছে এবং অনেক বৃহৎ ঘটনাই এই প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির সমষ্টিগত ফলমাত্র। সুতরাং তোমার প্রত্যেকটী গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর প্রতিদিনকার প্রতি বিপদেও

তোমাকে গিয়া পরমবান্ধবের ন্যায় দাঁড়াইতে হইবে। চিন্তা করিয়া দেখ, কি করিলে তুমি তাহা সুষ্ঠু-রূপে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্য দিয়া সম্পাদন করিতে পার।"

জীবনের উদ্দেশ্য

খুলনা জেলান্তর্গত সেনহাটী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভগবানকে জানা, ভগবানকে ভালবাসা, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে ভগবানের হস্তধৃত যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া ভগবদিচ্ছাকে জীবনের একমাত্র নিয়ন্ত্রিকা শক্তি বলিয়া উপলব্ধি করতঃ তাঁহারই সেবার জন্য তাঁরই প্রীতির জন্য কাজ করিয়া যাওয়া,—ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য।

দাম্পত্য প্রেম ও ঐশ্বরিক প্রেম

"মানবের দাম্পত্য জীবন গ্রহণও সেই উদ্দেশ্য সাধনেরই একটী সোপান মাত্র। কেহ এই সোপানে পদার্পণ করিয়া তার মধ্য দিয়া ভগবৎ-প্রেমে উন্নীত হয়, কেহ বা ইহা পরিহার করিয়াই ভগবৎ-প্রেম পায়। নরনারীর যে প্রেম, ইহাও একেবারে মিথ্যা মায়া নহে। ইহা জীব ও ভগবানের প্রেমের একটী নিকৃষ্ট নমুনা। দোকানদার যেমন নিজ গুদামে রক্ষিত জিনিষ-সমূহের কিছু কিছু নমুনা প্রদর্শনী-প্রকোষ্ঠে রক্ষা

করে, দাম্পত্য জীবনটাও তদ্রূপ। জীবের সহিত ভগবানের যতগুলি প্রেমমধুর সম্পর্ক হইতে পারে এবং এই সম্পর্কের মধ্য দিয়া যতগুলি বিরহ-বিধুর বা মিলন মেদুর অবস্থা আসিতে পারে, তাহার কিছু কিছু নমুনা দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। যে চক্ষুষ্মান, সে এই দাম্পত্য প্রেমের নানা নমুনার ভিতর দিয়া ভগবৎ-প্রেমের অনির্বচনীয় সুধাস্বাদনের আভাস পাইয়া ক্রমশঃ ক্ষণিক প্রেমের রঙীন নেশা পরিহার করিয়া চিরপ্রেমের শাশ্বত তৃপ্তির দিকে ছুটিয়া যায়। যাহারা অন্ধ বা চক্ষু থাকিতেও চক্ষু বুজিয়া থাকে, তাহারা ক্ষণিকের প্রেমেই ডুবিয়া থাকে ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃত চতুর ব্যক্তি অতি অল্পায়াসেই দাম্পত্য প্রেমকে ঐশ্বরিক প্রেমে রূপান্তরিত করিয়া নিত্যানন্দের পথে ধাবিত হইতে পারে।

দাম্পত্য প্রেম কখন ঐশ্বরিক প্রেমের সাধক

"কিন্তু এইরূপ স্থলে পতি এবং পত্নীর মধ্যে প্রাণের গভীর ঐক্য এবং নিবিড় ভালবাসারই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভ্রমরের মত যে ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইবে না, তেমন স্বামীই এই লক্ষ্যপথে ছুটিতে সক্ষম হয়। অন্তরের প্রচ্ছন্নতম কোণেও যার একনিষ্ঠ ভাব ব্যতীত অন্য কিছু নাই, তেমন পত্নীই এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়। সেখানে গার্হস্থ্য

জীবনকে ভগবৎ-প্রেমানুশীলনের সাধন-রূপে ব্যবহার করা অতীব সহজ হয়।

বিদ্বেষপরায়ণা স্ত্রীকে অনুকূল করিবার উপায়

"যে স্থলে স্বামী মহাশয় স্ত্রীটির প্রতি বিরক্ত, বিদ্বিষ্ট এবং প্রতিকূল ভাবাপন্ন, সেখানে এইরূপ কোনও উচ্চাশা পোষণের ক্ষেত্র অধিকাংশ স্থলেই মিলিবে না। কিন্তু যে স্থলে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য বা স্বামীর প্রতি বিরক্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ, সেইখানে স্বামী সুকৌশলে স্ত্রীর অন্তরের সুপ্ত পিপাসাগুলির প্রকৃতি অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার মনোভাব ও মনোগতির পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইবে। স্ত্রীর অন্তরের প্রকৃত কামনাগুলিকে অবগত হইয়া প্রত্যেকটী কামনার নিঃশেষে পূরণ করিবার কৌশল এই স্থলে অবলম্বনীয় হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা অতি স্থূল কামনার কথা বলা যাইতে পারে। যথা, দেহসুখ। অতীন্দ্রিয় সুখের আস্বাদন যে আজও পায় নাই, তার পক্ষে দেহসুখের সুতীব্র কামনা নিতান্তই অস্বাভাবিক নহে। কারণ, মানুষ আগে হইতেছে প্রাণী, তারপরে সে মানুষ। প্রাণিসুলভ কামনার তাড়না হইতে সে কি করিয়া নিজেকে মুক্ত করিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরের পশুটি দেবতায় পরিণত না হইতেছে? এই কারণেই নারী-পুরুষের দেহসুখ-কামনাকে সংসারে ও সমাজে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে,

অবশ্য তাহা যতক্ষণ স্বামী ও পত্নীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্বামী স্বাস্থ্যবান, কিন্তু পত্নীর পূর্ণ পরিতৃপ্তি বিধান করিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, অসন্তোষ, বিরক্তি এবং পরিণামে বিদ্বেষ এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারে আসিয়া দাঁড়ায়। এই বিদ্বেষের প্রতিকার স্বামীকে মূলের দিকে তাকাইয়াই করিতে হয়, ডালপালা ছাঁটিয়া, হিতোপদেশ দিয়া, শাসন, তিরস্কার, ভর্ৎসনা করিয়া ইহার প্রতীকার হয় না। বরং তাহাতে পুঞ্জায়মান ধূম্রকুণ্ডলী বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃ এক খাণ্ডব-দাহন-ক্ষম মহাগ্নিতে পরিণত হয়।

স্ত্রীকে বশীভূত করিবার উপায়

"কিন্তু জগতের সর্ব্বকালেরই ইহা একটী পরম সত্য যে, যে দিতে চায়, সে যদি নিজেও নিতে চাহে, তাহা হইলে সে অধিক করিয়া দিতে পারে না। নিজে কিছুই পাইবার যাহার আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা নাই, দিতে যদি ইচ্ছা করে, জগতে সে-ই সকলের অপেক্ষা অধিক দিতে সমর্থ হয়। দেহের সুখই হউক, ভোগের পরিতৃপ্তিই হউক, স্বামী যখন নিজের জন্য তাহার একটী কণাও না চাহিয়া স্ত্রীকেই পরিপূর্ণ-রূপে তাহা দিবার জন্য চেষ্টিত হয়, তখন সে যাহা যতটুকু দিতে চাহে, তাহার শতগুণ দিতে সমর্থ হয়। সুতরাং ইহাই হইবে প্রত্যেক স্বামীর পক্ষে অবাধ্য স্ত্রীকে বশবর্ত্তিনী এবং অনুকূল করিবার প্রাথমিক পন্থা। সম্পূর্ণ নিষ্কাম মন লইয়া এভাবে চলিতে

চলিতে ধর্ম্মপ্রাণ পতির সম্মুখে আস্তে আস্তে আরও নানাবিধ পন্থার প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। নারীর ভিতরে যদি পুরুষকে বশ করিবার ক্ষমতা বিধাতা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে-জানিও, নারীকে বশ করিবার শক্তি পুরুষকে দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। পত্নী স্বামীকে বশ করিবে অকৃত্রিম ও বিনম্র সেবা দিয়া, স্বামী পত্নীকে বশ করিবে নিষ্কলুষ নিঃস্বার্থপরতা দিয়া।

মনোবল হারাইও না

"সুতরাং বিবাহ করিবার ফলে জীবনের পরম লক্ষ্য হইতে দূরে অতি দূরে সরিয়া যাইতেছ, এই কথা এখনই মনে করিবার কারণ নাই। অন্তরকে আশায়, উৎসাহে, উদ্দীপনায় সজীব কর। নিজের ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইয়া তোল। বিঘ্নগুলি যতই অধিক হউক, বাধাগুলি যতই উচ্চ হউক, গ্রাহ্য করিও না। সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়াও তোমাকে তোমার পরমলক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। কোনও অবস্থাতেই মনোবল হারাইও না।"

বিবাহের আবশ্যকতা

শেষ পত্রখানার অনুলিপি করার পরে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র দত্ত শ্রীশ্রীবাবামণিকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্ন ঃ—বিবাহের আবশ্যকতা কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহ সাধারণ মানুষের জীবনে এক অতি গুরুত্ব-পূর্ণ সংস্কার, যার অধীনতা তাকে স্বীকার কর্ত্তেই হবে, যদি সে সভ্য মানুষ হ'য়ে আত্ম-পরিচয় দিতে চায়। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি লালসাহীন ও উদাসীন শক্তিশালী পুরুষ বা নারীর পক্ষে এই সংস্কারের আবশ্যকতা পড়ে না। কারণ, বিবাহিত না হ'লেও তাঁরা কোনো নারী বা পুরুষের সঙ্গে কদাচ ইন্দ্রিয়-সংশ্রবে যাবেন না ব'লেই সঙ্কল্প ক'রে থাকেন। ইন্দ্রিয়-সুখের প্রয়োজন আছে, সেই প্রয়োজনের তাগিদটুকুকে অনুভব করবার মত বোধ-শক্তিও আছে এবং সেই প্রয়োজনের দাবীকে সবলে চেপে রেখে বা তার কোনও দিব্য রূপান্তর ঘটিয়ে সরল মেরুদণ্ডে চলবার নাই অভিরুচি বা সাহস, অথচ বিবাহ কর্ব্বে না, এমন স্ত্রী-পুরুষদের পক্ষে অবিবাহিত থাকার মানে হচ্ছে বিশৃঙ্খল আরণ্য যুগের বল্গাহীন ও দায়িত্ব-বর্জ্জিত যৌন জীবন যাপন করা। সমাজকে সেই বিশৃঙ্খলা এবং তজ্জনিত বহুবিধ অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষা করার জন্য বিবাহের বিধি প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং এই বিধি সমাজের মঙ্গল-সাধনই করেছে। এইখানেই বিবাহের আবশ্যকতা বা উপযোগিতা।

বিবাহের কামনা কি ভাবে জাগে

প্রশ্ন :—বিবাহের কামনা মানুষের মনে কি ভাবে জাগে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যে মানুষ অপর কোনও বিবাহিত নরনারী কদাচ চোখে দেখে নাই বা বিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনের ও আচরণের অন্তরঙ্গ কোনও বিবরণ কখনো শোনে নাই, তার মনে বিবাহের কামনা ঠিক বিবাহ-কামনা রূপে কখনো জাগে না, জাগে এক বিরাট বিস্ময় রূপে এবং ঐ বিস্ময়জনিত এক অকথনীয় আবেগ রূপে। একজন আর একজনকে দেখে অভিভূত ও বিমুগ্ধ হয় এবং তার ফলে আস্তে আস্তে কল্পনাতীত ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়। নিজেদের প্রায় অজ্ঞাতসারে একে অন্যকে নিজের সমীপবর্ত্তী করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে হঠাৎ একদিন তারা আবিষ্কার ক'রে আশ্চর্য্যান্বিত হয় যে, এমন একটা অবস্থায় তারা পৌঁছেছে, যেই অবস্থাটি দৈহিক মিলনের একটা চূড়ান্ত রূপ। কিন্তু যারা চোখের সামনে বহু বিবাহিত নরনারীকে দেখেছে এবং বহু জনের জীবনের অনেক গুপ্ত কথা স্বকর্ণে বা পরকর্ণে শুনেছে, তারা পাত্রবিশেষের বিশেষ আকর্ষণের মধ্য দিয়ে সমীপস্থ হবার আগেই কল্পনায় অনেক রঙীণ ছবি আঁকে এবং এর ফলে, যে বয়সে যে কামনা জাগবার নয়, তাদের জীবনে সেই বয়সে সেই কামনার উদয় হয়। বিবাহ তখন তাদের নিকট দাবীদারের মত হ'য়ে দাঁড়ায় এবং এই দাবীদারের দাবী পূরণের অধিকার অর্জ্জনের জন্য তাদের ইন্দ্রিয়-সমূহ হয় উন্মুখ। এই উন্মুখতাই তাদের মধ্যে বিবাহ-কামনা জাগায় এবং এই কামনার ইন্ধন দিতে দিতে তারা বারংবার

বিকারজনক অপচেষ্টাও করে। এই জন্যই প্রাচীনেরা উপদেশ দিয়েছেন, গ্রাম্য বার্ত্তা কখনো কাণ পেতে শুনো না, গ্রাম্য দৃশ্য কখনো চোখ খুলে দেখো না। "গ্রাম্য বার্ত্তা" বা "গ্রাম্য দৃশ্য" কথাটুকুর এখানে মানে হচ্ছে নরনারীর ইন্দ্রিয়-ব্যবহার-সম্পর্কিত বিবরণ বা দৃশ্য।

বিবাহ একটী পবিত্র বন্ধন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিবাহ সংসার-জীবনের একটা প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠা শুধু তার নিজবংশীয় লোকদের মধ্যেই নয়, অন্য আর একটী নির্দ্দিষ্ট বংশের লোকদের মধ্যেও। এখানে প্রতিষ্ঠা কথাটীকে খুঁটি শব্দের প্রতিশব্দ ব'লে মনে ক'রো। বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত একটা লোক একটা নির্দ্দিষ্ট বংশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ তার দ্বারা এই বংশের ধারা বিবর্দ্ধনের সম্ভাবনা নাই। বিবাহ-কালে ভিন্ন বংশ থেকে আর একটি মানুষকে নিজের আমৃত্যু সঙ্গী ক'রে নেওয়া হয় ব'লে প্রকারান্তরে সেই দ্বিতীয় বংশটীও একটী খুঁটি স্বরূপ হয়। এই খুঁটির বড় জোর। সমূলে উৎপাদন থেকে এই দুইটী খুঁটি বিবাহিত মানুষকে টেনে ধ'রে রাখে ব'লে বংশটা একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যায় না। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে গেলে বিবাহকে সাধারণ মানুষের জীবনে সুমহত্তম সংস্কার ব'লে না মেনে উপায় নেই। এই জন্যই বিবাহ একটী পবিত্র বন্ধন। এই জন্যই বিবাহিত হয়েছে ব'লে

কারো লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। আবার এই জন্যই সময় পার হয়ে গেলেও কারো বিবাহ না হ'লে সে সমাজ-মধ্যে অনাদরণীয় হয়। যতদিন বিবাহ একটী প্রথায় পরিণত হয় নি, ততদিন মানুষের জীবনে বা বংশে কোনো খুঁটি ছিল না। খুঁটিকে মূলও বলতে পার। বিবাহ-প্রথাহীন সমাজ কতকটা অমূল তরুর ন্যায় অদ্ভুত বস্তু।

বিবাহের আকুলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই জন্যই পিতামাতা ও অভিভাবকগণ পুত্রকন্যাকে সময় মত বিবাহ দেবার জন্য উদ্গ্রীব এবং কখনো কখনো অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়েন। তাঁদের সেই উদ্গ্রীবতা উপলক্ষিত পুত্র বা কন্যার দৃষ্টি এড়ায় না। ফলে, তারাও বিবাহ যে কি বস্তু, কিছুই না জানা সত্ত্বেও, বিবাহের জন্য অত্যধিক আকুল হ'য়ে পড়ে। ছেলেরা ভাবে, বিয়ে হ'লে বধূর উপরে কর্ত্তৃত্ব করা যায়, মেয়েরা ভাবে, বিয়ে হ'লে নূতন নূতন শাড়ী ও গয়না পরা যায়, সুতরাং যত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়, ততই ভাল। কিন্তু বন্ধু সব ছেলের আর বান্ধবী সব মেয়েরই ত' থাকে। তাদের মধ্যে যারা বিবাহিত, তারা কত রকমের রং চড়িয়ে কত যে রহস্যপূর্ণ গুপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে, তার ইয়ত্তা নেই। ফলে বিবাহিত জীবনের গূঢ়াংশটুকুর এমন সব চিত্র তাদের মনের

মুকুরে ভেসে ওঠে, যার ফলে দ্রুত বিবাহিত হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে দমন ক'রে চলা তাদের পক্ষে অসাধ্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু বিবাহে যদি সুখ থেকে থাকে, তবে তাতে দায়িত্বও যে আছে, এই কথা ত' তাদের কেউ বলে নি। ফলে কিছুকাল পরে যখন বাস্তবের সহিত মুখামুখি হয়, তখন তারা নিজেদের অনেক বোকামির জন্যই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। আকুলতা যাকে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য ক'রে দিয়েছিল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে।

বিবাহিত জীবনে অসহিষ্ণুতার কুফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, ছেলেগুলি কেবল প্রতীক্ষায় থাকে, কবে বিয়ে হবে। বিবাহ হয়ে গেলে আর সবুর সইতে পারে না। বালিকা বধূর দেহে মিলনের যোগ্যতা আসবার আগেই, এর প্রাণে অনুরাগ সৃষ্টি হবার অনেক পূর্ব্বেই তাকে জোর জবরদস্তি ক'রে বশীভূত কর্ব্বার চেষ্টা করে। কুবাক্য চলে, তিরস্কার চলে, ভয় প্রদর্শন চলে, প্রহার, পদাঘাত সবই চলে, আধ-ফোটা ফুলকে জোর ক'রে ফুটাতে গিয়ে দুজনের মধ্যে আন্তরিক ব্যবধানের করে সৃষ্টি এবং প্রতিক্রিয়া আসে কিছুদিন পরে স্ত্রীটির কাছ থেকে। স্বামী যখন বুঝতে পারে যে বড়ই বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে, এখন ফেরা দরকার, স্ত্রীটি তখন ভাবতে থাকে যে,

স্বামীর এই সংযত থাকার চেষ্টা প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য নারীতে লালসার ফল ছাড়া আর কিছু নয়। তখন স্ত্রীটি স্বামীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য করে এবং বারংবার স্ত্রী-নির্জ্জিত হ'য়ে স্বামী বেচারী নিজেকে বড়ই বিকৃত ও হেয় ব'লে ভাবতে থাকে। বিবাহিত জীবনে অসহিষ্ণুতার এই কুফল অনেককে আমৃত্যু ক্লেশ ভোগায়। কিন্তু অনভিজ্ঞ কিশোর-কিশোরীদের এতে দোষ কতটুকু? তাদের অভিভাবকেরা সবাই বিবাহিত জীবনের কালকূট পান করেছেন, দুঃখও ভুগেছেন কিন্তু বংশধর ও বংশধারিকাদিগকে এই দুঃখের বাধ্যকর পুনরাবর্তন থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো চেষ্টাই কখনো করেন নাই।

বিবাহিত জীবনে অসহিষ্ণুতার প্রতিফল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অধিকাংশ স্ত্রী কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত মাত্রাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের শিক্ষা লাভ করে তাদের স্বামীরই কাছ থেকে। সরল, অনাবিল, লালসাবর্জ্জিত সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য নববধূ যতই চেষ্টিত হয়, স্বামী ততই মনে করে থাকে যে, এখনি একে বশীভূত করে না পারলে ভবিষ্যতে এ মেয়ে স্বৈরিণী হবে। সব চেয়ে বড় কথা, স্বামী তার নিজের সুখের জন্যই পাগল হ'য়ে পড়ে, বধূ বেচারীর কিসে কখন সুখ বা অসুখ, সেই বিবেচনায় তার একান্ত

অভাব, সেই বিষয়ে সহানুভূতিরও তার অবসর নেই। তারপরে স্ত্রীর ভিতরে যখন ইন্দ্রিয়-লালসা এমনি প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, স্বামীর ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, গায়ের জোরে সে সম্ভোগ আদায় ক'রে নেবেই নেবে, তখন স্বামীরা চিরাচরিত প্রথানুসারে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণ ক'রে বল্‌তে থাকে,—দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে স্বামীর অনাসক্তি দেখলে কেন সেই রমণী অভিমান ক'রে, কলহ ক'রে, অবজ্ঞা ব'লে স্বামীকে বিরক্ত করবে না, স্বামীর স্বেচ্ছাচারী জবরদস্তির ভিতর দিয়ে অনিচ্ছায় যাহাকে অকালে সম্ভোগ শিখতে হয়েছে? একে আমি বিবাহিত জীবনে অসহিষ্ণুতার শুধু কুফলই বলব না, বলব একে অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল।

বিবাহের হলাহলকে অমৃত করা যায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু স্বামি-স্ত্রী ইচ্ছা করেই এই সকল কুফল ও প্রতিফল থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে। যারা যৌন জীবনের কোনও চর্চা না ক'রেই বিবাহিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তারা পারে অতি সহজে। যাদের মধ্যে দৈহিক মিলন ঘটেছে পারস্পরিক প্রীতি, সহানুভূতি ও সমবেদনার মধ্য দিয়ে, তারাও পারে, যারা নিজেদের মধ্যে দুরন্ত বিপর্য্যয় সৃষ্টি করার পরে একজন আর একজনকে

নিজের পরম শত্রু ব'লে ভাবতে সুরু ক'রে দুঃখের পতন গুহার নিম্নতম তলে এসে পৌঁছেছে, তারাও পারে। কিন্তু তার জন্য সর্ব্বপ্রথমে চাই, প্রবল সঙ্কল্প। আর চাই জীবনকে একটী সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শবাদের ভিত্তিতে পরিচালনের প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা। আর প্রয়োজন এমন পথপ্রদর্শক, যাঁর অভ্রান্ত উপদেশে আছে সঞ্জীবনী শক্তি। বিবাহিত জীবনের হলাহলকে জীবনীয় অমৃতে রূপান্তরিত করা এদেশের মানুষের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। না বুঝে, না জেনে শুধু রিরংসার তাড়নায় যে অমৃতকে হলাহলে পরিণত করা হয়েছিল, তাকে পুনরায় অমৃতে রূপান্তরিত করবার পথ আছে। সে পথ শ্রীভগবানের নামে একান্ত ভাবে আশ্রয় নিবার পথ। নাম করে করে কাম প্রেমে পরিণত হয়, প্রেম স্বামী ও স্ত্রী দুজনকে একেবারে একাত্ম ক'রে দেয় এবং তখন আর মোহের অস্তিত্ব থাকে না।

হাইলাকান্দি
২৯শে মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৪১
(১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

পার্শ্ববর্ত্তী সিলেট জেলার সদর সহর শ্রীহট্টে যে শ্রীশ্রীবাবামণির ভাষণাবলিতে একটা বিরাট ও অবর্ণনীয় আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, মনে হইল হাইলাকান্দিতে তার কোনও সংবাদ পৌঁছে নাই। অথচ হাইলাকান্দি কাছাড়-জেলার একটী মহকুমা-সহর। —এই কথা বলিয়া আক্ষেপ

প্রকাশ করিতেছিলেন এক তরুণ যুবক, যিনি নামেই শ্রীশ্রীবাবামণিকে জানেন, পূর্ব্বে কখনও প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে নাই। তিনি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন যে, বক্তৃতা দানের জন্য হল কোথায় পাওয়া যায়। সবাই তটস্থ চাঁদার কথা ভাবিয়া, কি জানি, কাহাকে আবার কত টাকা চাঁদা দিতে হয়। যাঁহার ভাষণ শুনিবার জন্য সর্ব্বত্র হাজার হাজার লোক পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া সভাস্থলে হাজির হন, তাঁহার ভাষণের জন্য হাইলাকান্দিতে স্থান সংগ্রহ করা যাইতেছে না। ২৮শে মাঘ অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় টাউন হলে ভাষণের কথা হইয়াছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ নানা গুরুতর আপত্তি তোলায় আর প্রচার-কার্য্য করা হয় নাই। কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন যে, ইহা শিলচরের বাধাদানকারীদের অমূলী-হেলনের প্রত্যক্ষ সুফল।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য দুঃখ করিতেছিলেন,—সত্যই কি দুর্ভাগ্য! কারো কোনো আগ্রহ নেই! শেষ পর্য্যন্ত এখানে কি আপনার বক্তৃতা হবেই না?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হবে ব্যোমকেশ, হবে। হল্ খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? উপরে বিস্তীর্ণ আকাশ, পদতলে উন্মুক্ত ধরিত্রী, এর চেয়ে ভাল সভাস্থলের কি প্রয়োজন? তবে, আজ আর কোনও বক্তৃতা দিব না। আজ কেবল চিঠিপত্র লিখব। হাজার চিঠি জমে আছে।

জাতিভেদের কুসংস্কার

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত সিংজানী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি কখনই তোমাদিগকে একথা বলি নাই যে, তোমরা জোর করিয়া জাতিভেদ তুলিয়া দাও। কিন্তু জাতিভেদের কুসংস্কার তোমাদের অন্তর হইতে অবিলম্বেই তুলিয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক, সাম্প্রদায়িক এবং হিন্দুদের মধ্যেই নিম্নতর শ্রেণী সম্পর্কিত কোন্ উপদ্রব যে কোন্ দিন কোন্ অঘটন ঘটাইয়া দেয়, তাহা আজ তোমরা অনুমান করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু বিভ্রাট যেদিন আসিবে, সেদিন দেখিবে যে, তোমরা তোমাদের অন্তরের কুসংস্কার দূর কর নাই বলিয়াই সেদিন হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত এক বিপত্তির মুখে পড়িয়া যাইবে যে, তোমরা ঘর গুছাইতে না গুছাইতে আকস্মিক ভাবে নির্মূল হইয়া যাইবে। ইতিহাসের শিক্ষা তোমরা মানিতে চাহ না, কিন্তু তাহার ফলে তোমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। জাতিভেদ-বিদূরণ করিয়া সর্ব্ববর্ণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান স্থাপন করিতে এখনই বলিতেছি না। কিন্তু হঠাৎ যদি আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া কোনও বিজয়ী পারস্য-সম্রাট আরব হইতে চীন পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের সকল জাতির সৈন্য-সমাবেশ লইয়া ভারতে আপতিত হয় এবং তোমাদের কন্যা, ভগিনী, মাতা এবং পত্নীদিগকে জোর করিয়া টানিয়া নেওয়া

সুরু করে, তাহা হইলে তখন কি একটী দিনের মধ্যেই সকল ভেদাভেদ ভুলিয়া এদেশবাসী সকল জাতির এক জাতিতে পরিণত হইবার চেষ্টা দেখিতে হইবে না? বিধর্ম্মী আততায়ী দ্বারা শূদ্র-ব্রাহ্মণাদির কুমারী, সধবা ও বিধবাদের উপরে নির্ব্বিচার পাশবিক অত্যাচারের চেয়ে কি শূদ্র-ব্রাহ্মণে বৈধ বিবাহ অধিকতর অবমাননাকর হইবে? আজ যদি সহসা এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে ভারতের পূর্ব্বদিকে নয়নানন্দ অরুণের আবির্ভাব না হইয়া ধূমকেতুর আবির্ভাব হয় এবং নির্ম্মম এক পীত জাতি বুটের আঘাতে তোমাদের বক্ষ-পঞ্জর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইয়া নির্ব্বিচারে, তোমাদের জননী, ভগিনী, রমণীদের উপরে বলাৎকার সুরু করিয়া দেয়, তাহা হইলে একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে কি সর্ব্ব-জাতির সমন্বয়ে একটা মহাজাতি সৃষ্টি করিয়া লইয়া এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতে পারে না? আজ যাহা অসম্ভব জ্ঞান করিতেছ, কাল তাহা নিতান্ত বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। ইতিহাস কখনো কাহারও খেয়াল-খুশী-মাফিক চলে না, সে চলে স্বভাবের সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে। যাহারা ঐক্যবদ্ধ, যাহারা পরস্পর সম্প্রীতি-পরায়ণ, যাহারা একে অন্যের বিপদে নির্ব্বিচারে প্রাণাহুতি দেয়, তাহারা কাহারো দাসত্ব করে না, তাহারাই প্রভুত্ব করিয়া বেড়ায়। ব্যক্তিগত ভাবে তুমি ধার্ম্মিক বা সৎ,

এইটুকুই এই জগতের নিদারুণ প্রতিযোগিতায় তোমার উদ্বর্তনের গ্যারান্টি নহে, তুমি আরও বহু জনকে সৎ ও ধার্ম্মিক করিতে পারিয়াছ এবং তাহাদের সকলের একত্রীভূত সঙ্ঘশক্তি তোমার করমুষ্টিতে বজ্রবৎ ধৃত রহিয়াছে, জগতে অসুর-কুলের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য ইহাও তোমার একান্ত প্রয়োজন। শাকান্ন খাইয়া অঋণী অপ্রবাসী থাকিয়া জীবন-যাপন করিতে পারিতেছ, শুধু এইটুকুতে তৃপ্ত থাকিলেই তোমার চলিবে না। সহস্র সহস্র উপবাস-ক্লিষ্টকে নিত্য এবং সদুপায়ার্জ্জিত শাকান্ন যোগাইবার ব্যবস্থা তুমি করিয়াছ এবং সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আদর্শোজ্জ্বল কর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত করাইতে পারিয়াছ, ইহাও চাহি। ভবিষ্যতের যে-কোনও বিপত্তির জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত থাকিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের মন হইতে জাতিভেদের অন্ধ কুসংস্কার দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। অন্তর হইতে কুসংস্কার আগে দূর কর, সকলের মধ্যে পানাহার ও বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রচলনের দ্বারা জাতি-ভেদের জড় মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হইবে কিনা, তাহার মীমাংসা পরে হইবে। চিত্তকে সংস্কার-মুক্ত কর, মানুষকে মানুষের দৃষ্টিতে দেখ, মানুষ বলিয়া দেখ। কেহ নীচে আছে বলিয়াই ছোট নহে এবং কেহ ছোট আছে বলিয়াই তোমার পর নহে। এই বোধকে অন্তরে জাগ্রত কর।"

বিপদ ও বিশ্বাস

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কচুইতলী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বিপদ যতই ঘনাইয়া আসুক, তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস ত্যাগ করিও না। তোমরা পরিপূর্ণ নির্ভর এবং আত্মসমর্পণ লইয়া নিজেদের কালোপেত ও যথোচিত কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে থাক। বিপদ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে ভয় পাইবে। আর যদি স্পর্শই করে, তবে সে শুধু নিজে নির্ম্মূল হইবার জন্যই তাহা করিবে। সাহস হারাইও না, মনোবল হারাইও না।"

ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সমাজ-কেন্দ্রিকতা

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত জঙ্গলবাড়ী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ব্যক্তির দিকে না তাকাইয়া তোমরা সমগ্র সমাজের দিকে তাকাইয়া চল। সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া নিজ নিজ ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর। একের উপরে অপরে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া প্রত্যেকে সমাজটীর সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলের একান্ত ও অনুগত সেবক হও। কে ছোট, কে বড়, কে স্পৃশ্য, কে অস্পৃশ্য, এই সমস্ত

সম্পর্কিত যাবতীয় কুসংস্কার অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া সকলকে সমাজের বিকাশ, পরিপুষ্টি, উন্নতি ও বলিষ্ঠতা বর্দ্ধনে নিয়োজিত হইবার প্রেরণা দাও এবং নিজেরা নিজেদের আচরণের মধ্য দিয়া সেই প্রেরণার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিয়া যাইতে থাক। ব্যক্তিগত সৎসাহস ও অকুতোভয়তাকে ব্যক্তিগত শক্তিবর্দ্ধনের সহায়ক রূপে প্রয়োগ না করিয়া হয় ব্যক্তিগত শক্তিকে সমাজ-হিতের অধীন কর, নয় ইহাদিগকে একমাত্র সমাজের হিতসাধনকল্পে প্রয়োগ কর। তোমার আত্মবিশ্বাস একা তোমারই পরিপূর্ণ সার্থকতার নিদান না হইয়া সমগ্র সমাজের প্রত্যেকের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া সমগ্র সমাজেরই সার্থকতা আহরণের নিদান কিম্বা অন্ততঃ পক্ষে উপলক্ষ্য হউক। জীবনে কাজের মত কাজ করিবার সুযোগ প্রতিদিন আসে না, কিন্তু যে দিন আসে, সেই দিন যেন তোমার স্বার্থপরতা, আত্মপরায়ণতা, স্বোদরপূরণপ্রিয়তা ও আত্মাভিমানের দরুণ বৃথাই বহিয়া না যায়। তোমার সকল চেষ্টা, সকল বাক্য, সকল চিন্তা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক না হইয়া সমাজ-কেন্দ্রিক হউক। সমাজকে তোমার জন্য বাঁচাইয়া না রাখিয়া সমাজের জন্য তুমি বাঁচিয়া থাক। সমাজের অগণিত অজ্ঞ, মূর্খ, নিরক্ষর, দুর্ম্মেধা দুর্ব্বল জনগণকে তোমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন-সিদ্ধির কাজে নিয়োগ না করিয়া নিজেকে ইহাদের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য নিয়োগ কর। নিজেকে ইহাদের সেব্য না করিয়া নিজে ইহাদের সেবক হও। আমি

তোমার কর্ম্মোদ্যম, উৎসাহ বা সুপ্রচণ্ড প্রয়াস-পরায়ণতা হ্রাস করিতে চাহিতেছি না, আমি চাহিতেছি এই সকল দুর্দ্ধর্ষ গুণাবলিকে তুমি বিশাল সমাজের ব্যাপক হিতে, স্থায়ী কুশলে এবং নিশ্চিত মঙ্গলে প্রয়োগ করিয়া যাইবে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক লোকেরা সমাজের বৃহৎ হিতকে নিজের ক্ষুদ্র হিতের কাছে বলি দেয়। সমাজ-কেন্দ্রিক লোকেরা নিজের বৃহৎ হিতকেও সমাজের ক্ষুদ্র হিতের কাছে বলি দেয়। এই বলিদানের আনন্দ সকলে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই বলিদানের আনন্দ দেবতারই উপভোগ্য। আমি চাহি যে তোমরা দেবতা হও এবং আশীর্ব্বাদও করি যে, একবার দেবতা হইয়া যেন আর কখনো পশুত্বের নিম্ন স্তরে তোমাদের অবরোহণ করিতে না হয়।"

নেতৃত্ব ও দাসত্ব

কুমিল্লা ঠাকুরপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমাদের অন্তর হইতে কিছুতেই যেন দাসত্বের দুরপনেয় কলঙ্ক-সংস্কার দূর হইতে চাহিতেছে না। তোমরা নিজেরা এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে দাসই রহিয়াছ, তাই এত করিয়াও তোমাদের দাসসুলভ নীচতাগুলি যাইতে চাহিতেছে না। সিংহের চরিত্রে শৃগালের দোষ দেখা যায়? তিনটী আর পাঁচটী কর্ম্মী মিলিয়া একটী কাজ করিতে যাইতেছ, আর তারই মধ্যে

নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব লইয়া কত মারামারি কত কাটাকাটি চলিয়াছে। এক দাস অপরকে দাসই করিতে চাহে। নিজে অনুগত অনুবর্ত্তী থাকিয়া অপরকে নেতা হইবার সুযোগ একবার দিয়াই দেখ না যে, সে তোমাদের মূল উদ্দেশ্যের বাস্তবতা বিধানে কতটুকু করিতে পারে? কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্বের লোভ ছাড়। ঐ লোভ অন্তরের নিদারুণ দৈন্য ও সূক্ষ্ম দাসত্বের পরিচায়ক। কেবলই যদি নেতা হইতে চাহ, তবে তোমার কথা শুনিবে কয় জনে? সকলের সেবক হইবে, তবে ত' সকলে তোমার কথায় কর্ণপাত করিবে। জীবন পাইয়াছ ত' সত্য কাজে মহৎ ব্রতে শ্রেষ্ঠ পথে উৎসর্গ করিবার জন্য। কিন্তু তোমার নেতৃত্ব লাভের কদর্য্য প্রয়াস যদি অপর সতীর্থদিগকে তোমার কাছ হইতে দূরেই সরাইয়া দিল, তবে তুমি তোমার একার উৎসর্গে জগতের কতটুকু হিত সম্পাদন করিবে? একাকী নহে, সমগ্র জগৎকে লইয়া উৎসর্গের পথে চল।"

মহামন্ত্রে দীক্ষা

কুমিল্লা জেলান্তর্গত সেন্দ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তুমি বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য নূতন করিয়া একটী মন্ত্র চাহিয়াছ। আমি বলি, ইহা নিষ্প্রয়োজন। মহামন্ত্র ওঙ্কারে যে দীক্ষা গ্রহণ করে, তাহার আর কোনও উদ্দেশ্যেই পৃথক্ কোনও মন্ত্র গ্রহণ করার আবশ্যকতা পড়ে

না। এক সময়ে এই দেশে তান্ত্রিক আচার্য্যেরা এবং যাঁহারা তান্ত্রিক আচার্য্যদের পদস্পর্শেরও যোগ্য নহে, এমন একদল তুক্-তাক্‌কারীরা ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সুসন্তান লাভের জন্য গর্ভাধানকালে জপনীয় পৃথক্ মন্ত্র ছিল, অবাধ্য স্ত্রী বা অবহেলা-পরায়ণ স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য পৃথক্ মন্ত্র পরিকল্পিত হইয়াছিল। জ্বররোগ নিবারণের জন্য এক মন্ত্র, ধাতুদোষ নিবারণের জন্য অপর মন্ত্র, চর্ম্মরোগ নিবারণের জন্য আর একটী পৃথক্ মন্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে মন্ত্রের বহর বাড়িতে বাড়িতে তামাকে সোনা করিবার মন্ত্র, মোকদ্দমায় জিতিবার মন্ত্র, লটারীর টাকা নিশ্চিত পাইবার মন্ত্র, জ্ঞাতিশত্রু বধ করিবার মন্ত্র আবিষ্কৃত, প্রচলিত ও অনুশীলিত হইতেছিল। এভাবে মন্ত্রের যে কত অপব্যবহার হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বন হইতে লোক-প্রাণপ্রদ উদ্ভিজ্জ ভেষজের মূলসংগ্রহ-কালে লোকহিতকামনায় যেমন মন্ত্র ব্যবহার আবশ্যকীয় বলিয়া এক সময়ে মনে করা হইয়াছিল, তেমনি আবার তাবিজ-কবচ দ্বারা মন্ত্রৌষধির সাহায্যে পরনারীকে গৃহচ্যুত করিয়া নিজের অন্তঃপুরে বন্দিনী করিবার মন্ত্র পর্য্যন্ত কল্পিত ও সেবিত হইয়া আসিতেছে। যদি আমার কথা শোন, তাহা হইলে বলিব যে, এইরূপে প্রতি কাজে ও প্রতি অকাজে হাজার হাজার মন্ত্রের ঝুড়ি বহিয়া বেড়ান তোমাদের পক্ষে শুধু নিষ্প্রয়োজনীয়ই নয়,

আমার আদেশে নিষিদ্ধও বটে। মহামন্ত্র ওঙ্কারে যখন দীক্ষা পাইয়াছ, তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্ব্বদা ইহাই তোমার একমাত্র সেব্য, উপজীব্য ও অনুশীলনীয়, জানিও। অন্যেও অন্য মন্ত্রের প্রতি উৎসুক, কৌতূহলী, আগ্রহশীল বা অনুরাগী হইও না। অসৎ কাজ করিবার কালে যদি মহামন্ত্র ওঙ্কারের সেবা চালাইতে থাক, তাহা হইলে ইহারই শক্তিতে তোমার চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে, ক্ষতিকর কার্য্যে তোমার অন্তরের আসক্তি আপনা আপনি দূর হইয়া যাইবে। স্ত্রীকে ভালবাস? এই ভালবাসার মধ্য দিয়াই ওঙ্কারের সেবা চালাইয়া যাও। স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক দৈহিক আসক্তিকে দমাইয়া রাখিতে পারিতেছ না? দৈহিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়াই অবিরাম অবিশ্রাম নামের সেবা চালাইয়া যাও। যাহা তুমি করিতেছ, তাহা করিতে তোমার স্ত্রীকেও উৎসাহিত কর। কিছুদিন পরে দেখিবে, তোমাদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে এমন ব্রহ্মচর্য্য, এমন সংযম, এমন স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, যাহা অনেক কাল চেষ্টা করিয়াও প্রতিষ্ঠিত করিতে মোটেই সমর্থ হও নাই। ওঙ্কারে যে দীক্ষা পাইয়াছে, তাহার অপর কোনও মন্ত্রই কোনও অবস্থাতে অবলম্বনীয় নহে, একমাত্র অখণ্ড-মন্ত্রের মহামহিমাতেই সে সর্ব্বকর্ম্মেকৃতী, সর্ব্বক্ষেত্রে জয়ী এবং সর্ব্বচেষ্টায় সফল হইবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সেবায় প্রলুব্ধ না হইয়া সকল প্রয়োজনে এই একটী মন্ত্রের সেবায় লাগিয়া যাও। শিশু যেমন হাঁপিতে

মুতিতেও মাকে ডাকে, খাইতে শুইতেও মাকে ডাকে, কোন্ কাজটা এর মধ্যে সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর, সেই বিচারের ধারে ধারে না, তদ্রূপ হও।"

সমবেত উপাসনায় সঙ্গি-সাথীর অভাবে

কুমিল্লা জেলান্তর্গত পরাণপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সঙ্গি-সাথীর অভাবে তোমাদের সমবেত উপাসনা জমিতেছে না বলিয়া লিখিয়াছ। এই ব্যাপারে এখন পরিবারস্থ সমধর্মীদের নিয়া যতটুকু সাফল্য অর্জ্জন সম্ভব, তাহারই চেষ্টা করিও। প্রত্যেকে উপাসনার সুর বিশুদ্ধ ভাবে শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিও এবং একমাত্র উপাসনার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও চিত্তাকর্ষকতা বর্দ্ধনের জন্যই যে যতটা পার, কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা বর্দ্ধনের চেষ্টা করিও, অন্য উদ্দেশ্যে নহে। তোমাদের উপাসনাকালীন স্তোত্র-কীর্ত্তনের প্রাণোন্মাদকারিণী আকর্ষণীতে আকৃষ্ট হইয়া বনের পশুও আসিয়া হিংস্রতা পরিহার করিয়া তোমাদের সাথে উপাসনায় বসিবে, গীতি-রত কাকলি-চঞ্চল মধু-কণ্ঠ গাছের পাখী আসিয়া নিজের চিরকালের সাধা গান ভুলিয়া যাইয়া তোমাদের সহিত হরিওঁ কীর্ত্তনে যোগ দিবে। অন্তরে এই বিশ্বাস রাখিয়া তোমরা উপাসনায় রত হও।

"যাঁহারা তোমাদের সহিত এক দীক্ষায় দীক্ষিত নহেন বা

একই গুরুর অনুগামী নহেন, তোমাদের ধর্ম্মপথ ও ধর্ম্মমত ত' এমন সঙ্কীর্ণ বা সাম্প্রদায়িকতাবাদী না যে, তাঁহারা আসিয়া তোমাদের উপাসনায় যোগ দিতে পারিবেন না। শুদ্ধ দেহে, নম্র মনে, পবিত্র বস্ত্রে যিনি আসিয়া তোমাদের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন, তখনকার মত তিনিই ত' তোমাদের গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনী। তবে আর সঙ্গি-সাথীর অভাবের জন্য অন্তরে এত পীড়া অনুভব করিতেছ কেন? নিজের মতে দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়াইয়া লইবার সকল কৃত্রিম চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তোমরা ঐকান্তিক ভাবে সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সহনশীল, প্রেমশীল ও আহ্বানশীল হও, দেখিবে, তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া 'বন্দে সদা' গাহিবার জন্য, 'হরি-ওঁ' কীর্ত্তন করিবার জন্য শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব, আর্য্য, রামায়ৎ, কবীরপন্থী কাহারও অভাবই হইবে না। ইঁহারা সকলে নিজের প্রাণের সহজ আকর্ষণে তোমাদের সহিত একাসনে বসিয়া সর্ব্বমন্ত্রের অধিরাজ ওঙ্কারের সম্মুখে প্রণতি করিবেন। ভারতের ভাবী ঐক্য ও মহনীয়তা সুনিশ্চিত করিবার জন্য একদা বর্ত্তমানে পূজিত বহু দেব-বিগ্রহ আপনা হইতে সরিয়া গিয়া অখণ্ডেশ্বর ওঙ্কার-বিগ্রহের জন্য স্থান করিয়া দিবেন। সে জন্য তোমাদের বিন্দুমাত্র চেষ্টা বা প্রচার শক্তির অপব্যয় করিতে হইবে না। কিন্তু সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধন-রুচি সদ্ব্যক্তিদিগকে নিজেদের উপাসনায় টানিয়া আনিয়া নির্ব্বিরোধ মিলন-ভাব ও প্রেম-সৃষ্টি যে তোমাদের আজই

করিয়া নিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাত্র ও ঐক্য কখনও আসিবে না, আসিবে প্রেমময় হৃদয় লইয়া সকলের সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া।

কৃত্রিম উপায়ে দীক্ষা-দান

"অবশ্য, একান্তই যখন চাহিতেছ, তখন আমি কিছুদিনের মধ্যে তোমাদের অঞ্চলে যাইব এবং যাহারা মনে ও প্রাণে আমার মন্ত্র, আমার ধর্ম্ম, আমার আদর্শ ও আমার কর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য স্বভাবত উন্মুখ হইয়া আছে, তাহাদের আমি দীক্ষাদানের দ্বারা আপন করিয়া লইব। দীক্ষা গ্রহণের জন্য তোমরা কাহাকেও আকর্ষিত করিতে চেষ্টা করিও না, কাহারও নিকটে আমার গুণ-মহিমা বর্ণনা করিয়া তাহাকে সাময়িক আবেশে সম্মোহিত করিও না। দীক্ষা বিষয়টা এতই গুরুতর যে, ইহার মধ্যে কোনও প্রকার কৃত্রিমতারই স্থান থাকা উচিত নহে। অনেক সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতারাই এই কথাটা তেমন ভাবে বুঝেন নাই। এমন সম্প্রদায়ও জগতে আছে বা ছিল, যাহাতে প্রবেশের জন্য অন্তরের বিশ্বাস ও সংস্কার-সমূহ পরিবর্ত্তনের কোনও দাবী নাই, সম্প্রদায়ের মধ্যে একবার ঢুকিয়া পড়িতে পারিলেই হইল এবং সম্প্রদায়ের বাহ্য আচারগুলি যত্নপূর্ব্বক নিখুঁত-রূপে পালন করিয়া যাইতে পারিলেই হইল। এই সব সম্প্রদায়ীদের বিশ্বাস এই যে, একবার এই সম্প্রদায়ের ভিতরে তোমাকে ঢুকাইয়া নিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পারিলে তুমি তোমার চিরপোষিত সংস্কার-সমূহকে লইয়া অন্তরে অন্তরে যত লড়াইতেই পড় না কেন, তোমার পুত্র, পৌত্র-প্রপৌত্র একেবারে খাঁটি সম্প্রদায়ীই হইবে, বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মনকে নিজেদের মতন করিয়া গড়িয়া লওয়া যাইবে এবং ইহার ফলে তাহাকে ভুলাইয়া দেওয়া যাইবে যে, সে শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ বা ভৃগু প্রভৃতি যে ঋষির বংশধর, তাঁহাদের ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কত বড় ক্ষতি, কত বড় বিপর্য্যয়, কত বড় মনস্তাপের বিষয়। আমি কিন্তু আব্রহ্মস্তম্ব-ব্যাপী ঐক্যের বিশাল স্বপ্ন দেখিয়াও কাহারও ঐতিহ্য লোপ করিয়া দিবার কল্পনা করি না এবং যার যে সংস্কার প্রবল, তাহাকে গায়ের জোরে দাবাইয়া রাখিয়া যে কোনও ব্যক্তিকে নিজ দীক্ষাদান করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের হট্টগোলে ফেলিয়া দিতে চাহি না। আমি চাহি এই যে, যে আমাকে সত্যিকারের আপন বলিয়া বুঝিবে, সে আমার বক্ষে ঝাঁপ দিয়া আসুক, আমাকে ভালবাসে বলিয়াই প্রেমের তাগিদে সে নিজের চেষ্টায় আমার মতন হইতে চেষ্টা করিবে, জোর-জুলুমের কোনও প্রয়োজনই পড়িবে না।"

ভাবী বিপর্য্যয়

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বরকামতা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা উৎসবের আনন্দ করিতেছ। আমি যদি পারিতাম, তোমাদের এই উৎসবের আনন্দে আসিয়া নিশ্চয়ই যোগ দিতাম। জগতে উৎসবই বা কে না চাহে, আনন্দই বা কে না চাহে? কিন্তু দেশের অতীতের দিনগুলি স্মরণ করিয়া প্রাণে অনুক্ষণ বেদনা অনুভব করিতেছি, বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়া ততোধিক মর্ম্মজ্বালা অনুভব করিতেছি, তাই অনাগত মহামারীকে ঠেকাইবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি। তোমরা আমরা কেহই যাহা কল্পনা করি না, আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক জগতে এমন অকল্পনীয় বিপর্য্যয় সমূহ অতি দ্রুত বেগে ধাবিত হইয়া আসিতেছে। জানি এই বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াই নবীন ভারত গড়িয়া তুলিবার উপাদান-সমূহ সংগৃহীত হইবে কিন্তু বিপর্য্যয়ের ভয়াবহতা চিন্তা করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। জাতির জীবনে উৎসবের প্রয়োজন আছে, আনন্দের অবসর আছে, কিন্তু ভাবী অমঙ্গলগুলির কথা ভাবিয়া উহা বিস্বাদ, আলুনি, তিক্ত বোধ হইতেছে। তাই, আমি হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তোমাদের লোভনীয় উৎসবে যোগদান করিতে পারি নাই।

বিবাহাদি উৎসবে জাতিবুদ্ধি দূরের উপায়

"তবে উৎসব করিতে গিয়াও তোমরা তাহার মধ্য দিয়া

ভাবী বিপর্য্যয়ের বিরুদ্ধে এক প্রকারের যুদ্ধ করিতে পার। বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি প্রত্যেক উৎসবে তোমরা নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা রাখিয়াও জাতিভেদের বিলোপ সাধনের চেষ্টা দ্বারা ভাবী বিপর্য্যয়কে লড়িবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পার। ব্রাহ্মণের পাশে বসিয়া চণ্ডালে প্রসাদ লইতেছে, ইহা ত' আমি গ্রামের পর গ্রামে সম্ভব করিয়া যাইতেছি। কিন্তু আমার সে উৎসব হরিনামের উৎসব, উপাসনার উৎসব, ভগবানের সাথে জীবের প্রেম-নিবেদনের ও প্রেমানুশীলনের উৎসব। সেই উৎসবে যাহা সহজে বা স্বাভাবিক ভাবে সম্ভব হইতেছে, তোমাদের উৎসবে তাহা হইবে না। এজন্য বেগ পাইতে হইবে। কত টিকী আস্ফালিত হইবে, কত কণ্ঠী গর্জ্জিয়া উঠিবে, কত জনের ললাটের তিলক ধ্বক্‌ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া মদন-ভস্মের পরিবর্ত্তে তোমাদিগকেই সবংশে ছাই করিয়া ফেলিতে চাহিবে। এজন্য কৌশল অবলম্বন করিতে পার। সে কৌশল অপকৌশল হইবে না, তবে কুটিলতা হইবে, ইহা সত্য। অন্য কোনও গতি না থাকিলে ইহাই করিতে হইবে। বিবাহই হউক, পৈতাই হউক, শ্রাদ্ধই হউক, অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রত্যেকে নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী করিয়া যাইবে কিন্তু সঙ্গে রাখিবে একটী উপাসনা এবং একটী উদয়াস্ত হরির্ব কীর্ত্তন। কীর্ত্তনের মধু-মুখরিত দিব্যগুঞ্জন অনেকের প্রাণের ভেদবুদ্ধি বিনাশ করিবে এবং তাহার ফলে দেখিবে, নিতান্ত গোঁড়া ও সম্মানাভিমানী ব্যক্তিরা ছাড়া সকলেই উচ্চ নীচ ভেদাভেদ

বিস্মৃত হইয়া এক পংক্তিতে এক পরিবেশনে মহানন্দে পরিবেশিত বস্তু মাত্রকেই প্রসাদ-জ্ঞানে পবিত্র মনে গ্রহণ করিতেছেন।

মৎস্য ও মাংসকে প্রসাদ জ্ঞান করা যায় কিনা

"অবশ্য, এই ক্ষেত্রে আরও একটা প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগিবে। তাহা এই যে, বাঙ্গালীর বিবাহে, পৈতায় ও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতেরা ত' মাছ-মাংস খায়। প্রতিবেশী এক প্রদেশের শ্রাদ্ধে ত' কচ্ছপ-মাংস না হইলেই নাকি চলে না। কীর্ত্তনোপাসনাদি সমন্বিত সাত্ত্বিক ব্যাপারের পরে প্রসাদ-রূপে কাহারও পক্ষে কি মৎস্য-মাংসাদি সেবন সম্ভব হইবে, না, উচিত হইবে? ইহার মীমাংসা এই যে, রুচি, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি এবং বংশানুক্রমহেতু যাহার পক্ষে যে বস্তু খাদ্য বলিয়া সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার পক্ষে সেই বস্তু ভগবানে নিবেদন করিতে কোনও বাধা নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে তাহাকে প্রসাদ বলিয়া জ্ঞান করাও অসম্ভব হইতে পারে না। কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তু সেবন হয়ত ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ যদি দয়া করিয়া সেই নিষিদ্ধ বস্তুই সেবন করেন, তবে তাঁহার জাতি-পাতের কোনও আশঙ্কা নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা সমাজ ভগবানের উদ্দেশ্যে নানাবিধ বস্তু ষোড়শোপচারে নিবেদন করিয়া থাকেন

এবং এই উপচার-নির্ব্বাচনে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রিয় ভোজ্য বস্তুকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। অতএব, কোনও একজন বিষ্ণুপাসকের বা একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে অপরাধজনক প্রতীয়মান হইলেও, যাহাদের মৎস্য বা মাংস প্রিয় খাদ্য, তাঁহাদের পক্ষে সেই বস্তুকে আহারীয়-রূপে গ্রহণের পূর্ব্বে তৎসম্পর্কে ঈশ্বরার্পণ-ক্রিয়া করা এবং তাহাতে প্রসাদ জ্ঞান অপরাধ ত' নহেই, বরঞ্চ একান্ত আবশ্যক। বিবাহাদি ব্যাপার নিতান্তই সামাজিক। এই সকল ব্যাপারে খাদ্যবস্তুর বিনিশ্চয় নিমন্ত্রয়িতার ইচ্ছানুসারে না হইয়া নিমন্ত্রিতদের রুচি, তৃপ্তি ও সন্তোষের দিকে তাকাইয়া হইয়া থাকে।

সাত্ত্বিক উৎসব-সমূহে প্রসাদের উপচার

"কিন্তু যেখানে মহাপুরুষদের আবির্ভাব বা তিরোভাব-সম্পর্কিত উৎসব হইতেছে, কিম্বা কোনও বিশিষ্ট মহাপুরুষের শুভাগমন উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে, যেখানে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মের টানে আনিয়া এক করিবার জন্য উৎসবানুষ্ঠান হইতেছে অথবা সমবেত উপাসনা, উদয়াস্ত কীর্ত্তন, অহোরাত্র কীর্ত্তন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে ভক্ত-সমাগম হইতেছে, সেই স্থানে নিবেদিতব্য বস্তু এমন হওয়া দরকার, যাহা সম্পর্কে জগতের কোনও সম্প্রদায়ের লোকের

ধর্ম্মবোধগত কোনও প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। এই সব স্থলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সম্পর্কে কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে জগতের সকল মিলন-কামী প্রেমিক ব্যক্তিদের ব্যাপক শুভাগমনের বিরাট সম্ভাবনার সম্পর্কে। এই সব স্থলে সাত্ত্বিক শুদ্ধাচারের অনুমোদিত ভাবে প্রসাদের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।"

উপদেশ-সমূহকে চিত্তাকর্ষক কর

ঢাকা জেলান্তর্গত বারদী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা যাহাকেই যেই উপদেশ দাও, সেই উপদেশ-সমূহকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিও। শুধু কথা বলিয়া গেলেই ত' চলিবে না, তাহাকে মানবের মর্ম্মে প্রবেশ করাইতে হইবে, তাহার প্রভাবে তাহার মেরুমজ্জার অভ্যন্তরে নবজীবনের রসায়ন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহা দ্বারা তাহার চরিত্রের ও ভাবধারার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহার স্বার্থবুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিয়া পরার্থে সর্ব্বস্বোৎসর্গের কামনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এ কাজ সহজ নহে। কিন্তু কঠিন বলিয়াই তাহা পরিহার করিয়া যাইতে পার না। উপদেশ যেই বিষয়ে দিবে, নিজ জীবনে সেই বিষয়ের অকপট অনুশীলনের চেষ্টা আগে করিতে হইবে। অনুশীলনহীন উপদেশ-ভাষণ হবির্ব্বর্জ্জিত যজ্ঞানুষ্ঠানের

ন্যায় হাস্যকর। দেশে উপদেষ্টার অভাব নাই, অভাব ত' শুধু উপদেশ-পালনকারীর। ভারতের প্রত্যেকটী পল্লী অতীতের কত সাধক-সাধিকার পূত চরণধূলি বহন করিতেছে কিন্তু আমরা কথাই শুধু বলি, কাজ করি না বলিয়াই ত' তাঁহাদের সমগ্র জীবনের সাধনাকে পরবর্ত্তীদের জীবনে বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখিতে পাই না। প্রয়োজন প্রাণভরা দরদ লইয়া মহতের বাণীর অনুসরণ এবং তারপরে অন্যকে সৎপথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস। এইরূপ হইলে উপদেশ চিত্তাকর্ষক হয়।"

জগদ্ধিতার্থে আত্মদান

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কাশীপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগদ্ধিতার্থে আত্মদানই প্রকৃত তপস্যা। প্রথমে সঙ্কল্প কর,—'পরনিন্দা বর্জ্জন করিব, পরপীড়ন ত্যাগ করিব।' এই সঙ্কল্প মাত্র নিবৃত্তিমূলক। এই সঙ্কল্পে সুস্থির হইয়া সর্ব্বপ্রথম অন্তরের পরনিন্দা-বর্দ্ধিকা বৃত্তিগুলিকে সংযত, বর্জ্জিত ও উৎপাটিত কর। তৎপরে সঙ্কল্প কর,—'জগতের হিতে অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন দিব, আত্মসুখের পানে তাকাইব না, নিজসুখ-প্রমত্ততায় সম্মোহিত হইব না, নিজেকে তিলে তিলে পলে পলে পরহিতার্থে ক্ষয়িত করিয়া মানবজন্ম গ্রহণের সার্থকতা সম্পাদন করিব।'

আত্মদান ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

"কিন্তু নিজেকে সম্যগ্ রূপে ঈশ্বরে সমর্পণই হইতেছে বিশুদ্ধ ভাবে আত্মদানের শ্রেষ্ঠ প্রণালী। অনেকেই ত' আমরা জগতের হিতে জীবনোৎসর্গের কামনা অন্তরে পোষণ করিতেছি, কিন্তু কয়জনের উৎসর্গ প্রকৃতই উৎসর্গ হইতেছে? ব্যক্তিগত সুখলোভ, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠাশা, ব্যক্তিগত প্রাধান্যপ্রিয়তা প্রচ্ছন্ন ভাবে উৎসর্গ-প্রয়াসের সাথে বিলগ্ন হইয়া এমন ভাবে রহিয়া যাইতেছে, যাহাতে সব-কিছু দিয়া ফেলিয়াও কিছুই আমাদের দেওয়া হইতেছে না, ত্যাগের পূজা করিতে যাইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে নিজ সুখের পূজাই করিয়া ফেলিতেছি। দেবী দশভুজার ষোড়শোপচার পূজায়োজন শেষ পর্য্যন্ত ছুঁচোর সেবায় লাগিয়া যাইতেছে। এই আক্ষেপ হইতে যদি নিজেকে বাঁচাইতে চাহ, তাহা হইলে অবিলম্বে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেকে সম্যগ্ রূপে ঈশ্বরে সমর্পণ কর।

আত্ম-সমর্পণের ভূমিকা

"প্রশ্ন করিবে,—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের পন্থা কি? সেই পন্থা হইতেছে, অবিরাম আত্ম-সমর্পণের পবিত্র মূর্ত্তিকে ধ্যান করিয়া যাওয়া। যে তাঁর কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমায়, তাহার সকল দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যায়। দুশ্চিন্তাবর্জ্জিত ব্যক্তির ন্যায় সুখী ব্যক্তি ত্রিজগতে আর কে আছে? পরিপূর্ণ ভাবে নিশ্চিন্ত

ব্যক্তিই অপর একজন নিশ্চিন্ত ব্যক্তির সমকক্ষ, অপর কেহই তাহা নহে। শিশু মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমায়, জগতের সহস্র উদ্বেগ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। সেই শিশুটীর মত নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হওয়ার মত সৌভাগ্য যে জগতে আর কিছু হইতে পারে না, অনুদিন অনুক্ষণ এই চিন্তা করিতে থাকাই হইতেছে আত্মসমর্পণের ভূমিকা।

আত্ম-সমর্পণের পন্থা

"ভগবানই যে সর্ব্বজীবের সর্ব্বকালের একমাত্র আশ্রয়, তৎপরে এই চিন্তা অবিরাম করিতে থাকিবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ঐ রাতুল চরণে লুটাইয়া পড়িতে একদিন হইবেই হইবে। কেননা, জীবের উনিই শাশ্বত শরণ এবং একমাত্র গতি। এইরূপ চিন্তা দিবা-রাত্রি করিতে করিতে সহসা একদিন লক্ষ্য করিবে যে, নিজের নিজত্বকে অস্বীকার করিয়া ভগবানকেই একমাত্র নিজ জন বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ দেহ, মন প্রাণ, বুদ্ধি, চিত্ত এবং আত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যাকুলতা ও আত্মসমর্পণ

"আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুলতাই হইতেছে আত্মসমর্পণের অর্দ্ধেক। যে যাহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহা পাওয়ার দেরী নিতান্তই অল্প। একবার চিত্ত ব্যাকুল

হইয়া উঠিলে সেই ব্যাকুলতাকে দিনের পর দিন প্রখরতর, ব্যাপকতর, গভীরতর করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। তাহার কৌশল হইতেছে ব্যাকুল-হৃদয় আত্ম-সমর্পণেচ্ছু সজ্জন-সাধু-সজ্জনের স্নিগ্ধ-কোমল-কারী সঙ্গ লাভ। এক শোকার্ত্ত অপর শোকার্ত্তকে দেখিলে উভয়েরই শোকাবেগ অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়। একটী ব্যাকুলী অপর ব্যাকুলীকে দেখিলেও তদ্রূপ উভয়েরই ব্যাকুলতা অতিমাত্রায় বাড়ে। এই জন্যই এই সময়ে ব্যাকুল-হৃদয় প্রেমী ব্যক্তির সঙ্গ খুঁজিতে হয়।

ভক্তপদরেণু ও প্রসাদের মহিমা

"যিনি সম্যক্-রূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন, তাঁহার পবিত্র চরণের রেণুকণা শিরে ধারণ করিলেও এই ব্যাকুলতা আসে। আমাদের দেশে একটী মানুষের পদধূলি অপর মানুষের পক্ষে নিবার যে প্রথা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার মূল এইখানে। ভক্তের উচ্ছিষ্ট সেবনকেও বৈষ্ণব মহাজনেরা এই কারণেই এত কৌলীন্য প্রদান করিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে কাহারও উচ্ছিষ্ট-সেবন সম্পর্কে উৎসাহিত করিতে চাহি না। ভক্ত ব্যক্তির স্পৃষ্ট যে-কোনও বস্তুই তোমার ভিতরে ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা প্রবহমানা করিতে যথেষ্ট কার্য্যকর, জানিও। পত্র, পুষ্প, ফল, দূর্ব্বা, বিল্বদল, তুলসী, চন্দন-কণা বা হরীতকীর টুকরা, যাহাই তাঁহারা দয়া

করিয়া স্পর্শ করিয়া দেন, তাহারই সঙ্গ হইতে অন্তরে অহৈতুকী প্রেমভক্তির উদ্ভব ঘটিতে পারে।

মহাপুরুষের সঙ্গ ও জীবের মঙ্গল

"ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ-কারী সাধক ভক্ত বা মহাপুরুষ দেখিলে তোমরা তাঁহাকে অমনি চলিয়া যাইতে দিও না। তাঁহাদের পবিত্র পদধূলি যাহাতে তোমাদের অন্তরের ফল্গুধারাকে মুক্ত-মন্দাকিনীর অজস্র প্রবাহে পরিণত করিয়া দিয়া যাইতে পারে, তদনুকূল ভাবে তাঁহাদের সঙ্গ কর, তদনুকূল ভাবে লোককে তাঁহাদের সঙ্গ-লাভে প্রোৎসাহিত কর। জীবের প্রতি অহেতুক করুণা হেতু প্রকৃত মহাপুরুষেরা নিজ প্রয়োজন কিছুমাত্র না থাকিলেও জীবের দুয়ারে দুয়ারে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। তাঁহাদের সেই পবিত্র পরিক্রমাকে বৃহত্তম সংখ্যায় জীবকুলের পক্ষে মঙ্গল-দায়ক করিবার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হও।"

দীক্ষার জন্য আত্ম-প্রস্তুতি

কুমিল্লা জেলান্তর্গত নয়াদিল-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যাহারা আমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা,

আদর্শ ও চিন্তা-ধারার সহিত আগে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত করিয়া তোল। উক্ত আদর্শের সমর্থক পবিত্র ভাবগুলির সহিত নিবিড় পরিচয় না ঘটিলে এবং নিজের অতীত চিন্তা-প্রণালীর সহিত তাহাদের সংস্পর্শ স্থাপনের দ্বারা বিগত জীবন-ধারার সহিত ভাবী জীবন-ধারার সামঞ্জস্য স্থাপনের সোপানগুলি নির্ম্মিত না হইলে দীক্ষাগ্রহণ অনেকের পক্ষে একটা চির প্রচলিত প্রথার অন্ধ দাসত্বে মাত্র পরিণত হয়, ইহার পিছনে যে কত বড় একটা মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা আর নয়নগোচর হয়ই না। সুতরাং দীক্ষা-প্রার্থীদিগকে দীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্যই মহত্তম আদর্শের সহিত পরিচিত করিয়া লইতে হইবে। ব্যাকুল দীক্ষার্থী যদি অন্যান্য দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া প্রাপ্ত মন্ত্রে নিঃশেষে নিজেকে নিয়োগ করে, তাহা হইলে এই আত্মবিনিয়োগ হইতেই সকল আধ্যাত্মিক কুশলের উৎপত্তি ঘটিতে পারে, ইহা সত্য। কিন্তু সাধনের অনুকূল মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিবার জন্যই নির্দ্দিষ্ট আদর্শের পরিপুষ্টিমূলক সাহিত্যের সংশ্রব আবশ্যক।"

গর্ভবতী রমণী সম্মানার্হা

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত নেত্রকোণা-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার কিরূপ হইবে, তাহা স্মরণ কর। সে তাহার গর্ভে একটি ভাবী

মানবকে বহন করিতেছে। তাহাকে সম্মান করিয়া তুমি দুইটি মানবকে এক সঙ্গে সম্মান করিতেছ। গর্ভবতী রমণীকে দেখিলে নিজের জননীকে স্মরণ করিও এবং সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাহার প্রতি সসম্ভ্রম ও সেবাব্রত থাকিও। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কটূক্তি, পরুষ-ভাষণ, তর্জ্জন-গর্জ্জন ও রুক্ষ ব্যবহার যে করে, তাহাকে অত্যন্ত নীচবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। নারীমাত্রকেই সম্মান করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, তন্মধ্যে গর্ভবতী রমণী সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হা।"

দীক্ষা-গ্রহণের দায়িত্ব

ময়মনসিংহ জেলার পূবাইল-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীক্ষা পাইয়াছ, না নবজীবন পাইয়াছ। এই জীবনে তোমার প্রধানতম লক্ষ্য হইবে এই যে, কোনও প্রকারে যেন দিবা বা রজনীর একটী মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট না হইতে পারে। দীক্ষা পাইবার পরে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ব্যাপার-সমূহ লইয়া গুরুদেবকে বিব্রত ও বিরক্ত করা বড়ই দোষাবহ। কিন্তু যাহাতে সজ্জীবন-যাপনে, মহদ্‌ব্রত-সাধনে, তপস্যায় আত্মবিনিয়োজনে উৎসাহ পাও, তজ্জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার চরণদর্শন অতীব হিতকর এবং প্রশস্য। গুরুদেব সাধন-পন্থা বলিয়া দিয়াছেন, অকপট আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছেন, নিজের দীর্ঘকাল-সঞ্চিত তপস্যার অতি সূক্ষ্ম প্রবাহ তোমার ভিতরে

অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে তোমার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, যাহাতে তুমি সেই সাধন-পন্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন কেবল অগ্রসর হইয়া যাইতে পার। দীক্ষা পাইয়া ফেলিয়াছ, আর ত' তোমার পিছনে পড়িয়া থাকার উপায় নাই! যাহার অভাবে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছিলে না, সেই পরম পাথেয় পাইবার পরে আর কেন আলস্যে কাল কর্ত্তন করিবে? অন্ধের যষ্টি পাইয়াছ, তৃষ্ণার জল মিলিয়াছে, অন্ধকারাবৃত গহন পথের মাঝে অনির্ব্বাণ আলোক-বর্ত্তিকা লাভ করিয়াছ, তবে আর হেলায় খেলায় কেন কাল কাটাইবে? দিবারাত্রির ভিতরে যত অধিক সময় পার, সাধন-প্রয়াসে নিয়োজিত কর, অপর সময়টুকু সাধনে রুচি-বর্দ্ধক, ঈশ্বরে বিশ্বাস-সঞ্চারক, নামে নিষ্ঠার উৎপাদক সৎ-সাহিত্যের সেবা কর। নিজে নিজে পড় এবং অপর দশ জনকে পড়িয়া শুনাও। নিজের আগ্রহ, আকুলতা, আন্তরিকতা বর্দ্ধিত কর, অপর দশ জনকেও ভগবৎ-সাধনে আগ্রহী, রুচিমন্ত ও ব্যাকুল কর। অনায়ত্ত অতীত এবং অলভ্য অনাগতের প্রতি উদাসীন হইয়া ভগবানের পরম পবিত্র নামে এমন সুগভীর সেবা জমাও যেন সকল অতীত ও সকল অনাগতের পরিধি অতিক্রম করিয়া তোমার নিজের এবং বিশ্বজগতের পরমকল্যাণ সুনিশ্চিত হইয়া যায়। জানিও, এই পার্থিব দেহ দুইটী দিনের তরে, স্বল্প-সময়েই এই দেহটীর

বাতি ফুৎকারে নিবিয়া যাইবে। তাহার আগে যাহাতে নিজের হিসাবের খাতা জমার অঙ্কে পূর্ণ করিয়া লইতে পার, তাহার জন্য প্রাণপণে যত্নশীল হও। জানিও, ইহাই তোমার দীক্ষা-গ্রহণের প্রধানতম দায়িত্ব। দীক্ষা শুধু মন্ত্র নেওয়াই নহে, পন্থা-বিশেষের আশ্রয় লওয়াই নহে, সম্প্রদায়-বিশেষের মণ্ডলী-মধ্যে প্রবেশই নহে, পরন্তু জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য অঙ্গীকার প্রদান, জীবনকে সার্থক করিবার জন্য নিজেকে সাধনার অগ্নিতে তিলে তিলে অনুক্ষণ আহুতীকৃত করিবার প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ।

ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মোৎসর্গ উন্নতি ও সভ্যতার মানদণ্ড

"তুমি যেই পরিবেশ এবং যেই সম্প্রদায়ের গণ্ডীমধ্য হইতে আসিয়া আমার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছ, তোমার নিজের উক্তিতেই দেখিতেছি, সেই পরিবেশে এবং সেই সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ সমাদর নাই। আমি মনে করি যে, অসাধারণ মহান্ পুরুষদের সম্পর্কে তোমার এই উক্তিটি কথিত হয় নাই, সমাজের সাধারণ লোকগুলি সম্পর্কেই হয়ত তুমি কথাটি বলিয়াছ। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রতি রুচি ও সম্মাননাবোধ একটী প্রকৃত উন্নতিশীল সমাজ-গঠনের পক্ষে অতীব আবশ্যকীয় বস্তু। ব্রহ্মচর্য্যকে হেয় জ্ঞান করিয়া সভ্যতার উচ্চ কোটি দাবী করিতে যাওয়া এক উপহাসাস্পদ

ব্যাপার। পরহিতে আত্মদান আর আত্মোৎকর্ষের জন্য নিজ সংযমশক্তিকে বিপুল ভাবে প্রবর্দ্ধিত করা প্রকৃত সভ্য এবং উন্নত সমাজের দুইটি উৎকৃষ্ট মানদণ্ড।

স্বসমাজের লোকদের মনের গহনে প্রবেশ কর

"সুতরাং তুমি যেই সমাজে জন্মিয়াছ, এবং লালিত পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছ, সেই সমাজের কিশোর এবং যুবকদের মধ্যে প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত সভ্যতা ও প্রকৃত উৎকর্ষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যত্নবান্ হও। আমরা ভিন্ন সমাজের লোকেরা গিয়া কথা বলিলে হয়ত তাহারা সাগ্রহে শুনিবে, তোমার এই অনুমান একেবারেই অমূলক নহে। স্বসমাজের তুমি এসব কথা কহিতে গেলে তাহারা শুনিতে আগ্রহী হইবে না, তোমার এই অনুমানও ভুল না হইতে পারে। কিন্তু তুমি নিজে ইহাদিগকে কথা শুনাইতে গেলে সেই কথাগুলির পরোক্ষ প্রভাব যে আবার তোমার মনের উপরেও পড়িবে এবং তাহার ফল তোমার পক্ষেও শুভময় হইবে, এই কথাটি বাবা ভুলিও না। স্বসমাজের লোকের সেবায় আত্মনিয়োগ করা মানুষের স্বভাবজাত অধিকার। সর্ব্বসমাজের লোকের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দেওয়া তপঃসঞ্জাত অধিকার। যাহা তোমার স্বাভাবিক

অধিকার, তাহা হইতে নিজেকে কেন বঞ্চিত রাখিবে? স্বসমাজের লোকদের মনের গহনে প্রবেশ কর এবং এ কাজটী দ্রুত সুরু কর।

শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধনের প্রয়োজন নাই

" আমি তোমার গুরু হইয়াছি বলিয়া তোমাদের সমাজের সকল লোকের গুরু আমাকেই হইতে হইবে, এইরূপ অভিপ্রায় নিয়া কোনও কার্য্য কদাপি করিও না। তুমি আমার শিষ্য হইতে পারিয়াছ, তোমার বিশেষ কোনও মনোভঙ্গির দরুন, যেই মনোভঙ্গী বা চিন্তা-প্রণালী হইতে তোমার সমাজের অধিকাংশ লোক স্বাভাবিক কারণেই বঞ্চিত। তাহাদিগকে দলে দলে আনিয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য আগ্রহী করিলে হয়ত হঠাৎ কোনও নূতন সামাজিক সংঘর্ষ সৃষ্টির কারণ আবির্ভূত হইয়া যাইবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সামরিক শক্তি হাতে লইয়া যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিবেন, এমন ব্যক্তিদের পক্ষে এই সংঘর্ষকে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। বরং কখনো কখনো এই জাতীয় সংঘর্ষ তাঁহাদের ধর্ম্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যাগত শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু আমার ধর্ম্ম স্বভাবের ধর্ম্ম, জোর-জবরদস্তির নয়। স্বভাবের পথে মানুষ আস্তে আস্তে আপনা আপনি রূপান্তরিত হইবে, কৃত্রিম প্রচেষ্টার পথে নহে, ইহাই আমার

কাম্য। সুতরাং তোমার প্রাণ ব্যাকুল হইলেও তোমাকে সুস্পষ্ট অনুশাসন জানাইতেছি যে, আমার শিষ্যদল বর্দ্ধনের জন্য কোনও চেষ্টা করিও না। যে মতে যে পথে থাকিয়া মানুষ প্রকৃত মানুষ হইবে, সেই মতই আমার মত, সেই পথই আমার পথ। সুতরাং কেহ যদি একটা পথ কিছু পাইয়া থাকে, তবে তাহাকে তাহার মতেই থাকিতে দাও, তাহার পথেই চলিতে দাও, আমার শিষ্যসংখ্যা-বর্দ্ধনের কোনও প্রয়োজন সেখানে নাই।

নূতন পৃথিবী গড়িবার আয়োজন চাই

"তুমি স্বসমাজের কিশোর ও যুবকদের মধ্যে কাজ করিতে গিয়া বারংবার বিফল-মনোরথ হইতেছ বলিয়াই ত' তোমাকে উহাদের ভিতরেই আরও উদ্যম সহকারে কাজে নামিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দিব। ভিন্ন সমাজের কিশোর ও যুবকেরা তোমার কথা কান পাতিয়া শুনিতেছে শুনিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি এবং ইহাদের ভিতরেও তোমাকে কাজ চালাইয়া যাইতে উৎসাহ দিতে চাহিতেছি। যে জমি উর্ব্বর, তাহাতে আবাদ করিতে সকলেরই ভাল লাগে। কিন্তু যে জমি অনুর্ব্বর, তাহাতে আবাদ করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে পার না। আমি একাকী ব্রহ্মাণ্ডময় কাজ করিয়া বেড়াইতে পারি না বলিয়াই ত' তোমাদের প্রতিজনকে কাজে লাগিয়া থাকিতে দেখিতে

চাহিতেছি। যে যেখানে আছ, সে সেখানেই কাজ চালু রাখ। প্রত্যেকটী কিশোরের সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া মিশিতে চেষ্টা কর। তাহার আপন হও, বিশ্বাস-ভাজন হও। তারপরে তাহার নয়ন-সমক্ষে এক গৌরবদীপ্ত সুন্দর ও পবিত্র জীবনের আলেখ্য স্থাপন কর। এই আলেখ্য দেখিয়া সে উৎসাহিত হউক, মানুষের মতন মানুষ হইবার জন্য উদ্দীপিত হইয়া উঠুক এবং ব্রহ্মচর্য্য-পুষ্ট বাহু-শাখ উত্তোলন করিয়া নিজের ভাগ্য, দেশের ভাগ্য, জগতের ভাগ্য নির্ম্মাণ করিবার কাজে লাগিয়া যাউক। নূতন পৃথিবী গড়িবার আজ আয়োজন চাই।"

মানুষ দেখিলে মানুষ হয়

যশোহর জেলান্তর্গত নড়াইল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একটা মানুষকে শুধু চোখে দেখিলে অপর মানুষের চরিত্রের পরিবর্ত্তন হয়, ইহা একটা অসম্ভব কথা নহে। এখনও এই দেশে অনেক মহৎ ব্যক্তি নিজেদের উপদেশের শক্তি অপেক্ষা শুধু দর্শন-দানের শক্তি দিয়া মানবের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছেন। এই পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ মানুষের যৌন জীবনের উপর দিয়া বিশেষ ভাবে ঘটিতেছে বলিয়া তাহার ইতিহাস সর্ব্বসাধারণের গোচর হইবার সম্ভাবনা অল্প, এই মাত্র। গোপনে পরনারী-সেবা

করিয়া করিয়া ইহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইবার পরে একদা এক মহৎ ব্যক্তির চরণ-দর্শন বা চরণ-স্পর্শ করিয়া জীবনের অন্তঃপুরে একেবারে ত্যাগের বহ্নিমালা সহসা বিশ্বগ্রাসিনী দীপ্তি লইয়া জ্বলিয়া উঠিল, ইহা বিরল নহে। গোপনে যুবক-বন্ধুর সহিত গৃহত্যাগ করিবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া পলায়নের পূর্ব্বক্ষণে গৃহ-পরিজনের হাতে ধরা পড়িয়া নিদারুণ প্রহারের পরেও যে যুবতী সৎভাবে চলিতে স্বীকৃতা হয় নাই, একদা এক মহৎ ব্যক্তির স্বল্প কালের সান্নিধ্য লাভের পরে সেও সংযমের বাঁধনে কোমর বাঁধিতে পারে, মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ধীর স্থির পবিত্র জীবন যাপনের সঙ্কল্প করিতে পারে, জীবনে স্থির অচঞ্চল যেই সাধন-দীপ্ত অবস্থার প্রতি ক্ষণকালের জন্য রুচি অনুভব করে নাই, সেই স্বর্গীয় জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ হইতে পারে। এরূপ ঘটনা আজও ঘটিতেছে। তোমরা এইরূপ মানুষ হইতে চেষ্টা কর। মানুষ দেখিলে মানুষ হয়। চতুর্দ্দিকে কেবল অমানুষ দেখিতে দেখিতে কত মানুষ অমানুষ হইয়া যাইতেছে। তোমরা নিজেদের ভিতরে এমন শক্তির সঞ্চার কর, যেন তোমাদের দেখিয়া শত শত অমানুষ মানুষ হইতে পারে।

"কিন্তু এই শক্তি আসিবে কিসে জানো? সর্ব্বশক্তিমানের চরণে নিজেকে সম্যক্ সমর্পণ করিয়া এই শক্তি আসিবে। এই শক্তি আসিবে পরমপবিত্রতার স্বভাব-সৃষ্ট দীপ্তি লইয়া, যেই পবিত্রতা চর্চ্চা করিয়া, অনুশীলন করিয়া, অভ্যাস করিয়া

তবে চরিত্রে ফুটাইতে হয় না, সেই অনাবিল পবিত্রতার বিভা লইয়া।"

গুরু-ভ্রাতাদের মিলন

কুমিল্লা জেলান্তর্গত দৌলতগঞ্জ-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরু-ভ্রাতৃগণের মধ্যে আনন্দ-মুখর মিলন কখন সম্ভব হয় জানো? যখন গুরুতে থাকে সকলের প্রেমময় আত্মসমর্পণ, গুরুতে থাকে প্রাণের অকপট নিষ্ঠা, যখন নিজেকে এই গুরুর শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবার মধ্যে থাকে সুনির্ম্মল আত্মপ্রসাদ ও অনবদ্য আত্মতৃপ্তি। গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়াছি বলিয়া গুরুদেবের অন্যান্য শিষ্যরা গুরুভাই হইয়া গেলেন, ইহা একটা কথাই নহে। আনুগত্যে যদি আমি হই অতুলন, তবেই আমি গুরুর শিষ্য হইয়াছি বলিয়া পরিচয় দিতে অধিকারী। প্রকাশ্য সম্মেলনে অনেক ব্যক্তিকে অপরাপর গুরু ভ্রাতাদের উপরে যথেষ্ট মোড়লী করিতে দেখা যায়, ইহারা একই গুরুর নিকট দীক্ষিত বলিয়া নিজেদিগকে গুরুভ্রাতা বলিয়া পরিচিত করে, কিন্তু সেই পরিচয় নিতান্তই ভিত্তিহীন, কেননা যেখানে গুরুদেবের নিকটে অকুণ্ঠ আনুগত্যের প্রয়োজন পড়ে, সেইখানে ইহারা হঠাৎ একেবারে সিংহ-সাহসিক বৈনাস্তিক হইয়া যায় এবং গুরুকে অস্বীকার করা একান্ত সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই

যে, আনুগত্যের আবশ্যকতা হলে গুরুদেবকে অস্বীকার করাই যদি প্রকৃষ্ট নীতি বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে এই সকল লোক আবার ব্যক্তি-বিশেষের সহিত গুরু-ভ্রাতার দাবীতে অন্তরঙ্গতাই বা স্থাপন করিতে যায় কেন অথবা অল্পবুদ্ধি, সরলবিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের উপরে মোড়লী করিবার দুষ্প্রবৃত্তিই বা পোষণ করে কেন? গুরুকে যে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে, গুরু-ভ্রাতাকে সত্যি সত্যি সে-ই ভালবাসিতে পারে। অপরের ভ্রাতৃত্ব-বোধ হয় মিথ্যাময়ী ছলনা নতুবা অন্তরের আত্মবঞ্চনা। তোমরা তোমাদের মিলনের আনন্দকে এই সব ছলনা ও বঞ্চনা দ্বারা নষ্ট হইতে দিও না। পরস্পরে মিলিয়া যাও, সর্ব্বকর্ম্মে এক হও, ঐক্যের মহাশক্তিতে জগৎ কাঁপাও, মূলদেশে ভক্তির ঐক্য বজায় রাখিয়া। শিখ জাতি কি এত বড় হইতে পারিত, গুরু নানককে নিয়া যদি তাহারা বিচার করিত? মুসলমান কি স্পেন হইতে কাবুল পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে জয় করিতে পারিত, মহম্মদের জীবন লইয়া যদি তাহারা দোষদৃষ্টি দিত? মূলে যেখানে ঐক্য নাই, সেখানে বাহিরে ত' সর্ব্বপ্রকার ঐক্য-প্রচেষ্টা কেবলই ভুলের শস্য বুনিবে, ভুলের ফসল কাটিবে, এক ভুল হইতে অপ্রভুল ভুলের সংখ্যা জগতে বাড়াইয়া চলিবে। তোমরা এই সকল বিষয়ে সাবধান হইও, কেননা তোমরা জাতি-গঠনে নামিয়াছ, ছেলেখেলা করিতে আস নাই।"

পুরোবর্ত্তীদের কার্য্যভার অনুবর্ত্তীদের গ্রহণীয়

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কোনও এক গ্রাম-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"তোমরা নিজেদের পল্লীতে একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কিন্তু এই আশ্রমটী স্থাপনের জন্য ছুটিয়া আবার আমারই যাইতে হইবে এবং ইহাকে কান্তি, পুষ্টি, বল, ঋদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি প্রদানের জন্য আমাকেই গিয়া শ্রম করিতে হইবে বলিয়া আমার উপরে যে দাবী করিয়াছ, তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। আমার উপরে তোমাদের দাবী করিবার অধিকার আছে, ইহা স্বীকার করি এবং এই অধিকার তোমরা তোমাদের আনুগত্যের দ্বারা যেমন অর্জ্জন করিয়াছ, আমিও তেমন স্নেহ দ্বারা তাহা দিয়াছি। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, আশ্রম বা এতজ্জাতীয় সৎপ্রতিষ্ঠান গড়িতে হইলে তোমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভরশীল হইতে হইবে তোমাদের আত্মশক্তির উপরে, আমার পক্ষে শারীরিক ভাবে সর্ব্বত্র একই সময়ে উপস্থিতি রক্ষা করাও এক কঠিন ব্যাপার। যাবজ্জীবন আমি সুকঠোর শ্রম করিয়া যাইতেছি এবং যখন যেখানে যে শ্রম দানিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে, একেবারে কুণ্ঠাহীন ঔদার্য্যে

সমগ্র মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়া তাহা করিয়াছি এবং করিতেছি। এই বিষয়ে দ্বিধার দৃষ্টান্ত আমার জীবনে একটী বারের জন্যও কেহ দেখাইতে পারিবে না। কিন্তু এই যে আমি শ্রম করিয়াছি, তাহা কি তোমাদের আত্ম-নির্ভরের শক্তিকে জাগাইবার জন্য নয়? তোমরা নিজ নিজ শক্তিতে বিশ্বাস করিতে শিখ এবং তোমাদের ভিতরে অনুক্ষণ আমি বিরাজমান রহিয়াছি, এই বিশ্বাসের শক্তি দিয়া অসাধ্য-সাধন কর। আমি চিরকালই কি এই পার্থিব দেহটা লইয়া থাকিব অথবা চিরকালই কি এ মাটির খাঁচাটা এত কর্মক্ষম থাকিবে যে, দেশ-দেশান্তরে তাহাকে নিয়া অবিরাম ছুটাছুটি চলিবে? আমার কর্ম্ম-জীবনের প্রথম অংশে দৈনিক আহারীয় এই দেহটার খুব অল্পই জুটিয়াছে এবং পথ চলিবার জন্য রেলগাড়ীর সহায়তা অতি অল্পই নেওয়া সম্ভব হইয়াছে, বাধ্য হইয়া বিশ পঁচিশ ত্রিশ মাইল রেল-রাস্তার পথ পদতলে পিষিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে। সেই দিনকার উৎপীড়নের ফলভোগ যখন এই শরীরটার উপরে সুরু হইবে, তখনও কি তোমরা প্রত্যাশা করিবে যে, আমি পুনরায় কচুরীপানা ঠেলিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইব, সারারাত্রি নিজ হাতে বৈঠা ঠেলিয়া ডিঙ্গি বাহিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া হতাশ, অবসন্ন, আত্মবিশ্বাসে অনিচ্ছুক নির্জ্জিত-সাহস যুবকগণের অন্তরের মলিনতা নাশ করিতে নবজীবনের দীপ্ত উৎসাহে

পুনরুজ্জীবিত করিতে যাইতে পারিব? সে কাজ করিবে তোমরা, যাহারা আমাকে জানিয়াছ, চিনিয়াছ, ভালবাসিয়াছ। সে কাজ করিবে তোমরা, যাহারা হৃদয়ের স্পন্দনে আমার বাণী শুনিতে পাও, শ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে আমার অন্তরের আস্বাদন কর। সে কাজ করিবে তোমরা, যাহারা একটী দিনের জন্য হইলেও আমার সঙ্গ করিয়া আমার মনোগত সকল অভিপ্রায়ের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইয়াছ। সে কাজ করিবে তোমরা, যাহাদের অধিকাংশ আমাকে চর্ম্মচক্ষে না দেখিলেও আমার ভাববাণীর প্রভাব নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিবার সুযোগ একবারটী হইলেও পাইয়াছ। পূর্ব্ববর্ত্তীরা এই ভাবেই নিজ নিজ কর্ম্মের গুরুভার অনুবর্ত্তীদের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া যান। তোমরা আজ আমারই স্কন্ধে নিত্য নূতন ভার অর্পণ করিয়া আমাকে অধিকতর বিব্রত করিবার চেষ্টা না করিয়া তোমাদের স্কন্ধে যে আমার স্কন্ধ রহিয়াছে, সেই স্কন্ধে নিত্য নূতন কর্ত্তব্যের ভার গ্রহণ কর। তোমাদের বাহুযুগে যে আমার বাহু রহিয়াছে, তাহা দ্বারা সাধারণের পক্ষে একান্ত অসাধ্য এবং অকল্পনীয় কর্ম্ম-সমূহ সম্পাদন করিয়া জগৎকে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে শ্রদ্ধাপর দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে এবং আমার দিকে তাকাইতে বাধ্য কর। পুত্রই ত' পিতার কার্য্যভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নিবে, অপরে ত' তাহা করিবে না। তোমরা যে আমার পুত্র, এই

কথার প্রমাণ প্রতিদিন তোমরা নিজ নিজ কার্য্যের মধ্য দিয়া দিতে চেষ্টা কর।"

বিশ্বাসের শক্তি ও ষোল আনা মন দিয়া কাজ

নোয়াখালী জেলান্তর্গত ফেণী-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ কর। কাছা-ঢিলা চেষ্টা জীবনের একটী ক্ষেত্রেও করিও না। নিজের উন্নতি বা দেশের উন্নতি কোনওটীতেই নিজেকে অর্দ্ধেক করিয়া অর্পণ করিও না। যে কাজ করিবে, ষোল আনা মন দিয়া করিবে, পার ত' আঠারো আনা মন দিয়া করিবে। সাফল্যে স্ফীত না হইয়া অসাফল্যে দমিয়া না যাইয়া বিশ্বাস রাখিও পরমেশ্বরে। ঈশ্বরে নির্ভরই জীবনের পরমা শান্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাসই জীবনের পরম অভয়। সেই অভয়, সেই শান্তি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ কর, জীবন ভরিয়া পান কর আর তারই জোরে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া প্রত্যেকটী কাজে শক্তি-প্রয়োগ কর। বিশ্বাসীর অপরাজেয় শক্তি এবং নির্ভরশীলের দুর্দ্ধর্ষ সাহস লইয়া প্রতিকার্য্যে প্রমাণিত কর যে, তোমরা সিংহের শিশু, শৃগাল-শাবক নহ, তোমরা বলীয়ান্ পিতার সন্তান, যার তার ঘরে তোমাদের জন্ম হয় নাই।"

হাইলাকান্দি (কাছাড়)
১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৪১
(১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

গুরুদেবদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। দুইটী আগন্তুক ভদ্রলোক দুইটী বিপরীত অভিমত প্রকাশ করিতেছিলেন। উভয়ের আলোচনার উদ্যম বেশ কতকটা প্রশমিত হইয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবামণি আলোচনায় যোগ দিলেন। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে উভয়ের আলোচনা শুনিতেছিলেন।

গুরুকে দিয়া কোন্ প্রয়োজন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—গুরুকে দিয়ে কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? একটী মত হচ্ছে এই যে, তাঁর দ্বারা হাতের জল মাত্র শুদ্ধ করা হয়, এর চেয়ে বেশী আর কিছুই হয় না। অনুষ্ঠান-বিশেষের মধ্যে কাণে একটী মন্ত্র দিয়ে গুরুদেব শিষ্যের হাতের জল শুদ্ধ ক'রে দিয়ে গেলেন, এর পরে তাঁর আর কোনো কর্ত্তব্যই নেই। অবশ্য একটী কর্ত্তব্য তবু আছে। সেইটী হচ্ছে, বছর বছর শিষ্যবাড়ী ভ্রমণ করা, ঘন ঘন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম এবং দান-দক্ষিণা আদায় করা। একবার জিজ্ঞাসাটুকু করারও প্রয়োজন নেই যে, 'ওরে শিষ্য, সারা বৎসর তুই সাধন-ভজন করেছিস ত'? প্রশ্নের প্রয়োজন নেই যে, শিষ্যের সাধন-পথে কোনও সমস্যা আছে কিনা এবং থাকলে তার সমাধান কি। এই মতের নিন্দক ও সমর্থক

উভয়েই নিজ নিজ দিক থেকে অনেক যুক্তি দিতে পারেন। যথা,—নিন্দকেরা বল্‌তে পারেন, তাহ'লে গুরুগিরি শুধু জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা কৌশল মাত্র, আর শিষ্যগিরি শুধু লোকপ্রথার অন্ধ দাসত্ব। এই ব্যাপারে এর চেয়ে বড় কৌলীন্য আর কিছু নেই। কিন্তু সমর্থকেরা বল্‌তে পারেন যে, বংশবিহিত কুলপ্রথাপূত এটা একটা সৎসংস্কার, যা' না থাক্‌লে ভারতবর্ষে নানা রকম রাজনৈতিক ও সামরিক বিপর্য্যয়ের পরে প্রাচীনের চিন্তাধারাকে বর্ত্তমান মানুষের জীবন পর্য্যন্ত টেনে আনা যেত না। এক একটা দীক্ষামন্ত্র কি এক একটা দার্শনিক চিন্তা-প্রবাহকে বংশানুক্রমে সঞ্জীবিত ক'রে রাখে নাই? দীক্ষারূপ একটা প্রথা কোনও প্রকারে বদ্ধমূল হ'য়েছিল বলেই বর্ত্তমান মানুষকে নানারূপ ভাবে ভাবিত ও উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। নতুবা স্বাধীন চিন্তা ভারতবাসীর মন থেকে, মস্তিষ্ক থেকে, অনুশীলন থেকে কবে যে চির-নির্ব্বাসিত হ'য়ে যেত, কেউ ধারণাও করতে পারে না। হিন্দু ভারতের উপরে সাংস্কৃতিক বিপত্তি যখনি এসেছে এবং রণনৈতিক-কূটবুদ্ধি থেকে বঞ্চিত আত্ম-কলহপরায়ণ ক্ষত্রিয়েরা যখন সেই বিপন্নিবারণে অক্ষম হয়েছে, তখন গুরুরূপী ব্রাহ্মণ কাণে মন্ত্র দিয়ে যেন এক ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে দিলেন, যার ফলে সহস্র উৎকোচ এবং লক্ষ কোটি উৎপীড়নকেও অগ্রাহ্য ক'রে বিশ্বাসী হৃদয় তার প্রাচীন সাধনার সঙ্গে লগ্ন হয়ে রইল। কোনো কোনো গুরুদেবেরা ব্যক্তিগত

ভাবে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ গুরুদেরে দ্বারা শিষ্যকে মন্ত্রদান এভাবে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে রক্ষা করে এসেছে।

গুরুবাদের উৎপত্তি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু গুরুতে শিষ্যের শ্রদ্ধাবোধ না থাক্‌লে তাঁর দেওয়া মন্ত্রে মন বসে না। গুরুতে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, আস্থা ও অনুরাগ যখন প্রগাঢ় তখন শিষ্যের সাধনার মধ্যে এক কণা ভেজাল প্রবেশ করতে পারে না। এটা একটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা উপলব্ধ সত্য। তাই, গুরুদেবেরা উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন,—গুরুতে আর ইষ্টে ভেদ নেই। দুইই এক, একই দুই। অর্থাৎ পথপ্রদর্শকে আর লক্ষ্যে ভেদ নেই। শুধু তাই নয়, নামে আর ইষ্টেও ভেদ নেই, নামই ইষ্ট, ইষ্টই নাম। অর্থাৎ পথ এবং লক্ষ্য দুইই এক। ফলে কি দাঁড়াল? গুরু, নাম আর ইষ্ট, তিনই এক, একই তিন। এই তিনে ভেদ নেই, থাক্‌লেও সেই ভেদ নিতান্ত ভাসাভাসা, স্বরূপতঃ তিনই এক, একই তিন। গুরুতে শ্রদ্ধাবোধের আত্যন্তিক আবশ্যকতা-বোধ থেকে এভাবে গুরুবাদের উৎপত্তি ঘটল। ফল হ'লো কি? কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধন-কর্ম্মে শিষ্যের ঐকান্তিক মনোনিবেশ এবং তৎফলসঞ্জাত প্রগাঢ় আত্মিক শান্তি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একদল শিষ্যের বিত্ত, চিত্ত ও প্রাণের উপরে গুরুরূপধারী সুকৌশলী মানুষের বেপরোয়া দস্যুবৃত্তি।

সমদর্শী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভাবতে গেলে জগতে সব-কিছুরই ভাল দিক্ আর মন্দ দিক্ এই দুটো দিক্ই আছে। কোন্ দিকে কার নজর তা' কে বলতে পারবে? কেউ হয়ত বলবেন, আমি ভালো দিক্টাই দেখ্ব, মন্দ দিকটার নিন্দা ক'রে সময় নষ্ট করব না। কেউ হয়ত বলবেন, আমি মন্দ দিকটা ছাড়্ব কেন? মন্দ দিকটা যদি না দেখি, তবে ক্ষয়িষ্ণু আত্মহননেচ্ছু বিকারগ্রস্ত মানব-সমাজের বাঁচবার পথ কি ক'রে বেরুবে? কেউ বলবেন, নির্বিশেষে ভাল ও মন্দ দুটোই দেখতে হবে এবং ভালোর ভিতর থেকে মন্দকে দূর ক'রে, মন্দের ভিতর থেকে ভালোকে বে'র ক'রে মানুষের অগ্রগমনকে সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলতে হবে। আমার মতে শেষোক্ত ব্যক্তির উক্তিই যথার্থ এবং তাঁকেই বলতে হবে সমদর্শী। সমদর্শীরাই সম্যগ্দর্শী।

স্বার্থ ও ঐক্য

অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটায় শ্রীশ্রীবাবামণি স্থানীয় গাংপার ধুমকরের প্রভাবশালী জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী চরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে পদধূলি দিলেন। একদল বালক-বৃদ্ধা-যুবা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বিধাতা-পুরুষ সকলের অলক্ষিতে ব'সে প্রত্যেকটী জাতির ইতিহাস লিখে যাচ্ছেন। অদৃশ্য মসীতে এঁকে যাচ্ছেন এক বিরাট নক্শা, যার কালি স্পষ্ট হবে ঠিক সময়মত। যারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে তুচ্ছ ক'রে দিয়ে সকলের সামূহিক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তাদের সরু গলিগুলিকে তিনি তুলির পোচ দিয়ে বিশাল রাজবর্ত্মে পরিণত ক'রে দিচ্ছেন। যারা সামূহিক স্বার্থকে পদদলিত ক'রে কেবল নিজের মুখের এক গ্রাস অন্নকে নিরাপদ কর্ব্বার জন্য ঐক্য-বিরোধী কুকার্য্যে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের রাজবর্ত্ম দেখতে না দেখতে সরু গলিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, এমনকি তারা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে blind alley বা কানাগলিতে। ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ দার্শনিকতার উপরে ভিত্তি ক'রেও যাদের মধ্যে ঐক্যের চর্চ্চা হচ্ছে বেশী, সাময়িক ভাবে হ'লেও তাঁরা দুনিয়ার সকলকে পদতলে চেপে রেখে নিজেরা বড় হয়ে যাবে। অত্যন্ত উচ্চ কোটির উদার দার্শনিকতার দোহাই দিয়েও যারা নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অনুশীলনকে কচ্ছে অবহেলা, তাদের সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যাহ্ন-গগন আরোহণ করার আগেই অস্তপথে অধোগমন কত্তে বাধ্য হবে। সকলের স্বার্থকে যারা দৃষ্টিকোণে রাখে, ঐক্য তাদেরই পক্ষে সম্ভব। শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে যে বা যারা প্রমত্ত, ঐক্য তার বা তাদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না।

কেমন ঐক্য চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুঃশীল দুর্বৃত্তদের ঐক্য জগৎকে দুঃখার্ত্ত হাহাকারে পূর্ণ করে, সুন্দরী শ্যামলা ধরিত্রী-দেবীকে অভিশপ্ত করে। সৎ, সুকৃতিমান, উদার মানুষদের ঐক্য জগতের দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, তাপ, পাপ ও দুর্ব্বলতাকে হরণ করে। শুধু ঐক্য এলেই কিছু একটা হ'য়ে গেল না, ঐক্য হওয়া চাই সৎলোকের, ঐক্য হওয়া চাই সদুদ্দেশে, ঐক্য হওয়া চাই উন্নত আদর্শের প্রেরণায়। তবেই ঐক্য হবে পরমলোভনীয় এবং পরমলাভজনক মহাশক্তি। চোর-ডাকাতের ঐক্য চৌর্য্য আর ডাকাতি বাড়ায়, দুশ্চরিত্র লম্পটের ঐক্য অকল্পনীয় অপরাধের সৃষ্টি করে, জুয়াড়ি ও নেশাখোরের ঐক্য সমাজের নূতন নূতন পাপাবর্ত্ত-সঙ্কুল সমস্যা-সমূহের সৃষ্টি করে, অমানুষদের ঐক্য জাতিধ্বংস করে, সভ্যতার বিনাশ ঘটায়। পরমতে অসহিষ্ণু, পরধর্ম্মে বিদ্বেষী দুর্জ্জনদের ঐক্য শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রাচীন ইতিহাসকে নির্ম্মূল করে। What is the difference between a man and a beast? A beast does not wear garments while a man does. (একটা মানুষে আর একটা পশুতে পার্থক্য কি? পশু পোষাক-পরিচ্ছদ পরে না, মানুষ পরে।) এমন মানুষেরা আসলে পশু। তাদের ঐক্য জগতে আর্ত্ত চীৎকার আর অশ্রু-প্রবাহই বর্দ্ধিত করে। যে মানুষ পর-দুঃখে কাতর, নিজ-সুখে উদাসীন, সেই মানুষ পরিচ্ছদ-হীন হ'লেও প্রকৃত মানুষ।

তেমন মানুষদের ঐক্যই প্রকৃত ঐক্য, তেমন মানুষদের ঐক্য দ্বারাই জগতের কোটি কোটি দুঃখার্ত্তের দুঃখ বিমোচন ঘটে।

সমবেত উপাসনা ও একক উপাসনার ফল-পার্থক্য

কুমিল্লা জেলান্তর্গত রাজপুর-নিবাসী জনৈক পত্র-প্রেরকের পত্রের জবাবে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দীক্ষাতে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার পক্ষে একাকী দীক্ষা না নিয়া স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং অন্যান্য পরিজন সকলকে সঙ্গে লইয়া দীক্ষা গ্রহণ উত্তম মনে করি। কেন করি? কেননা, ইহার ফলে সমবেত উপাসনার ব্যাপারে সহযোগীর অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে নিবারিত হয়। আমার নিকটে যে দীক্ষা নিবে, তাহাকে সপ্তাহে একটী দিন সকলের বা বহু জনের সঙ্গে মিলিয়া সমবেত উপাসনা করিতেই হইবে। এই বিষয়ে যে দ্বিমত করিবে, এই কর্ত্তব্য পালনে যে অবহেলা করিবে, তাহার প্রতি আমি অন্তরের অবিমিশ্র স্নেহ পোষণ করিতে একান্তই অক্ষম। আমি ত' কাহাকেও আমার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য করি না, প্রলুব্ধ করি না, জোর-জবরদস্তি-চালাকি খাটাই না,—এমত অবস্থায় আমার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠানে যাহারা যোগ দিতে অনিচ্ছুক, কেন তাহারা আমার শিষ্য হইবে?

আমার সন্তানকে আমি অখণ্ড সংজ্ঞা দিয়াছি। যে অখণ্ড হইবে, তাহাকে সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনাও করিতে হইবে। দূরবর্ত্তী উপাসনা-কেন্দ্রে যাইয়া সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার অসুবিধা ঘটিলে যাহাতে নিজ গৃহে বা নিজ পল্লীতেই সে উপাসনায় সমবেত হইবার সুনিয়মটী রক্ষা করিতে পারে, তাহার জন্যই পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশীদের মধ্যে সমদীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি হিতকর। একক নীরব উপাসনার যেমন একটী বিশেষ শুভফল আছে, বহুজনমিলিত সমকণ্ঠোচ্চারিত প্রার্থনাস্তোত্রকীর্ত্তনাদিরও তেমন আর একটী বিশেষ শুভফল আছে। একক উপাসনার প্রগাঢ় নিবিষ্টতা তোমাদিগকে দিবে শক্তির অফুরন্ত উৎসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া শক্তি সংগ্রহের সুযোগ, সমবেত উপাসনা দিবে তোমাদিগকে সেই শক্তিকে বহু সহস্র বাহুর সেবার মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বে বিস্তারিত করিয়া দিবার অকল্পনীয় আনুকূল্য।

একই দিনে বহু স্থানে সমবেত উপাসনা ও সপ্তাহের প্রতিদিনই সমবেত উপাসনা

"একই দিনে কাছাকাছি দুই তিনটী স্থানে সমবেত উপাসনার অনুষ্ঠান ঘোষিত হইলে বা সপ্তাহের সাত দিনই কোথাও না কোথাও সমবেত উপাসনা থাকিলে কি করণীয়,

এই বিষয়ে আমার অবশ্যই কিছু বলা প্রয়োজন। যাহাতে একই দিনে কাছাকাছি বহু স্থানে সমবেত উপাসনা ঘোষিত না হয়, তদ্রূপ চেষ্টা সকলেরই সরল মনে করা উচিত। যে-কোনও উপাসনা-অনুষ্ঠানে সমপ্রাণ অত্যধিক-সংখ্যক উপাসক-উপাসিকার শুভাগমন-সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া প্রত্যেকেরই কাজ করা উচিত। তথাপি একাধিক স্থানে একই দিনে একই সময়ে সমবেত উপাসনা হইলে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বুঝিয়া একটীকে প্রাধান্য দিতে হয় অথবা যার পক্ষে যে স্থানে যোগদানে সুবিধা অধিক, তার পক্ষে তৎস্থানীয় অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী হইতে হয়। অথবা অনুষ্ঠানগুলির সময়টীকে আগে পিছে করিয়া দিয়া সকলের যোগদানের সুযোগ দিতে হয়। এই ব্যবস্থাটী স্থানীয় কর্ম্মীদের সদ্বিবেচনার বিষয়। কিন্তু প্রত্যহই কোথাও না কোথাও সমবেত উপাসনা হইলে কাহারও পক্ষেই প্রতিটিতে যোগদান সম্ভব হইতে পারে না। এমতাবস্থায় উপাসক-উপাসিকাদিগকে সপ্তাহের মধ্যে একটী বিশেষ উপাসনার দিনে নিয়মিত যোগদানের সঙ্কল্প লইয়া চলিতে হয়। একজন বৃহস্পতিবারের উপাসনাটীতেই খুঁটি গাড়িল, আর একজন গাড়িল মঙ্গলবারের উপাসনায়, তৃতীয় একজন সাধারণ ছুটির দিন রবিবারে,—এজন্য নিজেদের মধ্যে কলহ করা উচিত নহে। এই সকল বিষয় নিয়া যাহারা কলহ করে, তাহারা নির্ব্বোধ।

সমবেত উপাসনা এক মহামিলনের সাধনা

"সমবেত উপাসনা এক মহামিলনের সাধনা। এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া ব্যক্তিগত জিদকে প্রধান করিয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ করার মতন ঘোরতর মূর্খতা আর কিছু নাই। সারা জীবনই ত' তোমরা কত মানুষের সঙ্গে কত ভাবে কলহ করিয়া মেজাজকে উত্তপ্ত ও মনের শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছ। সমবেত উপাসনার মত অনুষ্ঠানে তোমাদের যাহাতে শান্তি, তৃপ্তি, সংঘর্ষহীনতা, সম্প্রীতি ও ঐক্য কেবল বর্দ্ধিতই হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

সমবেত উপাসনাকালীন পরিচ্ছদ

"সমবেত উপাসনায় বসিতে শুদ্ধ বস্ত্রে ও শুদ্ধ মনে বসিবে। তোমার প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা সন্ধ্যাপূজায় বসিতে কি ভাবে বসিতেন? কি পরিধান করিতেন? আমাদের দেশে বস্ত্র ও প্রাবরণ প্রশস্ত। শুভ্রবর্ণ ধুতি ও শুভ্রবর্ণ চাদর শাদা রংয়ের ফুলেরই মত বড়ই চিত্তসন্তোষজনক, চিত্তপ্রসাদবর্দ্ধক। সব রং মিলিলে শাদা রং হয়। সব উপাসক মিলিলে সমবেত উপাসনা হয়। তোমাদের ওঙ্কার-বিগ্রহ শুভ্রবর্ণের। একদা বঙ্গভূমিতে মনীষী ব্যক্তিরা চাদর-নিবারণী সভা স্থাপন

করিয়া উত্তরীয় ব্যবহার বন্ধ করিবার আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। কল-কারখানায় উত্তরীয় বিপজ্জনক কিন্তু উপাসনার সময়ে এই জিনিষটী সত্যই সাত্ত্বিক এক গাম্ভীর্য্যের জনক।

সমবেত উপাসনার বেদীতে বিগ্রহ

"সমবেত উপাসনার বিগ্রহ-বেদীতে আমার প্রতিচ্ছবি স্থাপন নিষিদ্ধ ও নিষ্প্রয়োজন। নিষিদ্ধ এই জন্য যে, তোমাদের সমবেত উপাসনায় সকল গুরুর শিষ্যরা আসিয়া যাহাতে মিলিত হইতে দ্বিধাহীন হইতে পারেন, তার পথ খোলা রাখা অত্যাবশ্যক। অনেকেই ত' নিজ নিজ গুরুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা আমার ফটোটার সম্মুখে মাথা নত করিবেন কেন? নিষ্প্রয়োজন এই জন্য যে, তোমাদের সকলের আসনের সম্মুখে তোমাদের সমসাধক-রূপে আমার একখানা আসন ত' রহিয়াছে। আমি ত' এই উপাসনায় তোমাদিগকে ছাড়িয়া দূরে যাইতেছি না যে, আমার আলাদা করিয়া একটা ফটোর প্রয়োজন হইবেই! যাহা নিষেধ করিলাম এবং যাহা সত্য সত্যই নিষ্প্রয়োজন, তাহা তোমরা করিও না। এমন কি বিগ্রহ-বেদীতে ওঙ্কার-বিগ্রহও একখানার স্থলে দুইখানা বসাইও না।

সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্য ও পক্কান্ন

"সমবেত উপাসনা ভোগ-নৈবেদ্য ছাড়াও হয়। তথাপি অনেকে ভোগ-নৈবেদ্য দিতে চাহেন। এই অভিলাষে আপত্তি করিবার কিছু নাই কিন্তু কদাচ পক্কান্ন-ভোগ উপাসনার আসরে সাজাইবে না। নিজ নিজ ব্যক্তিগত জেদ, রুচি, গোঁড়ামি বা গোয়ার্তুমিকে আমার নির্দ্দেশের ঊর্দ্ধে যাইতে দিও না। সমবেত উপাসনার আসরে কেন আমি পক্কান্ন ভোগ সাজাইতে কড়া নিষেধ দিয়া রাখিয়াছি, তাহা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তোমাদিগকে বহুবার বলিয়াছি।

সমবেত উপাসনায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের যোগদান

"ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের লোকদিগকে নিজ নিজ গুরুদত্ত সাধন ছাড়িয়া দিয়া আমার মন্ত্র-শিষ্য হইবার জন্য কদাপি তোমরা মন্ত্রণা দিও না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের সাধকেরা ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় যাহাতে তোমাদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিতে আগ্রহী হন, তদ্বিষয়ে তোমরা চেষ্টা করিবে। সেই চেষ্টা সফল হইবে তোমাদের নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি থাকিলে, আমার উপর্য্যুক্ত উপদেশগুলি পালন করিলে এবং তোমরা প্রত্যেকে সাধনশীল ও ভজনপরায়ণ

হইলে। সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃভাব নিয়া আহ্বান করিলে অধিকাংশ মানুষই তোমাদের সমবেত উপাসনায় আনন্দ-সহকারে যোগ দিবেন। কিন্তু তোমরা তাঁহাদিগকে মুখ ফুটিয়া ডাক আর না ডাক, তোমরা যদি সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সমান সম্প্রীতি রাখিয়া নিজেদের সমবেত উপাসনা নিবিড় নিষ্ঠায় আমার নির্দ্দেশানুযায়ী করিয়াই যাইতে থাক, তাহা হইলে প্রাণের অদৃশ্য আকর্ষণে আস্তে আস্তে বহু নরনারী আপনা আপনিই আসিয়া যোগ দিবেন। কদাচ কল্পনাও করিও না যে, তোমাদের সমবেত উপাসনার দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের সাধকদিগকে নিজ-পথ-ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ইষ্ট নামে লগ্ন থাকিয়াই তোমাদের সমবেত উপাসনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। মুখ ফুটিয়া ইঁহাদিগকে ডাকিবার প্রয়োজনও পড়িবে না। নিজেরা নিষ্ঠা নিয়া, প্রীতি নিয়া, দ্বিধাহীন আনুগত্য নিয়া পরম সম্প্রীতির মধ্য দিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস নিজেদের সমবেত উপাসনা করিয়া যাইতে থাক। দেখিবে, এই ডাকই আসল ডাক। তোমাদের তরফ হইতে কোনও চেষ্টা ব্যতীতই তাঁহারা তোমাদের সমবেত উপাসনার প্রতি অন্তরের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ অনুভব করিবেন। এই পরোক্ষ ও অমোঘ উপায়টী অবলম্বন করিয়া তোমরা তাঁহাদিগকে ডাক।

সমবেত উপাসনায় নবপ্রবর্ত্তন

"বাহিরের লোক তোমাদের সমবেত উপাসনায় যোগদান করিলে তোমরা তাঁহাদের প্রতি সম্মান-সূচক ব্যবহার করিও কিন্তু তাঁহাদিগকে সমবেত উপাসনার সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মগুলি অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহাদের খাতিরে তোমরা এই সমবেত উপাসনার মধ্যে কোনও নবপ্রবর্ত্তন করিও না। তোমাদের মধ্যেও কেহ নিজ অতিরিক্ত উৎসাহ বশত বা বুদ্ধিমত্তার প্রাবর্ল্যহেতু সমবেত উপাসনার সুপ্রতিষ্ঠিত রীতির মধ্যে নিজেদের খোশ-খেয়াল-মাফিক কোনও পরিবর্ত্তন, রূপান্তর বা সংযোজন ঘটাইও না।

সমবেত উপাসনায় কি কি নিষিদ্ধ

"সমবেত উপাসনার পবিত্র আসরে কেহ মিথ্যা কথা বলিও না, পরনিন্দা করিও না, কদর্য্য বিষয় আলোচনা করিও না, গোলমাল করিও না, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিও না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি প্রিয়কারী ও প্রিয়ভাষী হইবে। চা, চুরুট, পান, বিড়ি, তাস, পাশা, মাদক দ্রব্য, জুয়া, ভ্রষ্টা নারী বা লম্পট পুরুষের বিষয়ে আলোচনা পর্য্যন্ত এখানে করিবে না। উপাসনা শেষ হইয়া গেলে শান্ত মনে, সংযত চিত্তে, আশ্বাস-ভরা প্রাণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে,—

প্রণাম নিবার কালে হৈ-চৈ হুলস্থুল করিয়া পাড়া মাৎ করিবে না। উপাসনা তোমাদিগকে পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গের স্বভাব হইতে যেন নিবৃত্ত রাখে। উপাসনা তোমাদের জীবনের দিব্যায়ন বিধান করুক।

সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কুফল

"জগতে কত যুগে কত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অবশ্য, তত্তৎ যুগের প্রয়োজন বুঝিয়াই এই সকল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রদায়-সমূহ নিজেদের দলপুষ্টি দ্বারা জগতের বহু হিতের সহিত অহিতও কি সাধন করে নাই? সম্প্রদায়-বৃদ্ধির কুপ্ররোচনায় এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় জগতের অসংখ্য লোকের উপরে নানা অকথ্য অত্যাচার কি করে নাই? সেই সকল অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবণতা হইতে পুনরায় কি জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয় নাই? এই সম্পর্কে অনেক তথ্য ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে। সুতরাং তোমরা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধ গোঁড়ামি হইতে বাঁচিয়া চলিবার চেষ্টা প্রত্যেকে করিও। দল বাড়াইলেই বল বাড়ে না, নির্ব্বিচারে দল বাড়াইতে গেলে অনেক সময়ে শক্তিহ্রাস ঘটে।

কুলোকের দ্বারা দল বাড়িবার দারুণ পরিণাম

"অসৎ লোক নিয়া দল বাড়াইলে, এই সকল অসৎ

লোকদের অধিকাংশে যে সকল অপকার্য্যকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় সৎকার্য্য বলিয়া মনে করে, তাহার সমর্থক কর্ম্মতালিকা তৈরী করিয়া তবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হয়। নতুবা সম্প্রদায় টিকে না। অথবা, এই সকল অসৎ লোককে জীবিকার্জ্জনের জন্য কুপথ খুলিয়া দিতে হয় এবং বিবেককে ধোকা দিবার জন্য সেই সকল অসৎ কার্য্যকে অতীব মহনীয় সৎকার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। যাহাকে দিয়াই তুমি দল বাড়াও না কেন, তাহার অর্থনৈতিক সমস্যাবলিকে তুমি কদাচ উপেক্ষা করিতে পার না। কুসীদজীবী কঞ্জুষ ব্যক্তিকে যদি তুমি ধর্ম্মসঙ্ঘে গ্রহণ কর, আর তাহাকে যদি নিজ জীবিকা ছাড়িয়া দিতে বল, সে পড়িবে বিপদে। কিন্তু তাহাকে যদি তোমার ধর্ম্মসঙ্ঘে রাখ এবং তাহার পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাশা করিতে থাক, তবে তোমাকে তাহার সুদখোর জীবনের অপকার্য্যগুলিকে পরোক্ষে সমর্থন করিতেই হইবে। গণিকাবৃত্তি যাহার জীবিকার্জ্জনের প্রধানতম উপায়, তাহাকে যদি ধর্ম্মসঙ্ঘে গ্রহণ কর, আর তাহাকে যদি নিজ কুজীবিকা ত্যাগ করিতে বল, সে ফাঁপরে পড়িবে। কিন্তু তাহাকে যদি তোমার ধর্ম্মসঙ্ঘে রাখ এবং তার ব্যয়-ভার বহনে অক্ষম হইয়া বরং তাহার কাছ হইতেই আর্থিক সহায়তার প্রত্যাশা রাখ, তবে তোমাকে তাহার বিকৃত জীবিকাকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিতে হইবে। নিষ্ঠুর-স্বভাব লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যু-প্রকৃতির দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিকে যদি তুমি ধর্ম্মসঙ্ঘে গ্রহণ কর

আর তাহাকে যদি নিষ্ঠুরতা ও দস্যুতা ছাড়িয়া দিতে বল, তাহা হইলে সে কত দিন তোমার শিষ্য হইয়া থাকিতে পারিবে, সন্দেহের কথা কিন্তু তাহার মনের সাহস, শরীরের বল ও নির্ভীকতার সুযোগ নিয়া তোমাকে যদি তোমার ধর্ম্মসঙ্ঘকে পুষ্ট করিতে হয়, তবে তাহাকে এমন বৃত্তিতে অনুমোদন বা সহায়তা তোমার দিতেই হইবে, যাহার ফলে অনেকের গৃহ লুণ্ঠিত হইবে, অনেকের নারী লাঞ্ছিত হইবে, অনেক জনপদ অগ্ন্যুৎপাতে বিনষ্ট হইবে, অনেক মানুষের মুণ্ড পথে প্রান্তরে গড়াগড়ি যাইবে। কুলোকের দ্বারা দল বাড়িলে তাহার পরিণাম বড়ই নিদারুণ হয়।

অসৎ অসাধুরা সৎ ও সাধু হউক

"সুতরাং দল বাড়াইবার চেষ্টা করিও না। অসৎ লোককে সৎ করিবার চেষ্টা কর। লম্পটকে সংযমের পথে টানিয়া আনিতে চেষ্টা কর। অসতীকে সৎপথে সমারূঢ় হইবার আনুকূল্য বিধান কর। লক্ষ্য রাখ যেন জগৎ সৎলোকে পূর্ণ হয়। তোমাদের ক্ষুদ্র ধর্ম্মসম্প্রদায় বড় হইল কি না, তাহা নিয়া দুশ্চিন্তা রাখিও না। সমগ্র পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যদি সৎ বা সাধুচরিত হয়, তবে জগতে আলাদা করিয়া কতকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? তোমার কামা হউক শুধু এই যে, যার পক্ষে যতটুকু সততা-সম্পন্ন ও

নিঃস্বার্থ জীবন-যাপন করা সম্ভব, পৃথিবীর প্রত্যেকটী লোক তেমন হউক। অতিরিক্ত স্বার্থপরতা হইতেই জগতের অধিকাংশ অশান্তির সৃষ্টি।"

প্রকৃত শিষ্য

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কাইমপুর-নিবাসী অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"গুরুদেব মনে মনে ভাবিলেন, যদি কেহ রাস্তার ওপারে কুঁড়ে ঘরের মাতৃহীন শিশুটীর জন্য দৈনিক এক পোয়া করিয়া দুধের ব্যবস্থা করিত, তবে কত ভাল হইত। উত্তম শিষ্য লক্ষ্য করিলেন, গুরুদেব ঘন ঘন ঐ শিশুটীর পানে তাকাইতেছেন আবার মাঝে মাঝে মাঠে বিচরণশীল ধেনুদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছেন। শিষ্য গুরুদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ধেনুর মালিককে জিজ্ঞাসা করিল,—গাভীটির দাম কত। শিষ্য দাম শোনা মাত্র গৃহে ফিরিল, স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার বেচিয়া টাকা নিয়া আসিল, ধেনুটীকে মাতৃহীন শিশুর গৃহদ্বারে বাঁধিল এবং নিজে ধেনুর পরিচর্য্যায় লাগিয়া গেল। প্রত্যহ সে দুগ্ধ দোহন করিয়া ঐ শিশুর শুশ্রূষাকারী পালক-পিতার নিকট দিতে লাগিল। গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"ধন্য বাছা, তুমিই প্রকৃত শিষ্য।" * * * আজ দুনিয়ার যে হাল, কাল তাহা বহাল নাও থাকিতে পারে। যে-কোনও গুরুতর অবস্থা আসিতে পারে মনে করিয়া আগে

হইতেই প্রত্যেককে প্রস্তুত হইতে হইবে। ভবিষ্যৎকে অনুমান করিতে না পারিলে উপযুক্ত প্রস্তুতি সম্ভব নহে। এই জন্যই দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞেরা অনেক সময়ে এমন ফরমূলাও বাহির করেন, যাহা শুনিয়া তখনকার লোকে হাসে। কিন্তু ইতিহাস সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিবে যে, দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ বিপদ-সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া দুই, চারি, পাঁচ দশক পূর্ব্বে যাঁহারা সাবধান হইয়াছেন, তাঁহারা দেশের উপকারই করিয়াছেন। আমি যখন তিনশত বৎসরের পরের ভারতবর্ষের কথা ভাবিয়া আকুল বা উৎফুল্ল হই, তখন অনেকে আমাকে পাগল মনে করেন। কিন্তু ইতিহাস একদা সাক্ষ্য দিবে যে, আমি ঠিকই ভাবিয়াছিলাম, তোমাদেরই বরং কর্তব্য ছিল আমার বাক্যে আস্থা ন্যস্ত করার। আমাকে কেহ বুঝিল না বা বুঝিবে না বলিয়া আমার আফশোষ নাই। কিন্তু একদিন না একদিন আমার হিতবাণীর, আমার নিষেধ-বাণীর, আমার সতর্ক বাণীর কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইবে। কত বিপ্লব আসিবে, কত বিপ্লব যাইবে, জগৎকে যার যতটুকু দিবার তাহারা ততটুকু দিয়া যাইবে কিন্তু আমার পরিকল্পনা কদাচ মিথ্যা হইবে না। সুদূরবর্ত্তী বলিয়া এখন তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, আমি নিঃসম্বল অযাচক বলিয়া তোমাদের মনে ভরসা জাগিতেছে না। কিন্তু যাহা করিতে চাহিয়াছি, তাহা হইবেই। আমি আমাকে বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে সাধ যায়। তোমরা

যদি প্রকৃতই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে চেষ্টা কর। মন্ত্র নিলেই শিষ্য হয় না। 'গুরুজীকী জয়' বলিয়া ধ্বনি দিলেই শিষ্য হয় না। গুরুর জীবনে যদি কিছু সত্য থাকে, সেই সত্যে যদি দেশ, জাতি ও জগতের কিছু মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে শিষ্যের কর্ত্তব্য সর্ব্বশক্তি দিয়া সেই সত্যকে নিজ জীবনে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করা, সেই সত্যের ব্যাপক বাস্তবায়নের জন্য মৃত্যুপণ পরিশ্রম করা, সেই সত্যের প্রতি সর্ব্বসাধারণের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও সমর্থন সৃষ্টি করিবার জন্য অবিশ্রান্ত তপস্যায় লাগিয়া যাওয়া। যাহারা ইহা করে, তাহারাই প্রকৃত শিষ্য।"

হাইলাকান্দি

২রা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

(১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কর্ত্তব্য

একটী যুবক প্রশ্ন করিলেন—আমার প্রতি কাজেই দ্বিধা, প্রতি কাজেই অন্তর্দ্বন্দ্ব, করব কি করব না ব'লে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। এর একটা উপায় বলে দেবেন?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করা কঠিন নয়, ইচ্ছা করলেই তা' পার। কিন্তু দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব সকল সময়েই খারাপ জিনিষ নয়। পাপ-কাজে দ্বিধা এলে সে কাজ ছেড়ে দেবে, করবে না। পুণ্য কাজে দ্বিধা এলে সেই দ্বিধাকে গলা

টিপে মেরে ফেললে, জোর ক'রে কর্ত্তব্য কাজ ক'রে যাবে, বাধা-বিঘ্ন মানবে না।

পুণ্য কর্ম্ম চিনিবার উপায়

প্রশ্নকর্ত্তা।—কোনটী পাপ আর কোনটী পুণ্য, তা বুঝব কি ক'রে?

শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—উপায় অতি সহজ। যে কাজে আত্মপ্রসাদ আসে, দুঃখ জন্মে না, যে কাজে মনের বল বাড়ে, দুর্ব্বলতা বাড়ে না, যে কাজে স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ এবং স্থায়ী আনন্দ, নিরন্তর বিষাদ নেই, যে কাজে নিজের সুখের সঙ্গে অপর দশজনের সুখের সমন্বয়, অপর দশজনের ন্যায্য সুখের সঙ্গত অধিকারের সঙ্গে বিরোধ নেই, যে কাজে মন বিনা ভয়ে, বিনা যুক্তিতে, বিনা বিতর্কে এক কথায় সায় দেয়, সাধারণতঃ সে কাজ পুণ্য কর্ম্ম।

পুণ্যকর্ম্মে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুণ্য কর্ম্ম করতে গিয়ে মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এলে, আসবে হয় নিজের দুর্ব্বলতার বোধ থেকে, চারিদিকের প্রতিবেশে বিরুদ্ধ শক্তির প্রবলতার ধারণা থেকে, নতুবা অসাফল্যের আশঙ্কা থেকে। জীবনে সকলেই সকল কাজে সকল সময়ে সফল হয় না, আর বারংবার বিফলতার

মধ্য দিয়েই অনেক সময়ে মহৎ কর্ম্মে সাফল্য অর্জ্জন কত্তে হয়, এই কথা মনে রেখে মন থেকে আশঙ্কাকে দূর কর্ব্বে। "হেরে যাব" জেনেও যে প্রাণপণে যুদ্ধ করে, অনেক সময়েই সে পরিণামে জিতে যায়, এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে অসংখ্য রয়েছে। চারিদিকে প্রতিপক্ষ শক্তিগুলি প্রবল ব'লেই তুমি তোমার কর্ত্তব্য কাজ কর্ব্বে না, এর মধ্যে কোনো যুক্তি নেই, সান্ত্বনাও নেই। বরং তুমি আটঘাট বেঁধে, সতর্ক হ'য়ে প্রতি পদবিক্ষেপে এক এক ইঞ্চি ক'রে জমি দখল ক'রে ক'রে কেবল এগিয়েই যেতে থাক্‌বে, এই জিদ নিয়ে চল্‌বে। আজ যারা প্রবল শত্রু, তারা চিরকালই প্রবল থাক্‌বে না বা থাক্‌তে পারে না। আজ যারা বিরুদ্ধাচরণ কচ্ছে, তাদের অনেকে আস্তে আস্তে তোমার অনুরাগী ও সহযোগী হ'য়ে যাবে, এটাও আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। এরূপ ঘটনা জগতে বারংবার ঘট্‌ছে। তুমি যদি নিজের কৃতকর্ম্মের দ্বারা বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধকারীদের শক্তি বাড়িয়ে না দাও, তাহ'লে কালক্রমে আস্তে আস্তে তারা হীনবল ও নিরুৎসাহ হ'তে থাক্‌বে। তোমার বিজয়-যাত্রা ঠিক সেই সময়ে সত্য সত্য আরম্ভ হবে। এই কারণেই তুমি উদ্যমকে পরিহার কত্তে পার না, নিজেকে দ্বিধাগ্রস্ত থাক্‌তে দিতে পার না। একটী গাছের অতিদুর্ব্বল কোমল শিকড় প্রতিক্ষণ ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে কুলিশ-কঠিন প্রস্তরের গাত্র ভেদ ক'রে কত দূরে চলে যায় রসের অন্বেষণে, তারপরে বিরাট পর্ব্বত-বক্ষ বিদারিত ক'রে নিজের

ক্ষমতা প্রমাণিত করে, এই দৃশ্য কি কখনো দেখ নাই? তুমি যে দুর্ব্বল, এই ধারণাটাও পরিহার কর্ব্বে। আজ তুমি দুর্ব্বল, কালও কি তুমি দুর্ব্বলই থাক্‌বে? আজ থেকে কাজ সুরু কর। তার ফলে, আজ যতটা দুর্ব্বল ব'লে নিজেকে মনে কচ্ছ, কাল আর ততটা দুর্ব্বল থাক্‌বে না। কাজ চালিয়ে যাও,— দেখ্‌বে, পরন্তু তোমার দুর্ব্বলতা আরো কমেছে। ক্রমে ক্রমে দেখ্‌তে পাবে, তোমার দুর্ব্বলতাই কেবল দূর হচ্ছে না, নানা রূপে নানা ভাবে টুক্‌রো টুক্‌রো সবলতা এসে তোমার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তার পরেও কাজ চালিয়ে যেতে থাক। কিছুকাল পরে দেখ্‌বে, তুমি একটা বিরাট্ সবলতার অফুরন্ত আধার, তুমি একটী অসীম ক্ষমতার উৎস। যা বলছি, অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, প্রত্যক্ষ-করা সত্য জেনে বলছি, কল্পনা থেকে নয়। আমার এই কথাগুলি মনে মনে নিয়ত আলোচনা কর, তোমার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মানসিক বিকার একেবারে দূর হ'য়ে যাবে।

প্রশ্নকর্ত্তা অশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে করিতে পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরিমাণ ও উৎকর্ষ

আর একটী যুবক কিছু প্রশ্ন লইয়া আসিয়াছেন। যুবকটী সমাজ-কল্যাণ-মূলক একটী নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কাজে হাত দিতে ইচ্ছুক।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রথমেই লক্ষ্য রেখো, কাজের পরিমাণের চেয়ে কাজের উৎকর্ষ যেন বেশী হয়। অনেক কাজ কর্‌লাম, কিন্তু প্রায় সবই নৈতিক বা আত্মিক দৃষ্টিতে অতি নিকৃষ্ট মানের হ'ল,—এতে সমাজ খুব কম লাভবান্ হবে। হুজুগের কাজ চিরকালই পরিমাণে বেশী কিন্তু উৎকর্ষে নগণ্য। সুধীর, সুচিন্তিত, সম্ভর্পিত কাজে পরিমাণ প্রায়ই অল্প থাকে কিন্তু উৎকর্ষ চিরকালই বেশী। বাহিরের লোকের প্রশংসা যেখানে লক্ষ্য, সেখানে পরিমাণটার দিকে আপনিই বেশী দৃষ্টি পড়ে। আত্মপ্রসাদ বা ভগবৎপ্রীতি যদি হয় লক্ষ্য, তাহ'লে প্রায়শই উৎকর্ষের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি থাকে। সামাজিক বা রাজনৈতিক সঙ্কটকালে পরিমাণ জিনিষটার খুব বড় প্রয়োজন, তখন ধার থেকেও ভারের কদর বেশী হয়, কিন্তু সঙ্কট উত্তীর্ণ হবার পরেই দেখা যায় যে, পরিমাণের আধিক্য এমন অনেক আবর্জ্জনা জমিয়েছে, এমন অনেক অনাচারের সৃষ্টি করেছে, যাদের অপসারিত বা নির্ম্মূল করা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাবান্ পুরুষদেরও সাধ্যের অতীত। এমনকি, যেই বিপুলতা নিয়ে শ্রেষ্ঠ নেতারা জনমন মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন ব'লেই বিরাট্ আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল, সেই বিপুলতাই তাঁদের সমস্ত জীবনের অতি কঠোর কর্ম্মগুলির বিফলতার বীজ বহন ক'রে বেড়িয়েছে, কিন্তু তাঁরা তা টের পান নি, কারো চোখে সে ব্যর্থতা ধরা পড়ে নি। সেবা কর্ম্ম বল্লেই সেবা করা যায় না, সেবা করার যোগ্য চরিত্রের চাই অনুশীলন। হাসপাতালের

নার্সগিরি করার জন্য অশিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের যদি পাঠান যায়, তাহ'লে তারা অনেক ভালো রোগীকেও অকালে মরতে বাধ্য করবে। সেবার যোগ্যতা আহরণ ক'রে সেবায় হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত। অনেক সময়ে সেবা কর্ত্তে কর্ত্তেও যোগ্যতা আসে, কিন্তু কতটা সেবা কর্‌লাম, তার চেয়ে অনেক বড় বিবেচ্য হচ্ছে, কেমন সেবা কর্‌লাম। হাজার লোককে আধপেটা খাওয়ানোর চাইতে দু'শ লোককে পেট ভ'রে খাওয়ানোটা অধিকতর সার্থক। অবশ্য, দুর্ভিক্ষের সময়ের কথা আলাদা। তখন কতক লোক আধপেটা খেয়ে বেঁচে থেকেও দুর্ভিক্ষের দুর্দ্দিন অতিক্রম ক'রে যায়, আবার হয়ত সুদিনের মুখ দেখে কিন্তু সার্থকতার দিক থেকে এ দৃষ্টান্ত উৎসাহজনক নয়। যে কাজটুকু কর্ব্বে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে কর্ব্বে, কাজ একটু কম হ'ল ব'লে আফশোষ কর্ব্বে না, সুন্দর ক'রে নিখুঁত ভাবে কাজ কর্ত্তে পারা আর চিরস্থায়ী চমৎকার একখানা ছবি আঁকা, প্রায় এক কথা।

ক্ষুধার্ত্ত উদর বড়ই নিষ্ঠুর

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একবার একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশটি গ্রাম ঘুরেছিলাম পূর্ব্ববঙ্গে। বলেছিলাম,—স্কুল খোলো, ছেলেমেয়েদের পড়াও, তাদের জ্ঞানার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত কর। লোকেরা বল্লে,—আমরা চাষাভূষা লোক, কোথায় পাব শিক্ষক, কোথায় পাব টাকা। কিন্তু এই দুটো জিনিসের

একটারও কখনো অভাব হয় না। সত্যিকারের ইচ্ছা থাক্‌লেই সব-কিছু জুটে যায়। আপত্তি এল,—চাষার ছেলে দিনে মাঠে না খেটে স্কুলে যাবে? বল্লুম—নৈশ বিদ্যালয় কর। প্রশ্ন হ'ল,—আলোরও ত' পয়সা চাই, কে দেবে? বল্লুম,—গতরে খেটে নৈশ বিদ্যালয়ের বাতির ব্যবস্থা কর, পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ কর। কাজ আরম্ভও হ'য়ে গেলো। সেই কর্ম্মেরই খ্যাতি "হিতবাদী"র সম্পাদক চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের লেখনী মুখে হাজার লোকের কাণে পৌছুল। হ'ল মানভূম জেলায় পুপুন্‌কী আসার সূত্রপাত। মানভূমেও একাদিক্রমে প্রায় ত্রিশটী গ্রাম ঘুরলাম। সবাইকে বল্লাম,—পাঠশালা খোল, অন্ধ নয়নে আলো ফুটাও। সবাই বল্লে—পেটে খেতে পাই না বাবা, ছেলে-মেয়েদের পড়াব কি ক'রে? সত্যই ত'! ক্ষুধার্ত্ত উদর বড়ই নির্ম্মম, বড়ই নিষ্ঠুর। জঠর-জ্বালা হিতবুদ্ধি লোপ করে, সংযম নাশ করে, সৎসঙ্কল্পকে দুর্ব্বল করে, অন্তরের অভয়কে নির্ব্বাসিত করে, হতাশা, অনুদ্যম ও আলস্য দিয়ে জীবনকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের ক্ষুধা তাকে নির্ম্মম করে, নিষ্ঠুর করে, অপরাধ-অনুষ্ঠানে বেপরোয়া করে, নীতিজ্ঞানহীন এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে উপেক্ষাপরায়ণ করে। সুতরাং অন্নাভাবের এই নিদারুণ মূর্ত্তি যেখানে দেখ্‌বে, সেখানে সর্ব্বাগ্রে কর্ব্বে দারিদ্র্য-বিদূরণের ব্যবস্থা, সদ্ধর্ম্ম সৎকর্ম্ম তারপরে আসবে।

অন্নার্জ্জনের উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অন্ন-চাই অন্ন-চাই ব'লে আন্দোলন চালিয়ে গেলেই অন্নার্জ্জনের সার্থকতা এল না। অন্ন চাই ত' পরিশ্রম কর। ডাকাতি ক'রে আর ভিক্ষা ক'রে, কাজে ফাঁকি দিয়ে আর প্রবঞ্চনা ক'রে একটা জাতির অন্নাভাব কখনো দূর হ'তে পারে না। এসব নিন্দিত উপায় অবলম্বন ক'রে একজন দুজনের অন্নাভাব সাময়িক ভাবে দূর হ'লেও হ'তে পারে কিন্তু এর ফলে আরো বহুজনের অন্নাভাব বর্দ্ধিত হবে। অন্নাভাব দূর করতে হ'লে চাই অন্নার্জ্জন-ক্ষমতার বিকাশ আর চাই সেই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার যোগ্য ক্ষেত্র। এই ক্ষমতার বিকাশ-সাধনে, এই ক্ষেত্রের প্রসার-বিধানে কাজ ক'রে যাওয়া হবে দারিদ্র্যের প্রতি সেবা। কিন্তু কেন অন্ন চাই, সেই বিচার থেকে নিজেদিগকে বিযুক্ত করা চল্‌বে না। পিণ্ডি গেলা আর মলত্যাগ করা, এ কখনো অন্নার্জ্জনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না, হওয়া উচিত নয়। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি কেন চাই? চাই ভিতরের দেবত্বকে বিকাশ দেবার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য। মানুষের রূপ ধ'রে যারা জগতে আবির্ভূত হয়েছে, তাঁরা মানুষের মত মানুষ-রূপে জগতে আত্ম-প্রকাশ করতে সমর্থ হোক্‌,—এই জন্য চাই তাদের পেটভরা অন্ন, চাই তাদের দারিদ্র্য-দুঃখ-বিদূরণ। যে মানুষ অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটায়, তার অনশন-অর্দ্ধাশন দূর

করাটাই বড় কথা নয়, তার জীবনে প্রয়োজনীয় প্রাচুর্য্য তাকে মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত হ'তে সাহায্য করুক, তার দারিদ্র্য-বিমোচনের এইটিই হওয়া উচিত প্রধানতম লক্ষ্য। আজকের দুঃখদৈন্য-নিপীড়িত সাধারণ স্বার্থপর মানুষের কি দৈন্যরহিত পরার্থপর দেব-মানুষে রূপান্তর অসম্ভব, না অবাঞ্ছনীয়? শুধু দারিদ্র্য দূর হ'লেই কি মানুষটার সকল দুর্ভাগ্য দূর হ'ল? তার মধ্যে কি দেবত্বের বিকাশও সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক নয়? দেবত্ব-বিরহিত মানুষগুলির হাতে সম্পদের কি হ'তে পারে সদ্ব্যবহার? সেই সম্পদ কি জগদ্বাসীর জন্য নানা স্থানে নানা যুগে নানা ভয়ঙ্কর বিপত্তির সৃষ্টি কর্বে না? আজকের মানুষের বংশে দেবতার স্বভাব নিয়ে মহামানবেরা আবির্ভূত যাতে হন, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই দারিদ্র্য-দুঃখহীন সহজ জীবনকে সম্ভব করার চেষ্টা করতে হবে। অন্নার্জ্জনের চেষ্টার বা আন্দোলনের পশ্চাতে এই শুভ উদ্দেশ্যটুকুকে যদি প্রবল প্রয়াসে যুক্ত ক'রে না রাখা যায়, তাহ'লে অফুরন্ত প্রাচুর্য্যে পৃথিবী পূর্ণ হ'য়ে গেলেও কখনো মানুষের দুঃখ দূর হবে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আর, অন্নের পশ্চাতে এই পরম প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই চাই শিক্ষা, চাই সাহিত্য, চাই কাব্য, চাই উপন্যাস, চাই গল্প, চাই নাটক, চাই

ইতিহাস, চাই জীবন-চরিত। সেই মহনীয় সাহিত্যিক কৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপন ক'রে ঋষির স্বপ্নকে সাধারণ মানবের জীবনেও বাস্তবে রূপবন্ত করার সম্ভাবনা বাড়াবার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষার প্রসার। আর তা' যদি না হয়, তাহ'লেও নিরক্ষর মানুষ শিক্ষিত হবে কিন্তু ফল দাঁড়াবে এই যে, শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছোট চোরেরা বড় চোর হবে, ছিঁচকে চোরেরা সিঁদেল চোর হবে, ছোট ছোট ডাকাতেরা বড় বড় ডাকাত হবে, ছোট ছোট প্রবঞ্চকেরা বড় বড় প্রবঞ্চক হবে, গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে গুণ্ডাশাহী কায়েম হবে। মানুষ শিক্ষিতই হবে কিন্তু মানব-সভ্যতার উন্নতি হবে না এক কণাও। এই একটী মাত্র অসম্পূর্ণতার দরুণ শিক্ষা-প্রসারের জগজ্জোড়া ব্যর্থতা এসে যাবে।

চাই দৈবসম্পদে সুন্দর জীবন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আসুরী সম্পদ জীবনকে ভয়ঙ্কর ও আতঙ্ক-জনক করে। এ জীবনে নিজেরও সুখ নাই এক কণা, অপরকেও সুখ দিতে একান্ত অক্ষমতা। এই জীবনের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর একটী নয়নেও খুশীর দীপ্তি ফোটে না, একটী আননেও স্বস্তির সরলতা জাগে না, একটী প্রাণেও হর্ষের হিল্লোল প্রবাহিত হয় না। চাই দৈবসম্পদে সুন্দর জীবন। মানুষের অর্জ্জন, শ্রম, শিক্ষা ও রাষ্ট্রিক আন্দোলন তার ভিতরের দৈবী-সত্তাকে বিকশিত করার জন্যই হওয়া

প্রয়োজন। অন্য উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হবে শিবপূজার উপচারে প্রেতের পূজা করা।

সৎকর্ম্মের প্রকৃত প্রস্তুতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজেই যখন নামতে চাও, তখন গোড়াতেই মনে রেখো যে, মুখের কথায় মহৎ কাজের সফলতা আসে না, অফুরন্ত এবং পদ্ধতিবদ্ধভাবে, ধারাবাহিক এবং বহুবৎসরব্যাপী শ্রমের জন্য তৈরী থাক্‌তে হয়। পরিকল্পনা আগেই স্থির ক'রে নেবে এবং গৃহীত কর্ম্ম-তালিকার প্রতি যথাসাধ্য অনুগত থেকে দিনের পর দিন একই উদ্দেশ্যে কাজ ক'রে যাবে। সাফল্যলাভ সহজ ব্যাপার নয়, একথা জেনেই কাজে হাত দেবে। তাহ'লেই তার অসাফল্য তোমাকে দমিয়ে দিতে পার্কে না। একা কোনো বড় কাজ করা যায় না, সুতরাং সঙ্গী সাথী অনেক চাই। এরা প্রত্যেকেই সমান দক্ষ, সমান শ্রমশীল বা সমান আগ্রহী না হ'তে পারে। এদের এই সকল ক্ষুদ্র ত্রুটি স্নেহের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে হবে। এরা অনেকে দুদিন, দু সপ্তাহ বা দু মাস কাজ ক'রেই হয়ত স'রে পড়বে, তার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। একজন কর্ম্মী চলে গেলে যাতে কর্ম্মায়োজন বানচাল না হ'য়ে যায়, তার জন্য নূতন নূতন কর্ম্মীর আগমন-পথ উন্মুক্ত রাখতে হবে। কাজ চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক ভিত্তিটা যাতে পর-নির্ভর না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে না পারলে, কাজ

দীর্ঘকাল চালানো অসম্ভব হবে। দাতার দানকে নিতান্ত গৌণ সহায়তা ব'লে জ্ঞান কর্ব্বে এবং নিজেদের বুদ্ধিবলে এমন উপায় আবিষ্কার কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্বে, যাতে তোমাদের সৎকর্ম্ম পরিচালনার আর্থিক সঙ্গতি তোমাদের শ্রমক্ষম বাহুযুগলেরই সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকে। উৎসাহদাতা হিতোপদেশকারী সজ্জনের সুদীর্ঘ বক্তৃতাও বিনয় সহকারে শুনবে কিন্তু কাজ কর্ব্বার সময়ে নিজেদের গৃহীত পথেই চল্‌বে, লোকের কথায় প'ড়ে বা কারো অনুরোধ-উপরোধ হেতু কর্ম্মের গতি এবং লক্ষ্যকে পরিবর্তিত কর্ব্বে না। জানবে, এগুলিই হচ্ছে সৎ-কর্ম্মের প্রকৃত প্রস্তুতি। অফিস সাজিয়ে পয়সা নষ্ট ক'রো না। অফিস সাজানো হচ্ছে ব্যবসায়ীদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সেবাকর্ম্মীর প্রয়োজন শুধু শৃঙ্খলা। কাজ করতে নেমে পদস্খলন হ'তে পারে। তার জন্য ভয় পেয়ো না। পিচ্ছিল পথে চল্‌তে গিয়ে জগতে অনেকেই আছাড় খেয়েছেন, কিন্তু তার জন্য শক্তিমান্ ব্যক্তিরা কখনো দমে যান নি। ভুল কখনো ক'রে ফেল্লে জিদের বশে ঐ ভুলেরই ক্রীতদাস হ'য়ে পড়ে না থেকে প্রবল বিক্রমে ভুল সংশোধন ক'রে অধিকতর পরাক্রমে পুনরায় কাজে নেমে পড়বে। কাজের ভুল অধিকাংশ সময়েই এসে থাকে আত্মাভিমান থেকে। তাই থেকে সৃষ্টি হয় নেতৃত্বলোভ, কর্তৃত্বলিপ্সা, যশোলোলুপতা এবং কাজ না ক'রে কাজ করার প্রশংসা অর্জ্জনের গুপ্ত ইচ্ছা। এই পতন যাতে তোমাতে

না আসতে পারে, তার জন্য সর্ব্বদা থাক আত্ম-পরীক্ষা-রত। কাজে ভুল আসে অনভিজ্ঞতা থেকেও। কাজে ভুল আসে স্বার্থপরতা থেকে। কাজে ভুল আসে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মোহ থেকে। কাজে ভুল আসে আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে। যে যে কারণে কাজে ভুল আসে, সেই সেই কারণগুলিকে নিজ চরিত্র থেকে একেবারে নির্ব্বাসিত ক'রে দেবার চেষ্টা হচ্ছে মহৎ কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করার পক্ষে অত্যাবশ্যক প্রস্তুতি।

সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মানুশীলন

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কোরপাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সুবৃহৎ ঘটনাবলী নানা সম্ভাবনার তুফান তুলিয়া জাতির ভাগ্যে আবির্ভূত হইবার প্রচণ্ড তাড়নায় অদৃশ্যে শূন্যলোকে বিচরণ করিতেছে, জাতির অধিকাংশ মানুষের শুধু প্রয়োজন তাহাদের আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া, একামতাবলম্বী হওয়া, কর্ম্মতৎপর হওয়া। কিন্তু জাতির প্রতিভার যদি সেই ভবিষ্যৎ ধরা না পড়ে, তবে বারংবার বিপুল-কল্যাণবহ ঘটনাগুলি আসে অদৃশ্যে, বাহ্য প্রকাশ না ঘটাইয়া শূন্যে মিলাইয়াও যায় অদৃশ্যে। বর্ত্তমান কালের প্রতিভাধর পুরুষগুলির মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে পারিতেছ কি? তাঁহাদের চিন্তা-নিচয়ের প্রাণস্পন্দনটী অনুভব করিতে

পারিতেছ কি? কে বা কাহারা তাঁহাদের মধ্যে যুগ-পুরুষ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি? কেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গিমায় চিন্তা করেন, নির্দ্দিষ্ট ঢংয়ে কথা বলেন, নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ করেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছ কি? একই ঘটনা বারংবার জাতির জীবনে ঘটে, ঘটিয়াছে, ঘটিবে কিন্তু তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্যকে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে ও উপলব্ধিতে পূর্ণায়মান করিবার জন্য তোমাদের অধ্যবসায় জাগিয়াছে কি? এ প্রশ্ন তোমরা প্রত্যেকে নিজেকে নিজেরা কর। অলস কল্পনায় অথবা উন্দাম হুজুগে তোমরা সত্যকে ধরিতে পারিবে না। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মানুশীলন।"

ধৈর্য্য সহকারে অগ্রসর হও

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত কিশোরগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একটা দেশের ভাগ্যের পরিবর্ত্তন একটা লোকের দ্বারা হইতে পারে না, সমস্ত লোকের বা অধিকাংশ লোকের একমুখ একমন হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট তপস্যায় লাগিয়া যাইতে হয়। তপস্যা মাত্রেই বিঘ্নবহুল। সদ্যঃ এবং দূরবিলম্বী বিঘ্নসমূহের প্রকৃত তথা প্রকৃষ্ট পরিচয় জানিয়া নিয়া প্রতিটি বিঘ্নকে সমূলে উৎখাত করিয়া করিয়া আস্তে আস্তে ধৈর্য্য-সহকারে লক্ষ্য-পথে অগ্রসর হইয়া যাইতে হয়। চরিত্র হইতে

অনুচিত সহিষ্ণুতা যাহাতে অন্তর্হিত না হইয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সেই দিকে দাও দৃষ্টি, সেই দিকে রাখ স্থির লক্ষ্য, সেই দিকে যাও আগাইয়া, সেই মতে কর কাজ। ক্ষণিকের অসাফল্য বা সাময়িক অবসাদকে দাবাইয়া রাখিয়া আশাপূর্ণ নেত্রে দিকে দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং যাহা-কিছু দেখিবে, তাহা হইতেই নূতন অর্থ, নূতন দ্যোতনা, নূতন তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর।"

অরাজনৈতিক সমাজ-সেবা করিতে থাক

কুমিল্লা জেলান্তর্গত চাত্রোয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"রাজনীতি-ক্ষেত্রে যাঁহারা দার্শনিক, তাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতির মধ্য হইতে দুইটি মেক বাছিয়া নিয়া যে উভয় হইতে দূরে থাকিতে চাহিতেছেন, সম্ভবতঃ ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে। জনমত ইঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও জনকে অন্যায় ভাবে মডারেট আখ্যা দিয়া ধূলাবলুণ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে এবং সেই প্রয়াসে সফলও হইয়াছে। কিন্তু গুপ্ত-হত্যার পথে কোনও রাজনৈতিক সংসিদ্ধি আসিলে তাহা যে আরও শত শত সহস্র সহস্র গুপ্ত হত্যাকেই প্ররোচিত, পরিপোষিত, প্রবর্দ্ধিত ও প্রশ্রয়পরায়ণ করিবে,

এই স্বাভাবিক নিয়মকে প্রতিরোধ করিবে কে। বর্ণপ্রকারের ক্ষেত্রেও গুপ্তহত্যাকে একটী উৎকৃষ্ট সাধন-রূপে গ্রহণ একদা করা হইয়াছিল বা হইতেছিল বলিয়া অনুমান করিবার মত উপকরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা না রাজনীতির দিক্ দিয়া, না ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়া সফল হইতে পারিয়াছে। দেশাভিমানী যুবকদের দেশসেবার দিক্ দিয়া, বিশ্বসেবাভিমানী যুবকদের বিশ্বকল্যাণসাধনের দিক্ দিয়া হত্যাকে হাতিয়ার করার মত ভ্রম আর কিছু নাই। কারণ, হত্যা করিতে করিতে হত্যাকারীর মনের স্বভাবে এমন এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতা আসিয়া যায়, যাহার ফলে ভবিষ্যতে সে হত্যাকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গণনা করিতে থাকে, ইহা যে উদ্দেশ্য-বিশেষ সাধনের উপায়-রূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা সে ভুলিয়া যায়। ইহা মনস্তত্ত্বের কথা, ভালো বা মন্দের কথা বলিতেছি না। অপর দিকে হিংসা মাত্রকেই বর্জ্জন করিয়া আন্দোলন পরিচালনের দিকে ঝোঁক দিতে থাকিলে, আন্দোলনকারীদের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন এক পতন আসিয়া যায়, যাহার ফলে যুদ্ধ না করিয়া কেল্লা ফতে করিবার সুযোগ পাইলে তখন দামী ও নামী লোকেরা জনগণের স্থায়ী সুখ-শান্তির বিবেচনা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া জানিয়া-শুনিয়া এবং সজ্ঞানে দেশের প্রকৃত কল্যাণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই জন্যই জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত পরিচয় বা অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া যাওয়া উচিত প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে। যোদ্ধার

চরিত্রে ঘাতকের হীনতা থাকে না। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধোদ্যম দুর্বল ও চরিত্রহীনেরা করিতে পারে না। প্রকাশ্য যুদ্ধোদ্যমে দীর্ঘকালব্যাপী সহিষ্ণু প্রস্তুতির ও অনুশীলনের প্রয়োজন। ইহার সুযোগ না পাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার প্রবৃত্তি হেতু 'ইহাকে মার' আর 'উহাকে কাট' করিয়া বেড়াইলে দেশময় অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় কথা এই যে, বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডে যাহারা লিপ্ত হইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদের মনের গঠন বিকৃত হইয়া যায়। ইহা মানব-সমাজের গুরুতর ক্ষতি এবং মানব-সভ্যতার দারুণ কলঙ্ক। কিন্তু রাজনীতির জগতে কখনো কখনো সন্ত্রাসবাদ, কখনো কখনো সুবিধাবাদ নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিতেই থাকিবে। তোমরা ভাবী ভারতের মহনীয় সুকৃতির দিকে তাকাইয়া অরাজনৈতিক ভাবে আত্মগঠন ও সমাজ-সেবা করিতে থাক।"

রুচি দান করিতে হইবে

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কোরপাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতে একটী মানুষও নাই, যাহার দ্বারা কোনও না কোনও প্রকারের পরোপকার সম্ভব নহে। কিছু না কিছু জীবহিতসাধন প্রত্যেকের পক্ষেই সুসম্ভব কিন্তু কাজটুকু করিবার রুচি ত' তাহার থাকা চাই। যাহার রুচি নাই,

তাহাকে রুচি দান করিতে হইবে। এই দান যিনি দিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ। জগতে যুগে যুগে যত যত মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের সব চেয়ে শ্লাঘ্য কাজ হইতেছে ইহা। তোমার নিজের ভিতরে যদি সৎকর্ম্মের রুচি থাকে, তবেই তুমি সহজে অপরের ভিতরে সেই রুচি সৃষ্টি করিতে পার।"

জীবনকে সফল করিবার সহজ পথ

খুলনা জেলান্তর্গত সাতক্ষিরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি দশ দিকে চোখ রাখিয়া পথ চলেন। সাধনশীল ব্যক্তি শুধু একটী দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পথ চলেন। সেই লক্ষ্যটী তাঁহার ইষ্ট। ইষ্টে মনকে একান্ত ভাবে নিবেশিত করিবার ফলে তাঁর হাত, পা, চোখ, মুখ, নাক, কান যেখানে যাহা করিবার, ঈশ্বর-নির্দ্দেশে আপনা আপনি তাহা করে, জোর-জবরদস্তিও করিতে হয় না, যুক্তি-তর্ক-বুদ্ধিও বিশেষ খাটাইতে হয় না। জীবনকে সফল করিবার ইহাই সহজ পথ। যদিও বলিলাম ইহা সহজ, তথাপি স্বীকার করিব যে, ইহা সকলের চেয়ে কঠিন। সহজ বলিয়াই এপথে লোকে চলিতে চাহে না,—না চলিতে চলিতে সুগম পথও দুর্গম হয়।"

অভিমান বিসর্জ্জন দাও

কুমিল্লা জেলান্তর্গত রঘুনাথপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি আমার নিজের অল্পবুদ্ধি দ্বারা যেটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য এবং সুগভীর সম্প্রীতির সৃষ্টি-পথে বাধা দিয়াছে এবং দিতেছে তোমাদের প্রতিজনের অত্যুগ্র আত্মাভিমান। আমি অমুকের চাইতে ছোট কিসে, অমুকেই বা আমার চাইতে বড় কিসে, এই-জাতীয় একটা অহংপ্রিয়তা মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলে সে কদাচ অপরের সহিত মিলিতে পারে না, মিলিবার চেষ্টা করিলেও তাহার কল্যাণ-কর্ম্ম-প্রয়াস কদাচ নিখুঁত হয় না। আমি চাহি যে, যে যাহাই হও, প্রত্যেকে অভিমান বিসর্জ্জন দাও। আমি সম্মান পাইলাম না বলিয়া সৎকার্য্যে হাত লাগাইব না, অপরে আমার চেয়ে বেশী সম্মান পাইয়া গেল বলিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া হাত গুটাইয়া ফেলিব, এই-জাতীয় আচরণ হইতে নিজেকে একেবারে মুক্ত করিয়া ফেল। দেখিও, আফ্রিকার সামান্য ভূমি কাল কি অসাধারণ ও কৃতিত্ব-সমুজ্জ্বল কর্ম্ম-সমূহ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। একদল লোক জগতে আছে, যাহারা অপরের শ্রমের কৃতিত্বটুকু নিজেরা কাড়িয়া লয়, কিন্তু তাহাদের পতন নিতান্তই অদূরে। বৃথা অভিমান করিয়া লাভ নাই।"

তরবারি কোষমুক্ত কর

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত ধলঘাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"দেশটা যখন প্রাচীন, তখন ইহার ইতিহাস যে বিচিত্র হইবে, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। দেশ বলিতে এখানে আমি দেশের মাটি বুঝাইতেছি না। মাটির প্রাচীনত্ব সকল দেশেরই সমান। পৃথিবী একদিনেই জন্ম নিয়াছিল, তবে কোথাও জল মৃত্তিকা হইয়াছে, মৃত্তিকা জল হইয়াছে,—সাগরে আর মাটিতে এই পালাবদলের রঙ্গলীলা কয়বার ঘটিয়াছে।

"সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী হইলেও স্বাধীনতার গৌরবে আমরা চিরকাল উজ্জ্বল ছিলাম না। কতবার এই দেশ বিদেশী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, আমরা আস্তে আস্তে তাহাদিগকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। তথাপি নূতন বিদেশীরা আসিয়াছে। শস্যশ্যামলা স্বর্ণভূমি বলিয়াই বিদেশীদের এখানে এত লোভ। ভারত ক্ষাত্রশক্তিতে দুর্ব্বল ছিল বলিয়াই আফগানিস্থান, পারস্য ও আরবের মৃত্তিকা জয় করিতে বহির্গত হয় নাই, তাহা নহে, প্রধানতঃ ঐ সকল দেশ ভূমি-সম্পদে দীন, ঐ সকল দেশের মাটির উর্ব্বরতার উৎস ক্ষীণ ও দুর্ব্বল বলিয়াও কাহারও লুব্ধ দৃষ্টি সেই দিকে পড়ে নাই। ভারতীয় চিন্তার যুদ্ধবিরোধী স্বাভাবিক মনোবৃত্তিও তাহার

একটী কারণ। একজন চণ্ডাশোক কলিঙ্গের যুদ্ধের পরে অন্তরের নির্ব্বেদ অনুভব করিয়া ধর্ম্মাশোকে পরিণত হন, কিন্তু একজন তৈমুরলং বা নাদির শাহ্ তাহা হন নাই। ভারতের দিগ্বিজয়েচ্ছার আত্যন্তিক অভাবের ইহাও একটী প্রকট কারণ। কিন্তু জনমনে যুদ্ধবিরোধী সাধারণ অরুচি থাকার দরুণ বাহিরের শত্রুকে প্রতিরোধ করারও বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এগুলিও ঐতিহাসিক সত্য। তাই, নানাবিধ উপদ্রবের মধ্য দিয়া আমাদের পুরুষানুক্রমে বাড়িতে হইয়াছে। কিন্তু চিরকালই যে তাহা চলিবে, এমন ভাবিবার সঙ্গত কারণ নাই। অতীতের বহু অত্যাচার, বহু উৎপীড়ন, বহু অমানুষিক বর্ব্বরতা পুনরায় আমাদের কপালে লিখা রহিয়াছে কিন্তু সমগ্র জগতে সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে অতি নীরবে যে তীব্র ঘৃণা জাগ্রত হইয়াছে, গণতন্ত্র নাম ধরিয়া তাহা এই দেশেও প্রচারিত প্রসারিত হইতেছে। হয়ত মানুষ একদা এই পথে নিজের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জ্জন করিবে। হয়ত মানুষ নব্যতর পন্থার আবিষ্কার করিয়া জীবনের উপরে তাহার চরম পরীক্ষা লইবে। যে-কোনও অবস্থায় অসহনীয় দুঃখ ও দুরপনেয় দুর্দ্দশার কর্দ্দমাক্ত পথের মধ্য দিয়া সবল চরণে দেশের মানুষকে আগাইয়া যাইতে হইবে। এই ভাবেই হইবে দেশের জনগণের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অনিশ্চিত জয়যাত্রা। প্রত্যেকে প্রস্তুত হও, তরবারি কোষমুক্ত কর।"

উচ্চাদর্শ মানুষদের ঐক্য ও দিব্য ইতিহাসের সৃষ্টি

ঢাকা জেলান্তর্গত বালিগাঁও-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আপনা আপনি কি কি ঘটনাবলি ঘটিবে, তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিও না। পৃথিবীর ইতিহাস মানুষ নিজের শক্তিতেই সৃষ্টি করিয়াছে। যখনি অসংখ্য মানুষের ইচ্ছা হইয়াছে এক, লক্ষ্য হইয়াছে এক, চেষ্টা হইয়াছে এক, অনুভব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যখন অসংখ্য মানুষ একটী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, সেইখানেই প্রচলিত ইতিহাস নূতন মোড় নিয়াছে। এই কথাটিকে মনে রাখিয়া প্রতিজনে প্রতিজনের সহিত ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করিবার উপায় আবিষ্কার কর। নিষ্কলঙ্ক শুভ্র-চরিত্রের উচ্চাদর্শ মানুষদের ঐক্য জগতে দিব্য ইতিহাসের সৃষ্টি করিতে পারে। স্বার্থান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লোভাতুর মানুষদের ঐক্য জগতে অশান্তি আর হাহাকারই মাত্র সৃষ্টি করিতে পারে। জগৎ হইতে অশান্তি ও হাহাকার দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা ঐক্যবদ্ধ হইবে, তাহারাও যদি নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে সৎ না হয় এবং সমষ্টিগত জীবনে পরস্পরের সহায়ক, অনুপূরক, শক্তি-সামর্থ্যবর্দ্ধক ও অনুকূল না হয়, তাহা হইলে এমন লোকদের সংহতিও কদাচ নিজ লক্ষ্য-সাধনে সফল হইবে না। তাহারা নিজেরা

যদি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ এবং মহৎ হয় এবং তাহাদের ঐক্য যদি প্রশ্নাতীত হয় কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের অবলম্বিত উপায়-সমূহ যদি দোষহীন, ক্লেদহীন, অমলিন না হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে যাহা ঘটিবে, তাহাও যে জগতের শান্তি-বর্দ্ধনই করিবে, এমন মনে করিতে পারি না। বর্ত্তমান মানবের সভ্যতা আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর বাঁচিবে এবং বাড়িতে থাকিবে। সেই সভ্যতা যদি হিংসার মত্ততা, বিদ্বেষের বিষোদ্গার ও নির্ব্বিচার নিষ্ঠুরতার কবল হইতে মুক্তি না পায়, তবে সভ্যতা-রূপে তাঁহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া যাইবে। ইতিহাস দিব্য জীবনের দিকে পদ-সঞ্চার করিবে, ইহাই জগতের সকল ঋষির একটী অসাধারণ স্বপ্ন।"

অপরাহ্ণ কালে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্মুখস্থ মাঠে একটী জনসভার অধিবেশন হইল। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি ৫টা ৩০ মিনিট হইতে ৬টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত একটী চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করিলেন।

যুবশক্তি ও অভিভাবকশ্রেণীর দায়িত্ব

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ক্ষুদ্র একটী বটের বীজ আয়তনে যতই ছোট হউক, তার ভিতরের সম্ভাবনা কিন্তু তুচ্ছও নয়, ক্ষুদ্র নয়। জগতে অশেষ-সম্ভাবনাময় যৌবনেরই

জয়-জয়কার। কিন্তু একে অনুকূল পরিবেশ ও লালন দিয়ে বিকশিত হবার সুযোগ আমাদেরই ক'রে দিতে হবে। পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজ-সেবকের এইটা একটী বিরাট দায়িত্ব। পিতামাতা, শিক্ষক এবং সমাজসেবকেরা যদি নিজেদের এই গুরুতর দায়িত্ব সম্যগ্‌রূপে প্রতিপালনের করতে পারেন, তা' হ'লে যৌবন তার পূর্ণ বিভায় আত্মপ্রকাশ ক'রে জাতির ভবিষ্যৎকে নবজন্ম দান করতে পারে।

যৌবনের জাগরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু যে দেশে রাজকার্য্য প্রজার ইচ্ছায় চলে না, সেই দেশে অভিভাবক-শ্রেণী নিজের সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য নিজেদের সাধ অনুযায়ী পালন করতে পারেন কিনা সন্দেহস্থল। সেই সকল ক্ষেত্রে যুবকদের মধ্যে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের ক্ষমতায় গ'ড়ে তোলবার জন্য বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করা দেশহিতৈষী মাত্রেরই পবিত্র কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্যই নয়, এটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। যুবকেরাই যে দেশের ভবিষ্যৎ, এটা শুধু কথার কথা নয়, তারা কেবল ভবিষ্যৎই নয়, তারা নবতর ভবিষ্যতেরও স্রষ্টা। এই স্রষ্টাদের সৃষ্টিশক্তিকে অবারিত, অব্যাহত, নিরঙ্কুশ এবং অপরাজেয় রাখবার জন্য প্রথমেই উপদেশ দিতে হবে ব্রহ্মচর্য্যের, ত্যাগের, সংযমের এবং কষ্টসহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণের। অবিরাম ঈশ্বর-চিন্তন কর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে না। নিজেদের সঙ্কল্পের শক্তি দিয়ে তারা

তাদের মনোরাজ্যের যাবতীয় বিশৃঙ্খলতার উপরে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন কর্ব্বে, এই অনুশাসনটীও তা'দিগকে নিতে হবে। ঈশ্বরকৃপা আর পুরুষকার যখন হাত ধরাধরি ক'রে পাশাপাশি চল্‌বে, যৌবনের জয় হবে তখন। তখন যৌবন অনায়াসে বিশ্ববিঘ্ন পদাহত ক'রে দিগ্বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হ'য়ে তার মহিমান্বিত পদসঞ্চার চালিয়ে যাবে নির্ভয়ে। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জীবিকার্জ্জনে, সেবায় ও দেশহিত-সাধনে সর্ব্বত্র যে নিজ পৌরুষকে মর্য্যাদা দান ক'রে চলা যায় এবং চলা যে উচিত, এই প্রেরণা যুবকদের নিতে হবে। যৌবনের জাগরণ হবে তাতে।

পৌরুষের পরাক্রম

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভিক্ষার ঝুলিকে সম্বল না ক'রে যারা নিজ-পৌরুষকে করে অবলম্বন, পরমেশ্বরের পরম কৃপা নিয়ত তাদের সমুন্নত শিরে অঝোরে বর্ষিত হয়। অদম্য হয় তাদের তেজ, অতুলনীয় হয় তাদের সাহস, অনমনীয় হয় তাদের নীতিজ্ঞান। মিথ্যার সঙ্গে, অসত্যের সঙ্গে আপোষ ক'রে চলার প্রলোভন কদাচ তা'দিগকে মুগ্ধ করতে পারে না। তাদের কাছে দেশের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ, মানুষ মাত্রেরই স্বার্থ একেবারে নিরাপদ। তারা কেবল নিজেরাই নির্ভয় নয়, তারা শত শত ভয়ভীতের অভয়দাতা। সত্যনিষ্ঠ পৌরুষের এইটী হচ্ছে পরাক্রম।

অভিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভিক্ষালুব্ধ ভারত মাগা-মাগা ছাড়া অন্য পথের খবর রাখে না। তাই, আজ দেশে বিদেশে তার এত দুর্গতি এত লাঞ্ছনা। আত্মবিশ্বাসের আলোক-শিখা যদি তার অন্তরে জাগ্‌ত, তবে সে ভিক্ষার পথ পরিহার ক'রে আত্মশক্তির অনুশীলনে ব্রতধারী হ'ত। ভিক্ষা তার মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হওয়াতে, সে তার নিজের চরিত্রবলের উপরে নিজেই বিশ্বাস রাখতে পারে না। সংগ্রামের সহস্র পাঁয়তারা হঠাৎ একদিন এক দানসত্রের সামনে এসে থমকে দাঁড়াবে এবং ভিক্ষার চাল কাঁড়া না আকাঁড়া সে বিচার না ক'রে নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ ক'রে হয়ত দেশকে নূতন বিপদে ফেলে দেবে। এই জন্যই, আমার মতে সমগ্র দেশের সমগ্র যুবক-সমাজকে ব্রহ্মচর্য্যের প্রেরণা দানের সঙ্গে সঙ্গে অভিক্ষার প্রেরণাও দেওয়া একান্ত আবশ্যক। আমি, সমাজের একটী অতি ক্ষুদ্র সেবক, সেই জন্যই ভিক্ষার পথ জীবনে মাড়াই নাই। যা হবার, পৌরুষ-বলেই হবে, ভিক্ষার শক্তিতে নয়।

ভারতের অভ্যুদয়ের পথ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভিক্ষাকে বর্জ্জন ক'রে চল্‌তে

হ'লে পরমেশ্বরের অপরিমেয় শক্তিতে অখিচল বিশ্বাস চাই, আর চাই সেই বিশ্বাসকে চিরস্থায়ীমান রাখবার জন্য নিজ জীবনে শুচিশুদ্ধ সংযমের অনুশীলন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিটি পল্লীতে, প্রতিটি কুটীরে, প্রতিটি মন্দিরে, প্রতিটি শিক্ষায়তনে শত কণ্ঠে সহস্র কণ্ঠে লক্ষ কণ্ঠে এই কথা ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন যে, ভিক্ষালুব্ধতাকে দূর করে হবে, জীবনকে পরমপবিত্রতার বেদীমূলে প্রতিষ্ঠিত করে হবে। ভারত যদি কখনো সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, তবে এই দুইটির প্রতাপেই তা' সম্ভব হবে। এ দুটিই হচ্ছে ভারতের সুনিশ্চিত অভ্যুদয়ের, স্থায়ী উন্নতির একমাত্র পথ।

হাইলাকান্দি

৩রা ফাল্গুন, শুক্রবার, ১৩৪১

(১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

অদ্য স্থানীয় টাউন হলে মহিলা শ্রোতাদের সমক্ষে বক্তৃতা দিবার কথা। কিন্তু যে-কোনও কারণেই হউক, টাউন-হলটী পাওয়া গেল না। একজন বলিলেন, আজ মুসলমানদের ঈদ পর্ব্ব। প্রতি রাস্তায় অফুরন্ত জনতা। মহিলারা আজ ঘরের বাহির নাও হইতে পারেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঠিক আছে। যার হাতে অনেক কাজ, তার অসুবিধাটা কি? অসংখ্য পত্র জমে আছে, তারই উত্তর দিব।

কাজ ও অকাজ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যেটা একজনের পক্ষে কাজ, সেটাই আর একজনের পক্ষে অকাজ। কিন্তু যে কাজে নিজের কোনও কুশল নেই, জগতেরও কোনো কল্যাণ নেই, এমন কাজ যত চাকচিক্যপূর্ণই হোক না কেন, সকলের পক্ষেই অকাজ। যে কাজে নিজের স্বার্থের চেয়ে পরের মঙ্গল অধিক, সে কাজই প্রকৃত কাজ। যে কাজে নিজের শ্রম, নিজের চেষ্টা, নিজের শক্তি, নিজের অর্থ এবং নিজের প্রতিপত্তি অপর দশ জনের হিতসাধনার্থ নিয়োজিত হয়, সেটী সকলের পক্ষেই কাজ। যে কাজে বিমল আত্মপ্রসাদ নেই, আছে শুধু অহঙ্কারের পরিচর্য্যা, যে কাজে অপরের চিত্তে নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধা জন্মে না, জন্মে ঘৃণা ও বিরক্তি, সেগুলি অকাজ।

কাজ ও অকাজ চিনিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবামণি আরও বলিলেন,—কোন্‌টী কাজ আর কোন্‌টী যে অকাজ, ধীমান্ পুরুষেরাও অনেক সময়ে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারেন না। সাধারণ লোকের ত' কথাই নেই। কাজ করছ না অকাজ করছ, এই প্রশ্ন যখন মনে জাগ্‌বে, তখন ক্ষণকালের জন্য কাজ করা বন্ধ ক'রে দাও, নিজেকে প্রখর সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করে চেষ্টা কর, সূক্ষ্ম

অনুভূতির দ্বারা নির্দ্ধারণ ক'রে নাও যে, একাজের পশ্চাতে তোমার অভীপ্সাটি কি ছিল। ক্ষুদ্র কামনা যদি তোমাকে এই কাজে লিপ্ত ক'রে থাকে, তবে তুমি সুকাজ কচ্ছিলে না, এটা ধ'রে নিতে পার। উচ্চ প্রেরণা যদি তোমাকে এ কাজে প্রবর্ত্তিত ক'রে থাকে, তবে তুমি অকাজ কচ্ছিলে না, এইটাও মেনে নিতে পার। লোকহিতকর জগন্মঙ্গলজনক পুণ্য কার্য্য করার মধ্যেও তোমার নিজস্ব অনেক লাভ আছে ব'লেই সে কাজ অকাজ হবে না, সুকাজই হবে। কিন্তু লোক-কল্যাণের ভাঁওতা দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য যে কাজ, সেটা দেখ্তে বাহ্যত যত সুন্দরই হোক, সেটা অকাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজের উৎস-স্বরূপ যে প্রেরণা, পদে পদে তাকে যাচাই কর,—কাজ থেকে অকাজ বেছে নিতে কোনো কষ্ট হবে না।

কিসে আমি খুশী হই

একটী যুবক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল। লাজবিনম্র মৃদুকণ্ঠে বলিল,—ঠাকুর, আপনাকে যেন আমি খুশী কর্ত্তে পারি।

শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে হে? তোমাকে ত' আগে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। তুমি আমার পরিচয় পেলে কি ক'রে?

যুবকটী বলিল,—আমার বাড়ী এখান থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ

মাইল দূরে পল্লীগ্রামে। সহরে একটা কাজে এসেছিলাম। শুনলাম, কার নাকি বক্তৃতা হবে। সভাস্থলে চুপচাপে বসে গেলাম। আপনার বক্তৃতা শুনে মনে বড় উৎসাহ জাগল। ভাবলাম, মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাই।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমাকে খুশী করা ত'? শিব ঠাকুরকে যেমন অল্পে খুশী করা যায় ব'লে প্রবাদ আছে, আমার সম্পর্কেও তেমন জানবে। তুমি যদি সদ্ভাবে চ'লে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে দুবেলা পেট ভ'রে আহার করতে পার, তা হ'লেই আমি খুশি। তোমার ঐ পবিত্র অন্ন থেকে এক মুঠি তুলে নিয়ে যদি তোমার গরীব প্রতিবেশীকে দিতে পার, তাহ'লে আমি আরও খুশী। তোমার পরিচিত প্রত্যেকটী লোকের প্রাণে যদি সদুপায়ে জীবিকার্জ্জনের এবং সাধ্যমত কিছু কিছু পরার্থে নিয়োজন করার আগ্রহ জন্মাতে পার, তবে তিন জগতে আমার মত খুশী আর কেউ নেই, জানবে। নিজে পেটটা ভরে খাওয়া আর দু'দশ জনকে খাওয়ান, একটা স্থূল খুশীর কথা। নিজে নিঃস্বার্থ হ'য়ে চলবার মত জ্ঞানার্জ্জন করা এবং অন্যকে সেরূপ জ্ঞানে বিভূষিত করা, তার চেয়েও বড় কথা। নিজে সর্ব্বজীবের সুখধ্যানে নিমজ্জিত হ'য়ে যাওয়া এবং অন্যকেও তেমনটি হ'তে সহায়তা করা আর পরসুখধ্যানী মনটি নিয়ে অক্লেশ বেগে নিরলস কর্ম্ম ক'রে যাওয়া, সব চেয়ে বড় কথা। এ কাজ যে কর্ত্তে পারে, সে-ই আমাকে খুশী করে।

আশাবাদী ও সাহসী হও

একটী যুবকের সম্মুখে কি একটা পরীক্ষা। যুবকটী বড়ই উদ্বিগ্ন চিত্তে সাধুদর্শন করিতে আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—মন থেকে উদ্বেগকে দাও নির্ব্বাসন। সমগ্র জীবনটাই একটা পরীক্ষা। যোগ্য ভাবে উত্তীর্ণ হবার জন্য যথাসাধ্য উদ্যম প্রয়োগ কর। যেটুকু তোমার সাধ্যাতীত, সেইটুকু সম্পর্কে সর্ব্বদা থাক বেপরোয়া দুঃসাহসী। হেরে যাব, মরে যাব বা অকৃতকার্য্য হ'ব, এরূপ চিন্তাকে মনের কোণেও আসতে দেবে না। সর্ব্বদা মাথা ঠিক রেখে চলতে হবে। সর্ব্বদা আশাবাদী ও সাহসী থাকো। দুরন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও আত্মবিশ্বাস হারাবে না, ভগবদ্ বিশ্বাস হারাবে না।

আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্বিশ্বাস চাই

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দুরন্ত দুর্য্যোগে মাথা ঠিক রাখতে হ'লে আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্‌বিশ্বাস এই দুটোকেই সমান ভাবে অটুট রাখতে হবে। আত্মবিশ্বাস দেবে তোমার বর্ত্তমান সামর্থ্যকে পূর্ণতঃ প্রয়োগের পটুতা, ভগবদ্বিশ্বাস তোমাকে দেবে অজানিত ভবিষ্যতেও নিজেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকার যোগ্যতা। তুমি যে

অব্যর্থলক্ষ্য তীরন্দাজ বা গোলন্দাজ, এর উপরেই তোমার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। তীর ছোঁড়ার সময়ে বা গুলি মারার কালে তোমার হাত, পা, বুক যাতে না কাঁপে, তার ব্যবস্থাও প্রয়োজন।

আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্‌বিশ্বাস কখন অবিরোধী

একজন প্রশ্ন করিলেন,—আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভগবদ্বিশ্বাসের বিরোধ নেই?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আছে, যখন আত্মবিশ্বাসী পুরুষ মনে করে যে, তার শক্তির মূল উৎস সে নিজে। কিন্তু বিরোধ থাকে না তখন, যখন সে জানতে পারে যে, তার সকল শক্তির, সকল সামর্থ্যের, সকল পুরুষকারের আদি, অকৃত্রিম এবং অনন্য উৎস হচ্ছেন শ্রীভগবান্।

সর্ব্বাবস্থায় মনকে ভগবন্মুখী রাখিবার উপায়

অপর এক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—মন বিষয় নিয়ে বিব্রত, এর মাঝে ভগবৎসাধন কি ক'রে কর্ব্ব?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এটাই ত' এযুগের সবার চাইতে বড় প্রশ্ন। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও

সংসারের ন্যূনতম চাহিদা মিটান যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় মানুষগুলি ভগবানকে ডাকবে কখন? এইটা কেবল তোমার একার সমস্যা নয়, দুনিয়া-ভোর সকল লোকের হচ্ছে এটা সমস্যা। কিন্তু তার সমাধানও সহজ, তবে অভ্যাস সাপেক্ষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ কাজের ভিতরে থেকেও কি ক'রে মনটাকে ভগবানের দিকে ঠেলে রাখা যায়, তার একটু অনুশীলন প্রয়োজন। প্রত্যহ একটু একটু ক'রে করতে করতে শেষে মনের এমন এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মে যায় যে, অতি বিরাট, অতি জটিল, অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈষয়িক কাজের সময়েও মনটাকে ভগবানের চরণ-স্পর্শ থেকে আর দূরে রাখা সম্ভব হয় না। তোমরা তাই অভ্যাস কর। কথাটা শুনে গেলে, তাতেই হবে না। কথাটাকে কাজে পরিণত কর্বার জন্য অভ্যাসও চালিয়ে যাওয়া চাই।

কঠিন কাজ সহজ করিবার উপায়

জিজ্ঞাসু।—কাজটা কিন্তু কঠিন ব'লে মনে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি। কঠিন বই কি। কিন্তু কঠিন কাজও সহজ করার উপায় আছে। প্রথম উপায় অফুরন্ত আশা। দ্বিতীয় উপায় বিরামহীন চেষ্টা। তৃতীয় উপায় ভগবানে ভালবাসা। এই তিনটিই আবার অনুশীলন-সাধ্য। যে এমন পবিত্র অনুশীলনে নামে, ভগবান্ দয়া ক'রে তাকে আরো বেশী

করে আশা দেন, বেশী করে চেষ্টাশীলতা দেন, বেশী করে ভালবাসা দেন।

দারিদ্র্য ও ধন

অপর একজন সত্যার্থী প্রশ্ন করিলেন। দারিদ্র্যের কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দারিদ্র্যকে দুঃখ ব'লেও জেন না, দুর্ভাগ্য ব'লেও গণনা ক'রো না। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্র দারিদ্র্যের মহিমা-কীর্ত্তন করেছেন। দরিদ্র হওয়া পাপও নয়, অপরাধও নয়। তবে, বর্ত্তমান যুগে দরিদ্রের পক্ষে আত্ম-সম্মান বজায় রেখে চলা বড়ই শক্ত। সেই কারণে নিজ নিজ দারিদ্র্য নিজভুজবীর্য্যে দূর করার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য কিন্তু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি হ'তে পার নি ব'লে আত্মগ্লানি রাখা সঙ্গত নয়। জগতে ধনীরাই যে সুখী, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অধিকাংশ স্থলে অতিধন অতিপাপের প্রশ্রয়দাতা, অতিপাপ অতিদুঃখের জনয়িতা। উপার্জ্জন করবে ধনলোভ বর্জ্জন ক'রে, উপার্জ্জিত অর্থ আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'লে ভবিষ্যতের আপদ-বিপদের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সঞ্চয় ক'রে বাকীটা আর দশ জন দরিদ্রকে নিজবলে দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টায় নিয়োগ করার জন্য ধার পার ধার দেবে, দান পার দানই কর্বে। ধার দিলে তার সুদ নিও না, ধার আস্তে আস্তে পরিশোধের সুযোগ দিও।

কুসীদজীবীর আবির্ভাব

প্রশ্ন উঠিল,—ধার দিলে লোকে আর ধার শোধ করতে চায় না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—অতিরিক্ত লাভ হয় এই যে, যে ব্যক্তি ধার নেওয়ার পূর্ব্বে ছিল একান্ত সজ্জন এক বন্ধু, সেই ব্যক্তিই হঠাৎ পরিণত হ'য়ে যায় এক দুর্জ্জন শত্রুতে। কেমন, এই ত' কথাটী! একথা অনেক স্থলেই সত্য। সুতরাং কাউকে ধার দিতে হ'লে পরিশোধের আশা না রেখেই দেওয়া উচিত। তারপরেও যদি দেনদার দেনা শোধ করে, তবে বুঝতে হবে জোর বরাত। লটারির টিকিট কিনে অধিকাংশ সময়েই যেমন টাকা পাওয়া যায় না, হতাশাই সার হয়, লোককে ধার দিলেও ঠিক তেমনি কদাচিৎই টাকা ফেরৎ আসে, না আসাটাই স্বাভাবিক। ধার নিয়ে লোকে যতটা কৃতজ্ঞ হবে, ধার শোধের তাগাদা পেলে তার দশগুণ হবে রুষ্ট। মানুষের ভিতর থেকে আদিম-সরলতা এবং অকপট সততার হ্রাস ঘটাতে এটা সম্ভব হয়েছে। এজন্যই পাওনাদারেরা টাকা ধার দিতে শুরু কর্ল, সুদের অঙ্গীকারে। পুরো টাকা দিতে হচ্ছে না, দিতে হচ্ছে আংশিক একটা সুদ, এটা দেনদারের পক্ষে একটা মস্ত বড় সুবিধা। আর, মূল টাকা ফেরৎ পাওয়া যাক্ আর না যাক্, সুদ রূপে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা ত' ঘরে আসছে, এই নিশ্চিন্ততা থেকে সুদের

ব্যবসায়ের হ'ল উৎপত্তি আর প্রসার। কিন্তু সুদ-ব্যবসায়ীর দৃষ্টি হ'য়ে যায় বড় সঙ্কীর্ণ এবং কৃপণতা হ'য়ে যায় তার স্বভাব। এর ফলে নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, লোভ, অসদাচার, অবিচার প্রভৃতি হ'য়ে দাঁড়ায় তার চরিত্রের ভূষণ। এই জন্যই ইসলাম ধর্ম্মে সুদখোরকে কঠোর ভাবে নিন্দা করা হয়েছে, এই জন্যই কুসীদ-জীবীকে হিন্দু-শাস্ত্র জল-অচল অপাংক্তেয় ক'রে ছোট জাতে পরিণত করে রেখেছেন। অধিকাংশ কুসীদজীবীই খাতক বা দেনদারকে এমন ভাবে শোষণ ক'রে আসছে, যাতে এদের স্বপক্ষে আজ কথা বল্‌বার লোক একটীও নেই। অথচ, গরীবের পক্ষে অনেক সময়েই টাকা ধার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজনের সময়ে লোককে টাকা ধার দেবে কিন্তু ধারের টাকা আদায় করার যোগ্য ব্যবস্থা না ক'রে কি তারা টাকা দেবে? আর, তারাই কি বিনা সুদে টাকার দাদন কর্ব্বে? সুতরাং ধার করা আর ধার দেওয়া এই দুটোই দীর্ঘকাল জগতে এক অস্বস্তিকর সমস্যা-রূপে বিরাজ কর্ব্বে, মনে হচ্ছে।

অঋণী থাক

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—প্রাচীন ভারতে তাকেই লোকে সুখী মনে কর্ত, যে থাকতে পারত অঋণী এবং যাকে প্রবাসে যেতে হ'ত না। এ' যুগে প্রবাস-বর্জ্জন এক অসম্ভব ব্যাপার।

যারা প্রবাসে যেতে চাইবে না, তাদের অধিকাংশকেই অন্নাভাবে ক্লেশ পেতে হবে। কিন্তু এযুগেও যারা অঋণী থাকতে পারবে, তারাই সত্যি সত্যি সুখে থাকবে। ধার-কর্জ্জ কর্ব্ব না, নিজের ক্ষুদ্র সম্বলেই যে দিক্ দিয়ে যতটুকু পারি নিজের অবস্থার উন্নতি-সাধন কর্ব্ব, এই জিদ্ যার থাকে, দৈবাৎ ধারদেনা কত্তে বাধ্য হলেও আধপেটা খেয়েও সেই দেনা সে শোধ করে। এবং এটাই প্রকৃত মানুষের কর্ত্তব্য। ধারের টাকা হাতে এলে অধিকাংশ মানুষই দিন-কতক হাট-বাজারে একটু বেশী আনাগোনা করে, কালিয়া কোর্ম্মা মাংসে পোলাউ দিয়ে পেট ভরে, কেউ কেউ বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বেশ কিছু চর্ব্ব্যচোষ্য-লেহ্যপেয় খাওয়ায়, নাম কিনে,—এমন লোকেরা কদাচ দেনা শোধ কত্তে পারে না। ঋণে যার আপাদমস্তক দায়বদ্ধ, তার পক্ষে বড়-মানুষী চালের মত সর্ব্বনাশা ব্যসন আর কি হ'তে পারে? কিন্তু খোঁজ ক'রে দে'খো, বড় বড় অঙ্কের টাকাগুলি যারা ধার ক'রে এনে ঘরে তোলে, তাদের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যক লোকেরই এই দুর্ম্মতি, এই দুর্দ্দশা। ধারের টাকা মানুষকে বেপরোয়া করে, অনেক সময়ে উন্মার্গগামীও করে। এজন্যই প্রাচীন ভারতের একটা দামী উপদেশ ছিল, অঋণী থাক। অঋণী থাকতে হ'লেই চাল কমাতে হয়, এটা চাই, ওটা চাই, এটা না হ'লে চলে না, ওটা না হ'লে চলে না, এই রকমের অভাববোধকে পায়ে চেপে পিষে পিষে মেরে ফেলতে হয়।

হাজার অভাবের তাড়নার মধ্যেও যে তার ঋণের টাকা শোধ ক'রে সোজা মাথায় দাঁড়াতে পেরেছে, সত্যই তার মতন সুখী মানুষ জগতে আর কেউ নেই।

হরিনামকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বাগরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হরিনাম-কীর্ত্তন করিয়া মনকে শান্ত, স্নিগ্ধ, ক্লান্তিহীন, ক্লেশ-বর্জ্জিত, কলুষমুক্ত করিব বলিয়া দশ জনে একস্থানে বসিয়াছি। এস্থলে প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কি করিয়া পরিকীর্ত্তিত নামের রসে মনটি অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে মজে, ডোবে, হাবুডুবু খায়। চেষ্টা করিতে হইবে তাহারই। অমুকে ভাল গাহে বলিয়া কীর্ত্তন পরিচালনা করিতেছে কিন্তু আমিই কি কম ভাল গাহি, আমি কেন পরিচালনের দায়িত্ব পাইব না, এই জাতীয় অভিমান-স্ফীত ভাব এ সময়ে মনের মধ্যে রাখিবে না। মনে মনে যে যত বিনীত, তাহার কীর্ত্তন তত মধুময় হয়। কীর্ত্তনকালে অহংভাব বর্জ্জন করিতে হইবে। আর এক জনে কীর্ত্তন পরিচালনা করিয়া খুব জমাইয়া দিয়াছে বলিয়া সেই বাহাদুরীটা তোমাকেও দেখাইতে হইবে, ইহার কোনও সার্থকতা নাই। হরিনাম-কীর্ত্তন এমনই একটা চমৎকার ব্যাপার যে, ইহাতে একজন যোড়ায় এবং দশ জন দোহারে গাহিতেছে বলিয়া

রসাস্বাদনের দিক দিয়া কেহ কাহারও চাইতে নিকৃষ্ট হয় না। হরিনামকীর্ত্তনকারী মাত্রেই কীর্ত্তন-শ্রোতাদের কাছে পূজনীয়, বন্দনীয়, মাননীয় ব্যক্তি হইয়া যায়, কারণ, তাঁহাদের প্রাণান্ত শ্রমে শ্রবণকারী বিনাশ্রমে প্রেমরস আস্বাদনের সুযোগ পাইতেছে। কীর্ত্তনে যোগ দিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমানন্দের উল্লাস সৃষ্টি কর, কে পরিচালন করিল, কে দোহারী করিল, ইহা মোটেই বিবেচ্য নহে। কীর্ত্তনানুষ্ঠান করিয়া তোমরা হরিনামেরই জয় ঘোষণা করিবে, তোমাদের নিজ নিজ জয় ঘোষণার জন্য হরিনাম-কীর্ত্তন নহে।"

কীর্ত্তন-পরিচালন

কুমিল্লা জেলান্তর্গত ময়নামতী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"স্বজনকে লইয়া যখন তোমরা হরিনাম-কীর্ত্তন করিবে, তখন তাহার দুইটী উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিও। একটী এই যে, কীর্ত্তন যেন তোমাদের অন্তরঙ্গ ভাবসমষ্টির পুষ্টি বিধান করে। দ্বিতীয়টী এই যে, এই কীর্ত্তনের ফলে অন্য শত শত বহির্ম্মুখ মন যেন অন্তর্ম্মুখ হয়। কেবল কীর্ত্তনকারীদের নিজেদের অন্তরঙ্গ ভাবের পুষ্টির উদ্দেশ্যে কীর্ত্তন হইলে, কে কীর্ত্তন পরিচালন করিল, কেমন তাহার কণ্ঠ-লালিত্য, কেমন সুরে সে কীর্ত্তন করিতেছে বা করাইতেছে, তাহা আর মুখ্য ব্যাপার থাকে না, তাহা গৌণ হইয়া যায়। এ সব জিনিষ

যেমনই হউক, ভাবের দিক্‌দিয়া সে খাঁটি থাকিলেই যথেষ্ট হইল। কিন্তু বাহিরের অন্য অসংখ্য বহির্ম্মুখ মনকে কীর্ত্তনের দ্বারা অন্তর্ম্মুখ করিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যাধীন থাকিলে, কে কীর্ত্তন পরিচালন করিবে, কে করিবে না, কেমন করিয়া কীর্ত্তনটী জমাইতে হইবে, কেমন করিয়া করিলে কীর্ত্তন জমান যাইবে না, এসব বিবেচনার প্রয়োজন আছে। অর্ব্বাচীন, অপটু বা কর্কশ-কণ্ঠ ব্যক্তি অসুন্দর ভাবে কীর্ত্তন পরিচালন করিলে এই সব ক্ষেত্রে কীর্ত্তনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং যোগ্য ব্যক্তিরা কীর্ত্তন পরিচালন করিলে বা যোগ্যতর ব্যক্তিদিগকে কীর্ত্তন-পরিচালনায় পাওয়া গেলে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিদের মনে কোনও ক্ষোভ রাখা উচিত নহে। কীর্ত্তন যে অসংখ্য জনের মনপ্রাণ দ্রবীভূত করিতে পারিয়াছে, ইহার চেয়ে বড় লাভ আর কি আছে? এই লাভ কীর্ত্তন-পরিচালকের একার ত' নহে, সমবেত সকলের।"

মণ্ডলী-গঠন ও তাহার উদ্দেশ্য

কুমিল্লা জেলান্তর্গত রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোথাও একটী অখণ্ডমণ্ডলী গঠিত হইলে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, সমভাবের ভাবুক সমসাধনার সাধক ব্যক্তিদের

মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্যই ইহার সৃষ্টি, ইহার মধ্যে অনৈক্য এবং সংঘর্ষ প্রবেশ করিলে ইহার আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যায়। আত্মাভিমান প্রবল হইলে তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে ঐক্য নষ্ট হইয়া যায়, সেবার আগ্রহ প্রবল হইলে গুরুতর কারণ ঘটা সত্ত্বেও ঐক্য এবং সম্প্রীতি অব্যাহত থাকে। যেখানে ঐক্য নাই, আছে শুধু কলহ, বিবাদ, সংঘর্ষ, সেখানে মণ্ডলী তুলিয়া দেওয়া উচিত। মণ্ডলীর প্রথম সৃষ্টি-কালে অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের লোকদের মিলনস্থল-রূপে ইহা গৃহীত হয় বটে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে সমভাবের ভাবুকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিলে কাছাকাছি স্থানে দুই তিনটী নূতন মণ্ডলী গঠিত হইতে পারে। এই সকল স্থলে এক মণ্ডলীর সহিত অন্য মণ্ডলীর সম্পর্ক অতীব মধুর হওয়া প্রয়োজন। নতুবা নূতন নূতন মণ্ডলী গঠনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এক মণ্ডলীর সদস্যেরা প্রয়োজন-স্থলে দুই বা তিন মণ্ডলীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য হইলে হইতে পারেন কিন্তু যে ক্ষেত্রে একটী মণ্ডলীর ভিতরে সর্ব্বশক্তি দিয়া কাজ করিলে অনেক কাজ হইতে পারে বা দ্রুত কর্ম্মোদ্‌যাপন সম্ভব, সে ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীর সদস্য থাকিলে সে কোন্‌টার জন্য কতটুকু কাজ করিতে পারে? এই জন্য স্থানীয় অবস্থা বা সাময়িক উপযোগ চিন্তা করিয়া কাজ করা উচিত। যাহাই কর, সেবা-বুদ্ধিতে করিবে, অহংবুদ্ধির তাড়নায় নহে।"

প্রেমবুদ্ধি তোমার কর্ম্মের নিয়ামক হউক

কুমিল্লা জেলান্তর্গত কালম গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাহির হইতে অনেকে যাহাকে অতি সাধারণ বা তুচ্ছ লোক বলিয়া ধারণা করে এবং সেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অবজ্ঞা করে, তেমন লোকেরাও অনেক সময়ে অনেক অভাবনীয় বিশাল সৎকর্ম্মের সূচনার হেতুভূত হয়। ইহা দ্বারা সামান্য ব্যক্তির অসামান্যত্ব, তুচ্ছ ব্যক্তির অসাধারণত্ব, অবজ্ঞাত ব্যক্তির সম্মাননীয়ত্ব এবং অবহেলিত ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয়ত্ব প্রমাণিত হয়। মূলতঃ কেহই ছোট নহে, তুচ্ছ নহে, অবজ্ঞেয় নহে। কিন্তু মানুষের তাচ্ছিল্যের ঊর্দ্ধদেশে মস্তকোত্তোলনের জন্য তাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়। এই পরিশ্রম হইবে একনিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাস-সমন্বিত এবং অপর সকলের প্রতি শ্রদ্ধাভিষিক্ত। বিদ্বেষ লইয়া যাহারা শ্রম করে, তাহাদের শ্রম নানা প্রতিপক্ষ সৃষ্ট করে এবং সেই প্রতিপক্ষদের রুদ্রতর বিদ্বেষ ও রুক্ষতর কুদৃষ্টিকে উদ্রিক্ত, উত্তেজিত ও পরিবর্দ্ধিত করে। নির্ব্বিদ্বেষ লোকহিত সাধনের গতিবেগ মন্দ হইতে পারে কিন্তু বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জর লোকহিতসাধন চেষ্টা নিজের উদ্যমকে নিজেই বারংবার আহত, ব্যাহত, খণ্ডিত এবং হৃতত পরিণামে নিহত করে। সৎকর্ম্মে ক্ষুদ্র

সহযোগও যদি কাহাকেও দাও, তবে বিদ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া দিও, কোনও একটী ক্ষুদ্র কল্যাণ-কর্ম্মেও যদি রুচি-প্রবৃত্তিকে প্রেরণ কর, তবে প্রেমবুদ্ধি নিয়া তাহা করিও। এই প্রেমবুদ্ধি চাই সহযোগীদের প্রতি, প্রতিযোগীদের প্রতি, সংঘর্ষপরায়ণ বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি, নিরপেক্ষ যাবতীয় জনসাধারণের প্রতি। প্রেমবুদ্ধি তোমার কর্ম্মের নিয়ামক হউক, তাহা হইলেই প্রতিটি কর্ম্ম হইবে যথাসম্ভব বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত।"

আমন্ত্রণের প্রতীক্ষা কেন রাখিবে

নোয়াখালী জেলান্তর্গত শিবপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতে কেহই তুচ্ছ নহে, হেয় নহে, অবজ্ঞেয় নহে। কেহই জগদ্বাসীর পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু তোমার যে অতুচ্ছতা, তোমার যে অহেয়তা, তোমার যে অনবজ্ঞেয়তা, তাহা তোমাকে নিজ কর্ম্মের দ্বারা, রুচি দ্বারা, চিন্তাভাবনার দ্বারা, পরিবেশের উপরে প্রভাব দ্বারা প্রমাণিত করিতে হইবে। তুমি যে মহৎ, একথা নিতান্তই সত্য কিন্তু এই মহত্ত্বের পরিচয় চারিদিকের লোকেরা পাইবে, তবে না তোমাকে মহৎ এবং বহু জনের একান্ত আশ্রয় বলিয়া সম্মান করিবে! সুতরাং তোমার তুমিত্বকে দেদীপ্যমান ঔজ্জ্বল্যে বিভাসিত করিবার প্রয়োজনে তোমারও সাধনার প্রয়োজন আছে,

তপস্যার প্রয়োজন আছে। একাগ্র মনে একটী লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত বিক্রমে নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া যাওয়ার নাম সাধনা আর সাধন-পথে নানা বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াও তাহাদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের উৎপীড়ন-নিপীড়ন-নির্য্যাতন হাসিমুখে সহ্য করিয়া নিজ সাধনায় অবিচল আস্থায় লগ্ন হইয়া থাকিবার নাম তপস্যা। তোমরা প্রতিজনে নিজ নিজ সাধনায় তপস্বীর দৃঢ়তা লইয়া লাগিয়া থাক। জগদ্বাসী তোমাদের মহত্ত্ব স্বীকার না করিয়া পারিবে না। অনেক সৎ লোক প্রকৃত সৎকর্ম্ম হইতে নিজেদিগকে বিযুক্ত রাখিবার স্বপক্ষে এই কুযুক্তি দিয়া থাকে যে, তাহাদিগকে কেহ ডাকিল না, খুঁজিল না, আদর করিয়া আপ্যায়ন করিয়া কর্ম্মযজ্ঞে যোগদান করিতে আমন্ত্রণ করিল না। এই সকল অন্তঃসারহীন অভিযোগ ভুলিয়া যাও। তোমার নিজস্ব মানবিক অধিকারে তুমি সৎকর্ম্মের সহিত যুক্ত হও, আমন্ত্রণের প্রতীক্ষা কেন রাখিবে?"

রুচিও চাই, প্রস্তুতিও চাই

কুমিল্লা জেলান্তর্গত দুর্গাপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতে কেহই নিরর্থক বা অনাবশ্যক নহে। প্রত্যেকের উপরেই জগতের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এজন্য প্রত্যেকেরই আত্মপ্রস্তুতির প্রয়োজন। আমাকে দিয়া

জগতের অশেষ কুশল হইতে পারে কিন্তু নিজেকে কুশলকর্ম্ম করিবার উপযোগী করিয়া আমি গড়িব না, সৎকার্য্যে ধাইয়া যাইব না, অপরে গলাধাক্কা দিয়া না নিয়া গেলে সম্মুখের দিকে এক পা আগাইব না, কেহ সৎকার্য্যের বিষয়ে আমার নিকটে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে তাহাতে কর্ণপাত করিব না, অপরে প্রশংসনীয় সৎকাজে অগ্রণী হইলে দৃষ্টান্তের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হইব না,—ইহা কদাচ সার্থক বা আবশ্যক রূপে পরিগণিত হইবার লক্ষণ নহে। রুচিও চাই, প্রস্তুতিও চাই, তবেই আমি সার্থকতার পথে পাদচারণা করিব, অন্যথায় নহে।"

পিতৃমাতৃ-ভক্তি

দ্বারভাঙ্গা জেলান্তর্গত লাহেরিয়াসরাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পিতৃমাতৃ-ভক্তি সম্পর্কে আমার মনে কতকগুলি দৃঢ়মূল ধারণা আছে। প্রাচীন ঋষি বলিয়াছিলেন,—'পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব',—ইহাই এই ধারণার কারণ নহে। এই ধারণার আর একটী কারণ অনন্ত সার্ব্বভৌম নামক এক পুরোহিত-শ্রেণীর স্নেহময় একটী সজ্জন। ঘটনাটী পরবর্ত্তী কালে জানিবে। কিন্তু আমার ধারণার আসল পটভূমি আমার মায়ের অসাধারণ স্নেহ ও বাবার অসাধারণ উদারতা। সংসারে আমার বয়সী আরও পনের ষোল জন কিশোর প্রতিপালিত

হইত। আমার মা আমাকে দুধের সরটুকু না দিয়া তাহাদের কাহাকেও উহা দিতেন। বড় পিসীমা আপত্তি করিতেন, কিন্তু মা বলিতেন,—আমার ছেলে চিরকাল আমার কাছেই থাকিবে, জীবন ভরিয়া যথেষ্ট সর তাহাকে খাওয়াইতে পারিব কিন্তু পরের ছেলেরা দুদিনের জন্য আসিয়াছে, পড়াশুনা হইয়া গেলেই চিরতরে দেশে ফিরিবে, যত্ন আদর তাদেরই ত' বেশী করা দরকার। সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিবার পরেও অনুভব করিয়াছি, আমি চিরকাল আমার সেই মমতাময়ী মায়ের কোলেই রহিয়াছি, জীবন-ভরিয়াই আমি তাঁহার হাতের পরিবেশিত দুধের সর খাইতে পাইব। পিতা আমার কেবলহস্ত রক্তচক্ষু শাসক ছিলেন না, তিনি আমাকে প্রতি কার্য্যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, চিন্তার স্বাধীনতায় কদাচ হস্তক্ষেপ করেন নাই, তিনি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিরকাল ছিলেন আশ্বাসবান্ ও আশাশীল, আমি জীবন-পথের নালা-নর্দ্দমায় পড়িয়া পঙ্ককুণ্ডে হাবুডুবু খাইব, এমন কল্পনা তাঁহার অন্তরে ঠাঁই পাইত না। এই সকল কারণ পিতৃমাতৃভক্তি সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট ধারণার ভূমিকা তৈরী করিয়াছে।

"আমি বুঝিয়াছি, পিতৃমাতৃ-ভক্তিহীন পুত্রকন্যা কদাচ পূর্ণ মানুষ হইতে পারে না, সে একটী অর্দ্ধমানব মাত্র। অর্থাৎ পশুত্বের স্তর হইতে মানবত্বের স্তরে সে উন্নীত হইয়াছে সত্য কিন্তু দন্ত, নখর, হিংস্রতা আদি পশুসুলভ বিশেষত্ব তাহার পুরা মাত্রায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। পিতৃমাতৃ-ভক্তিহীন পশু-

মানব নিজের জন্মকে পশু-সুলভ কামজ জন্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং পিতামাতা যে অপরিসীম স্নেহ-মমতা দিয়া সন্তানকে লালন-পালন করিয়া বড় করিয়া তুলিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা-ভাজন বলিয়া মনে করিতে কুণ্ঠিত ও অস্বীকৃত হয়। পিতামাতার কাছ হইতে প্রাপ্ত সেবা, যত্ন, শ্রম ও তত্ত্বাবধানকে সে দয়ার দান বা স্নেহের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না, এগুলি সে দাবী করে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া, সঙ্গত অধিকার বলিয়া। তাহার নিজ অস্তিত্ব তাহার কাছে বর্ত্তমান, এই বর্ত্তমান তাহার নিকটে অমূল্য। পিতামাতার অস্তিত্ব তাহার নিকটে অতীত এবং অতীত চিরকালই বর্ত্তমানের তুলনায় অবহেলনীয় বা অবহেলিত। কিন্তু সে ভুলিয়া যায় যে, সে যদি তাহার অতীতকে ভুলিয়া যায়, অস্বীকার করে, তাহা হইলে সে তাহার নিজ পুত্রকন্যার নিকটেও অতীত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং তাহাকেও নিজ পুত্রকন্যা দ্বারা অনুরূপ ভাবে অবহেলিত, অনাদৃত, অসম্মানিত হইতে হইবে। অতীতকে যাহারা অবজ্ঞা করিবে তাহাদের ভবিষ্যৎ কদাচ শ্রদ্ধেয় থাকিবে না, থাকিতে পারেও না। * * * আমার একজন বন্ধু ব্যক্তি ছিলেন, জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া যাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি ছিলেন যশস্বী সুবক্তা, ধর্ম্মশাস্ত্রের একজন নিপুণ ব্যাখ্যাতা, আকৃতিতে প্রকৃতিতে মনোহর, মনোরম। তিনি একদিন পিতৃনিন্দা করিতে বসিলেন।

বলিলেন,—আমার বাবার যাহা ছিল জঘন্য চরিত্র, তাহাতে তাঁহার ছেলে আমি একজন যশস্বী ব্রহ্মচারী হইব, একথা কেহ কল্পনা করিতে পারে না। ঠিক এই দিন হইতে আমি এই অকৃতজ্ঞ যশস্বী গুণীর সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিলাম। আর একজন যশস্বী ব্যক্তির উল্লেখ করিব। তিনি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই যশস্বী নহেন, তাঁর খ্যাতি নানা দিগ্দেশে কোটি কোটি লোকের নিকট পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং দুই অর্থেই তিনি যশস্বী। তিনি তাঁহার রচনার একটী স্থানে লিখিয়াছেন,—'আমার পিতা ছিলেন লম্পট' বা ঠিক এইরূপ অর্থ-প্রকাশক একটী বাক্য। সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক পাঠ বন্ধ করিলাম। তুমি হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, এই খ্যাতিমান্ পুরুষের লেখা কোনও পুস্তক আমি তাহার পরে সম্ভবতঃ পনের বৎসরের মধ্যেও আর স্পর্শ করি নাই। পিতৃমাতৃ-ভক্তি সম্পর্কে আমার মতামত এতই সুস্পষ্ট এবং এতই সুদৃঢ়। সুতরাং তোমাদের মতন যুবকদের কাছে আমি পিতামাতার প্রতি কি আচরণ প্রত্যাশা করিব, তাহা ভাবিয়া দেখ।

''অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে এবং কাহাকেও কাহাকেও এরূপ মন্তব্য করিতে শোনা যায় যে, সাধারণতঃ সন্ন্যাসীরা বড়ই অকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি ত' জানি যে, পিতামাতার প্রতি যাহারা অকৃতজ্ঞ, তাহারা কদাচ গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারে না। জগতের বৃহত্তম কল্যাণের

দিকে তাকাইয়া কেহ কেহ যদি পিতামাতাকে তাঁহাদের বার্দ্ধক্য-দশায় সেবা নাও করিতে পারেন, তথাপি প্রকৃত সন্ন্যাসীরা পিতামাতাকেই প্রথম গুরু বা আদি গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তিরা পিতামাতার সহিত-সদ্বুদ্ধি-বিনিময় করিয়া সংসার ছাড়িয়া থাকেন।

"পিতামাতার ভিতরে ভুল, ত্রুটি, অপরাধ আবিষ্কার করিতে যাইও না। কেননা, ইহা দ্বারা তোমার কোনও কুশলই নাই। সমাজের সামগ্রিক কুশলের দিকে তাকাইয়া তোমাকে মাতৃপিতৃ-ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে, অন্ধ আসক্তির দিক হইতে নহে। একদা মানুষ ঠিক বর্ত্তমান আকৃতির ও বর্ত্তমান প্রকৃতির মানুষ ছিল না, কিন্তু একটী পিতা ও একটী মাতাকে অবলম্বন করিয়া পুরুষানুক্রমে অসম্পূর্ণতার বিদূরণ ও পূর্ণতার সঞ্চারণের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান মানুষটির উদ্ভব হইয়াছে। এক, দুই, তিন বা বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশটী প্রজন্মে এক একটা করিয়া অসম্পূর্ণতা দূর হইয়াছে এবং এক এক প্রকারের গুণাম্বয় ঘটিয়াছে। কিন্তু মানুষ তাহার পূর্ণ বিকাশে আসিয়া এখনো পৌঁছে নাই। তাহাকে আরও কোটি কোটি প্রজন্ম ধরিয়া ক্রমোৎকর্ষের সিঁড়ি ভাঙ্গিতে হইবে। কাহারও পিতামাতাই এখনো সর্ব্বগুণের আকর হইতে পারেন নাই, কিন্তু কাহারও পিতামাতাই একেবারে নির্গুণ অপদার্থ ব্যক্তি নহেন। পুত্র যদি পিতামাতার সদ্গুণগুলির দিকে অবিরাম চিন্তায় ধরিয়া রাখে, তবে

তাহার এই ধ্যানবল তাহার ভিতরে ঐ সকল গুণের বিকাশকে ত্বরান্বিত ও ঐ সকল গুণকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দিবার পক্ষে অসাধারণ এক অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। এই যে বিরাট সম্ভাবনা, তাহাই পিতৃমাতৃভক্তিকে মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে।"

আর্য্য কে

ঢাকা জেলান্তর্গত সোনারং-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ভারতে কে আর্য্য আর কে অনার্য্য, চিনিবার উপায় নাই। এই দেশে আর্য্য-অনার্য্যের দারুণ মিশ্রণ ঘটিয়াও যে একদল নিজেদিগকে আর্য্য আর অন্য দল নিজেদিগকে অনার্য্য মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত ও দীনতায় কুণ্ঠিত হয়, ইহা আমার কাছে আশ্চর্য্য লাগে। আর্য্য-রক্ত শরীরে থাকিলে আর্য্য হয়, না, আর্য্য-ভাষায় কথা বলিলে আর্য্য হয়, ইহা নিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক হইতে আমি যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে অনুমান করিতে পারি যে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ভাষা নিয়াই আর্য্যের পরিচয় হইয়াছে, একমাত্র ভারতেই বংশানুক্রমিকতার উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে। রোমক আর্য্যেরা যখন সেবাইনদের মেয়েদিগকে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া গৃহলক্ষ্মী করিল, তখন তাহাদের আর্য্যত্ব লুপ্ত হয় নাই, কারণ, তাহারা তাহাদের

ভাষা পরিবর্তন করে নাই। কিন্তু ভারতীয় আর্য্যেরা যদি দলে দলে অনার্য্য কন্যাদিগকে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া নিজেদের অঙ্কশায়িনী করিত এবং তাহাদের লইয়া ঘর করিত, তাহা হইলে তাহারা আর আর্য্য থাকিত না, কারণ, তাহারা আর্য্যত্বকে বংশানুক্রমিক বিশুদ্ধির দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিল এবং এই কারণেই যৌন-মিলনের পাতিত্যকে সহজে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিতে পারিত না। সভ্য ও বর্ব্বর কোটি কোটি অনার্য্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত মুষ্টিমেয় কয়েক জন আর্য্য ভারতে তাহাদের বংশের বিশুদ্ধি রক্ষার বিষয়ে অবহিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল এই জন্য যে, একবার মিশ্রণ ঘটিলে কোথাও আর অনার্য্যদের কৃষ্ণসাগরের মাঝে বারিবিন্দু সম গৌরাঙ্গ আর্য্যদের খোঁজ পাওয়া যাইবে না। শুধু নিজেদের ভাষার মহিমায় একটা জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, যদিও ভাষা তাহার স্বতন্ত্র রূপে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার-দাত্রীদের অন্যতম। শোণিত-প্রবাহের বিশুদ্ধতাই স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অনার্য্যেরাও এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। এই জন্যই এক অনার্য্য জাতি বরং অন্য অনার্য্য জাতির আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু এক জাতি অপর জাতির সহিত রক্ত-সম্বন্ধ স্থাপন বড় কেহ করে নাই। ভারতীয় আর্য্যদের ভিতরেও এইটিই তাহাদের প্রধান বিশেষত্ব হইয়াছিল। তথাপি অনার্য্যে ও অনার্য্যে যে পরিমাণ মিশ্রণ হয়ত ঘটিয়াছিল, আর্য্যে ও অনার্য্যে তাহার অপেক্ষা বহুগুণ

অধিক শোণিত-সংমিশ্রণ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। নতুবা আর্য্য-রূপে পরিচয় প্রদানকারী লক্ষ লক্ষ ভারতীয় আর্য্যের মুখাকৃতি ও অবয়বের গঠনের মধ্যে নানা জাতির নানা রূপ-বিশিষ্টতা কেন ধরা পড়িতেছে? অতীব বিশিষ্ট আর্য্য-পরিচয়-বহনকারীর পুত্রকন্যার চোখ নাক কেন মঙ্গোলিয়ানের মত দেখিতে পাই, আবার অনুরূপ অনার্য্যদের পুত্রকন্যাদের মধ্যে কোল, ভিল, সাঁওতালের গাত্রবর্ণ ও মুখাবয়বাদি কেন দেখা যায়? ভাষা, সংস্কৃতি ও শোণিত এই তিনটিকে অবিকৃত রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও এক ভাষা অপর ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে, এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছে, এক শোণিত অপর শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। তথাপি আর্য্য-সদাচারকে ধরিয়া রাখিবার একটা পুরুষানুক্রমিক চেষ্টা ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে আবহমান কাল চলিয়াছে। সেই সদাচারই আর্য্য-সভ্যতার প্রকৃত রক্ষক। সেই সদাচারের মূল কথা সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যকে যাহারা মানে ও পালন করে, তাহারাই আর্য্য। ভারতীয় আর্য্য যদি জগতে অক্ষরের আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে বেদমন্ত্রের সাক্ষাৎকার না পাইত এবং বেদমন্ত্রের ভিতর দিয়া অক্ষর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার না পাইত, ভারতীয় আর্য্য জাতি যদি অক্ষর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপে অনক্ষর বেদমন্ত্র শ্রুতিশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বলে অন্তরে ধারণা করিয়া রাখিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজন অনুভব না করিত, ভারতীয় আর্য্য

জাতি যদি স্মৃতিশক্তির চর্চাকালে সঙ্গীতময় বেদমন্ত্রকে কণ্ঠে ধরিয়া রাখার অমোঘ উপায় স্বরূপে ব্রহ্মচর্য্যকে সহসা একদিন আবিষ্কার করিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে ভারতে তাহাদের যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিতে পারিয়াছিল, তাহা কদাচ সম্ভব হইত না। ব্রহ্মচর্য্যকে তপোত্তম বলিয়া গ্রহণ করিবার রুচি, প্রবৃত্তি, শক্তি ও চেষ্টার ভিতর দিয়াই তাহার আর্য্যত্ব প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল। এই একটী কথা মনে না রাখিলে ভারতীয় আর্য্যদের সম্পর্কে কিছুই জানা বা বুঝা সম্ভব নয়।"

যুগান্তরের সৃষ্টি

ঢাকা জেলান্তর্গত মালখানগর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কোন্ ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে যে কোন্ মহৎ কৃতিত্বের সৃষ্টি, মানুষ তাহা অনেক সময়ে কল্পনা করিয়াও স্থির করিতে পারে না। কিন্তু ভগবদভিপ্রায়ে কাহারও কাহারও জীবনে এমন সকল অসাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনা নিতান্ত সাধারণ প্রত্যাশার মধ্য দিয়াই ঘটিয়া যায় এবং উহাই আস্তে আস্তে সকলের অজ্ঞাতসারে জগতের এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টির দিকে মোড় লেয়। যাঁহারা এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনাকে তাঁহাদের বাস্তব মহত্ত্বে চিনিয়া নিতে পারেন, জগতে তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই ত্রিকালদর্শী ঋষি, তাঁহারাই যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ। আমি কিন্তু

তোমাদের মতন অতি সাধারণ মানুষকেও মহাপুরুষ রূপে দেখিতে অভিলাষী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে যুগান্তরকারী ইতিহাসের রূপ ও রং ধরাইবার জন্য তোমরা কি কিছু করিবে? এই প্রত্যাশা কি তোমাদের নিকটে করিতে পারি? ক্ষুদ্র ব্যাপারকে ক্ষুদ্র না ভাবিয়া, অসামান্য কিছু বলিয়া সম্মান করিয়া নিজেদের ত্যাগ ও শ্রদ্ধার বলে তাহাকে এক মহনীয় মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়া মানসনেত্রে তোমরা নিত্য সাধন করিবে কি?"

মহৎকে সম্মান করিও

ঢাকা জেলান্তর্গত কোলা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বড় কাজ হাতে লইয়া অনেকে জীবনে অসফল হইয়াছে, যাহা করিতে চাহিয়াছিল, তাহা আর করিয়া উঠিতে পারে নাই, এইরূপ দৃষ্টান্ত জগতে ভূরিভূরি রহিয়াছে। কেহ নিজ শক্তি দিয়া কোনও বিশেষ সঙ্কল্পকে পূরণ করিতে পারে নাই, ইহা তাহার পক্ষে নিন্দনীয় কিছু নহে কিন্তু সে যে সত্য সত্য মহৎ আদর্শের সহিত নিজেকে লগ্ন করিতে চাহিয়াছিল, ইহা তাহাকে অজস্র প্রশংসার আস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। এই সত্যকে তোমরা স্বীকার করিও। এই সত্যকে তোমরা সম্মান করিও। সৎকর্ম্ম হাতে লইয়া চেষ্টা সত্ত্বেও যাঁহারা সফল হন নাই, তাঁহাদিগকে তোমরা কৃপার চক্ষে দেখিও না। অনুকম্পা

তাঁহাদের প্রাপ্য নহে, তাঁহাদের প্রাপ্য অবিমিশ্র শ্রদ্ধা। প্রাণভরা প্রেম লইয়া তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিও, অন্তরভরা ভালবাসা লইয়া তাঁহাদের বিষয় আলোচনা করিও এবং নিজেদের শক্তিসাধ্যে যতটুকু কুলায়, ততটুকু সহযোগ এই নিমজ্জমান তরীকে ভরাডুবি হইতে বাঁচাইবার জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে দিও। কেহ আছাড় পড়িয়াছে দেখিলে হাসিও না, তাহাকে টানিয়া তুলিবার জন্য হাত বাড়াইও।"

শান্তি ও অভ্যুদয়ের পথ

ঢাকা জেলান্তর্গত সিংপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"এমন কতকগুলি কাজ আছে, যাহা মানুষের পক্ষে সত্য সত্যই কঠিন। যেমন, যাহার নিকটে সদ্ব্যবহারই প্রত্যাশাযোগ্য, তাহার নিকট হইতে রিক্ততা, অপমান বা অনাদর পাইলে মানুষ সহজে তাহা ভুলিতে পারে না। ভুলিতে না পারিলে মানুষের ক্ষতি, কারণ অপরের অসদ্ব্যবহারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিলে মনের দিক দিয়া মানুষ পরাধীন হইয়া পড়ে, সে নিজের আয়ত্তের মধ্যে থাকে না, সে স্ববশতা হারায়, সে চিত্ত-স্থৈর্যহীন হয়, সে দুর্বল হয়। তথাপি না ভুলিতে পারাটা তাহার স্বভাব। এই স্বভাবের ঊর্ধ্বে তাহাকে যাইতে হইবে। নতুবা অনাবিল শান্তির বা অসাপত্ন্য ক্ষমতার সে কদাচ অধিকারী হইতে পারিবে না। কিন্তু ক্ষমতা মানুষের

কাম্য নহে, শান্তিই তাহার কাম্য। নিশ্চিত শান্তির প্রতিশ্রুতি পাইলে মানুষ অনায়াসে নিজের ক্ষমতা অপরের হাতে সঁপিয়া দিতে পারে। এবং পরিবেশ যেখানে শান্তিপূর্ণ, উচ্চ চিন্তা, গভীর উপলব্ধি এবং সত্য পন্থার সাগ্রহ অনুসরণ সেখানে বিনা আয়াসে বা অল্প আয়াসে সম্ভব হইয়া থাকে। কাহারও নিকটে সম্মান প্রত্যাশা করিও না এবং কাহারও কৃত অপমান আজীবন স্মরণেও রাখিও না। ইহা শান্তির পথ, অতএব ইহা অভ্যুদয়েরও পথ।"

সংযমের বলে জন্মশাসন কর

বেগুনবাড়ী (ময়মনসিংহ)-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আর যাহাতে সন্তান না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তুকতাক, ঝাড়ফুক বা মাদুলীর সাহায্য পাইবার জন্য দৈবজ্ঞের নিকট বা আভিচারিক গুণীর নিকট যাইবার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইতেছে স্বামী ও স্ত্রীর এক-সঙ্কল্পে সঙ্কল্পবান্ হইয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া যাওয়া। উভয়কেই সমভাবেই ভাবুক হইতে হইবে, যেন একজন ব্রতচ্যুত হইতে চলিলে অন্য জন তাহাকে রক্ষা করিতে পারে, পিচ্ছিল পথে এক জনের পা টলিলে অন্য জন যেন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। ঔষধ বা সম্ভোগকালে ব্যবহার্য কৃত্রিম নিরোধসামগ্রী দ্বারা অব্যর্থ ফল কদাচ আশা করিতে পার না। আর, স্থূল লালসা লইয়া

সম্ভোগ করিবে কিন্তু অফুরন্ত বিবেকের দৃষ্টিতে সন্তানের সম্ভাবনাটীকে দেখিতে থাকিবে, ইহা মানসিক পরিপূর্ণতার নিদারুণ পরিপন্থী। যতদিন পার, সংযম প্রতিপালন কর এবং সংযমের বলে জন্মশাসন কর। এইরূপ জন্মশাসনই অভ্রান্ত, অব্যর্থ, সুনিশ্চিত জন্মশাসন। যুগের গতি যাহা দেখিতেছি, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে একদা অতীব নির্লজ্জতা সহকারে জন্মশাসনের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিবে এবং বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রায় প্রত্যেকেই এই বিষয় নিয়া আলোচনা করিবে। তেমন দুর্দিন যদি জীবৎকালে দেখিতে পাই, তবে তখনো আমি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিব যে, সংযমের সাহায্যে জন্মশাসনই প্রকৃত জন্মশাসন, কেননা পিতামাতার এই সংযম-সাধন-চেষ্টার সুফল পরবর্তী কালের কয়েকটী প্রজন্ম ধরিয়া চলিতে থাকিবে। উদ্দাম লালসার অধীর হইয়া যে দম্পতি সন্তানের জন্ম-সম্ভাবনাকে কেবলি ধিক্কার দিতে দিতে মিলিত হয়, জন্মশাসনের কৃত্রিম চেষ্টা সত্ত্বেও যদি দৈবাৎ তাহাদের স্কন্ধে অবাঞ্ছিত সন্তানের বোঝাটী আসিয়া চাপিয়াই বসে, তখন এই সন্তান কোন্ মনোবৃত্তির অধীন হইয়া তাহার জীবন পরিচালিত করিতে চাহিবে এবং নিজ পিতামাতার প্রতি সে কেমন অসম্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাইবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে? আমরা প্রাচীনপন্থীরা শুধু নীতিবাগীশ বলিয়াই এই প্রশ্ন তুলিতেছি না, আমরা জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের মনোগতির সুস্থতার প্রয়োজনের

দিকে তাকাইয়াই এ কথা কহিতেছি। অতীত অপেক্ষা বর্তমান অনেক অধিকতর মূল্যবান, কিন্তু বর্তমান অপেক্ষাও ভবিষ্যতের গুরুত্ব আরও শতগুণ বেশী। অতীতের সবটুকুকেই আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, কেহ বোধ হয় পারেও না, কিন্তু ভবিষ্যতের সবটুকুই আমরা নিজেদের মনোমত সৃষ্টি করিয়া লইবার গৌরবজনক দায়িত্ব নিশ্চয়ই সাহসের সহিত গ্রহণ করিতে পারি।"

পারস্পরিক সহযোগ শক্তির উৎস

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত কালাইয়ারহাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পারস্পরিক সহযোগ যে শক্তির কত বড় এক জাজ্বল্যমান উৎস, এই বিষয়ে তোমাদের প্রায় কাহারও সুস্পষ্ট কোনও ধারণা নাই, ইহার কারণ এই যে, পরস্পর পরস্পরের আরব্ধ অনুষ্ঠানে চারিদিক হইতে গিয়া সহযোগিতা দিবার অনুশীলন তোমাদের মধ্যে নাই। পূজা করিবে ত' একাই সব করিবে, যাত্রাগান দিবে ত' নিজের শক্তিতে যাহা সাধ্য, তাহাই করিবে, তাহার ঊর্দ্ধে যাইবে না। তোমাদের সামাজিক উৎসবগুলি সমাজের সকল লোকের উৎসব নহে, একজনের বা একটা বাড়ীর উৎসব, দশ জনে আসিয়া ভিড় করে হয় যাত্রাগান শুনিতে নতুবা ভোজ খাইতে, অন্য

কোনও গুরুতর দায়িত্ব কাহারও স্কন্ধে পড়ে না, ন্যস্ত হয় না বা যাচিয়া কেহ নেয় না। তোমাদের নিজেদের কাজে অন্য কাহাকেও আসিয়া দায়িত্ব গ্রহণ এবং কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে তোমরা ডাক না, ডাকা হয় নিষ্প্রয়োজন মনে কর, নয় ডাকিতে গেলে নিজের অসম্মান হইবে বলিয়া ভ্রান্ত একটা ধারণা পোষণ কর। প্রায় প্রতিটি ব্যাপারে ব্যক্তি আসিয়া এতটা স্থান জুড়িয়া বসে যে সমষ্টির সেখানে করিবার কিছু থাকে না। কাজ করিবার এই ঢংটী তোমাদের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যে-কোনও উল্লেখযোগ্য কাজই কর না কেন, আর পাঁচ জনকে নিজ নিজ শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি, প্রতিভা, সম্পদ ও সময় তাহাতে বিনিয়োগ করিবার জন্য ডাকিবার অভ্যাস করিতে হইবে। আদর করিয়া মানুষকে তোমার কাজে ডাকিলে সেই মানুষটা নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়া তোমার আপন হইবে, ইহা তোমার স্থায়ী লাভ। তুমি তাহাকে ডাকিলে সে তাহার কাজের সময়ে আবার তোমাকে ডাকিবে, ইহা তোমার পক্ষে একটা সম্মান বা মর্য্যাদা। তুমি অপরকে তোমার কাজে ডাকিয়া মর্য্যাদা দান করিয়াছ বলিয়াই সে তোমার প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করিতে প্রণোদিত হইবে। পরস্পরের এই জাতীয় ব্যবহারের আদান-প্রদানে উভয়েরই সম্প্রীতি, সৌহৃদ্য ও অন্তরঙ্গতা বর্দ্ধিত হয় এবং মানুষের সমাজে ইহাই পরমা শক্তি। বানর ও হস্তীর যূথমধ্যে এই শক্তির আংশিক বিদ্যমানতা দেখা যায়, মানুষের সমাজে ইহা

চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সকল মানুষ ইহার মূল্য বোঝে না, এই জন্যই সকল মানুষ ঠিক মানুষের মতন নহে।"

মুক্তাছড়া (কাছাড়)
৪ঠা ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪১
(১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

সচল তীর্থ

মুক্তাছড়া হইতে শ্রীনরোত্তম নাথ আসিয়াছেন হাইলাকান্দি, শ্রীশ্রীবাবামণিকে নিজ গৃহে নিয়া যাইতে। এদিন হাইলাকান্দি হাটবার, সুতরাং কোনও সভা-সমিতি হইবে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি, সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী এবং নরোত্তম বেলা দশটা তিন মিনিটে লালাবাজার ষ্টেশনে নামিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কত দূর হেঁটে যেতে হবে রে?

নরোত্তম বলিলেন,—বাবা, আপনার বড়ই কষ্ট হবে। হেঁটে যেতে হবে মাইল তিন চারি। পথও প্রশস্ত নয়, আঁকা-বাঁকা, এদিকে বেতের ঝোপ, ওদিকে ফুল কাঁটা, কষ্টের চূড়ান্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—যাচ্ছি তীর্থ-দর্শন করতে, পথের কষ্টে আবার ভয় কিসের?

—তীর্থ?

—হাঁ তীর্থ, সচল-তীর্থ। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন অচল তীর্থ, সাধু, সন্ত, সাধ্বী নারী সচল-তীর্থ।

—কৈ, মুক্তাছড়াতে ত' কোনো সাধুসন্ত নেই বাবা।

—আছে, তোর স্ত্রী নির্ম্মলা, অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে তার নিজের শক্তিতে স্বামীকে এক বৎসর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় সহায়তা দিয়েছে। তাকে দেখলে দশটা অচল তীর্থ দর্শনের ফল এক সঙ্গে হয়।

নরোত্তম নাথ*

এখানে নরোত্তমের স্ত্রী নির্ম্মলা দেবীর একটু পরিচয় দিতে হয়। নির্ম্মলা দেবীর পরিচয় দিতে গেলেই নরোত্তমের জীবনী বলিতে হয়। শ্রীশ্রীবাবামণির নির্দ্দেশে নরোত্তম একবার নিজের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েকটী বিষয় বিশদ বর্ণনার প্রয়োজনে এই জীবনী তিনি দ্বিতীয়বারও লিখিয়া পাঠান। উভয় পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে। তাহা হইতে সারাংশ সঙ্কলন করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। উভয় পাণ্ডুলিপির মিলিত পৃষ্ঠা-সংখ্যা একপঞ্চাশ। চিত্তাকর্ষক ও উপদেশপূর্ণ এই জীবন-বিবরণের সকল অংশ প্রকাশ সঙ্গত নহে, কাগজের খরচ কমাইবার জন্যও ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক পৃষ্ঠার অনেক অংশ সঙ্কলন সম্ভব নহে।

* আজ এই গ্রন্থ-প্রকাশের সময়ে ১৩৭৮ সালে শ্রীনরোত্তমের বয়স তেষট্টি বা চৌষট্টি। আত্মজীবনী লিখিবার কালে তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশ বা সাতাশ।

ভ্রাতা শ্রীনরোত্তম নাথ লিখিয়াছেন,—

"সন ১৩১৪ বাংলায় আমার জন্ম হয়। আমার যখন বয়স মাত্র আট কি নয়, তখনই আমার বিবাহ নিয়া আমার বৃদ্ধ দাদামহাশয়, দিদি ঠাকুরাণী, ভগিনীপতি প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনেরা আমার সহিত নানা ঠাট্টা করিতেন। পাড়াপ্রতিবেশীদের নিকটে ঐ বয়সেই বিবাহিত জীবনের কত গূঢ় গল্প শুনিতাম। সুতরাং ঐ অল্প বয়সেই সমবয়সী বালিকাদের সঙ্গে অবাধে বিবাহের খেলা খেলিতাম। সে খেলা দেহের দিক দিয়া নির্দ্দোষ ছিল কিন্তু মনের ভিতরে অনেক আজগুবি কল্পনার প্রশ্রয় দিত। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক বন্ধুদের কাছে এমন অনেক বিষয় শুনিতাম, যাহা মনকে কলুষিত করিত এবং মন বিবাহের জন্য ক্ষিপ্ত হইত। আর একটু বয়স হইলে বিবাহটা আবশ্যকীয় বলিয়াও মনে হইতে লাগিল। আমি দরিদ্র, দরিদ্রের পক্ষে বিবাহ না হওয়ার মত গ্লানিকর আর কিছু নাই। বিবাহ অবাধ স্ত্রী-সম্ভোগের ছাড়পত্র। ইহা পাইতে কাহার না সাধ যায়?

"আমার ১৯ বছর বয়সে ১৩৩২ বাংলায় গুরুজনেরা আমার বিবাহ স্থির করিলেন। আমার মনে আনন্দের তুফান ছুটিল। যথাকালে বিবাহ হইয়া গেল। বন্ধু-বান্ধবেরা উপযাচক হইয়া কত যে কলাকৌশল বাতলাইয়া দিলেন বলিবার নহে। আমি একটী নির্ম্মম পশু হইয়া গেলাম। একটার পর একটা

অধঃপতন যেন অজগর সর্পের মত আমাকে আস্তে আস্তে গ্রাস করিতে লাগিল। কুলগুরু আসিয়া দীক্ষা দিয়া গেলেন, কতক দিন তাঁহার উপদেশ মত নাম-জপাদি করিলামও কিন্তু যে কাম আমাকে পশু করিয়াছে এবং যাহার দৌরাত্ম্য আমাকে আমার স্ত্রীর অবিশ্বাস-ভাজন পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছে, তাহার সম্পর্কে তিনি একটী কথাও বলিলেন না। আমি পাপপঙ্কে আরও ডুবিতে লাগিলাম। তিনি বৎসর বৎসর আসিয়া স্নেহভরে দুটী কথা বলিতেন এবং তাঁহার প্রাপ্য-বার্ষিক নিয়াই বিদায় হইতেন। ইহার ঊর্দ্ধে আর তাঁহার কিছু যেন করিবার নাই। ভোগের প্রলোভনে কত কি করিলাম, অশান্তির অনলে দগ্ধ হইতে লাগিলাম, কিন্তু কোথায় আমার পরিত্রাতা প্রকৃত সদ্‌গুরু? কে আমার এই কর্ণধারহীন নৌকাটীকে ঝড়ের মুখ হইতে বাঁচাইয়া নিরাপদ তীরভূমিতে তুলিয়া দিবে?

"আমার অমিতাচারে আমার স্ত্রীও যে আমাকে অবিশ্বাস করিতে সুরু করিল, এই দুঃখ আর এই লজ্জা কোথায় রাখি? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, হয় ইন্দ্রিয় জয় করিব, নয় প্রাণত্যাগ করিব। অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলাম আর অবিরাম চিন্তা করিতে থাকিলাম যে কি উপায়ে আত্ম-সংযম লাভ করিব।

"আমার এক বন্ধু অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ

পরমহংসদেব প্রণীত ব্রহ্মচর্য্য-সম্পর্কিত কতকগুলি বই কি যেন কারণে বিনামূল্যে উপহার পাইয়াছিলেন। এইগুলি তিনি আমাকে দেখাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি পড়িতে লাগিলাম। অন্তরে অমিত উৎসাহ অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি তাঁহার চরণদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার সমস্ত বিষয় জানাইয়া তাঁহাকে ময়মনসিংহ ঠিকানায় এক পত্র লিখিলাম। উত্তর আসিল না। আবার লিখিলাম। এবার তিনি উত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা নিম্নরূপ,—

—'আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। তোমার সহধর্ম্মিণীর ভিতরে সংযমের রুচি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা কর। পাখী একটা পাখা দিয়া আকাশে উড়িতে পারে না, দুইটা পাখারই সমান সবলতা চাই, দুইটা পাখারই এক উদ্দেশ্য থাকা চাই'—

"আমি স্ত্রীর সাহায্য ছাড়াই সংযম পালনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম এবং বারবোর ব্যর্থ হইলাম। তখন আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, একার চেষ্টায় বিবাহিত জীবনে সংযম নিরাপদ নহে।

"বাংলা ১৩৩৮ এর বৈশাখ মাসে ত্রিপুরা * জেলান্তর্গত রহিমপুর যাত্রা করিলাম। ছিল এক বিরাট উৎসব। দিব্যমূর্ত্তি মহাপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় বরবপু দেখিয়া নয়ন মন মুগ্ধ হইল, কিন্তু উৎসবের অভাবনীয় জন সমারোহের মধ্যে কাছে যাইতে পারিলাম না।

* তখন কুমিল্লা জিলার নাম ছিল ত্রিপুরা জেলা।

"ঐ বৎসরই অগ্রহায়ণ মাসে আবার রহিমপুর যাত্রা করিলাম। সদ্‌গুরু-দর্শন হইল, সাধন দীক্ষা পাইলাম, মনে মনে সঙ্কল্প নিয়া আসিলাম যে, নির্মলাকে নিয়া এক বৎসরের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।

"বাংলা ১৩৩৯ সালের ২০শে শ্রাবণ তারিখে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব চট্টগ্রাম পাথরঘাটা আশ্রম হইতে আমাকে একখানা পত্র দিলেন।

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা নরোত্তম, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। আরও দৃঢ়তার সহিত ব্রতপালনে সঙ্কল্পবান্ হও। সস্ত্রীক-জীবনযাপনকারী যদি সংযম-পালনের ব্রতে আরূঢ় হয়, অথচ স্বামী ও পত্নী উভয়ের সানন্দ সম্মতির মধ্য দিয়া ব্রতারম্ভ না হয়, তাহা হইলে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য। অতএব, তুমি স্ত্রীকে স্বপথে আনিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছ তাহা প্রশংসনীয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্ত্রীও তোমার পথকে সাদরে গ্রহণ করুক।

এই সঙ্গে তোমার স্ত্রীকেও একখানা পত্র দিলাম। এই পত্রখানা তাহাকে বারংবার পড়িয়া শুনাইবে এবং স্নেহের ভিতর দিয়া তাহাকে জয় করিবার চেষ্টা পাইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

"সদ্‌গুরুর সদুপদেশে আমার স্ত্রীর মন ধাতে ধাতে ফিরিল। সদ্‌গুরু-কৃপায় ক্রমে ক্রমে তাহার মনের ভিতরে সংযমের আগ্রহ এমন প্রগাঢ় হইতে লাগিল যে, আমি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলাম। আর সে আমার জীবন-পথের বাধা নহে, এখন সে আমার পরমকল্যাণ-পথের অপরিহার্য্য সঙ্গিনী। এই ভাবে চলিবার পরে তাহার দীক্ষা-গ্রহণের আগ্রহ জন্মিল। যথাস্থানে এই প্রার্থনা জানাইলাম, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব লিখিলেন,—"তোমাদের সম্বৎসরব্যাপী সংযম ব্রত উদ্‌যাপিত হইলেই দীক্ষাদানের জন্য আমি তোমাদের পর্ণকুটীরে নিজে আসিয়া উপস্থিত হইব।" *

এই দিনই বেলা দুইটার সময়ে শ্রীমতী নির্মলা দেবীর দীক্ষা হইল।

শ্রীযুক্ত নরোত্তমকে শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ব্বেই পত্র দিয়া রাখিয়াছিলেন,—"লোক-জানাজানি করিও না। আমি নীরবে আসিব ও নীরবে চলিয়া যাইব।"

* "সধবার সংযম" পঞ্চম সংস্করণের প্রথম পত্রখানা, যাহা ১৯।৪।৩৯ তারিখে চট্টগ্রাম পাথরঘাটা আশ্রম হইতে লিখিত, তাহা শ্রীমতী নির্মলা দেবীকেই লিখিত হইয়াছিল। "অখণ্ড-সংহিতা" সপ্তম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রহিমপুর হইতে লিখিত এই আষাঢ় ১৩৩৯ সালের "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ" শীর্ষক পত্রখানা এই নরোত্তমকেই লিখিত।

দীক্ষাদানের পরেই শ্রীশ্রীবাবামণি আহারাদি সমাপন করিয়া পত্র লিখিতে বসিলেন।

প্রকৃত সমস্যাকে চিন

নোয়াখালি জেলান্তর্গত চন্দ্রগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতীতের ঘটনাবলি বিচার করিয়া মানুষ অদূর ভবিষ্যতের কতক কতক ঘটনার আন্দাজ করিতে পারে। ইহা মানুষের স্বভাবজাত শক্তি। অজ্ঞ অনিপুণ হাতুড়ে চিকিৎসকেরা যখন অনেক লক্ষণ বিচার করিয়া এবং বহুক্ষণ নাড়ী-টেপাটেপি করিয়াও রোগের গতি, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে না, বিজ্ঞ বিচক্ষণ দূরদর্শী চিকিৎসক তখন একটা কি দুইটা তুচ্ছ লক্ষণ হইতেই রোগীর সমগ্র ভবিষ্যৎ অনুমান করিয়া থাকেন এবং প্রতীকারের জন্য অব্যর্থ-ফলপ্রদ ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করেন। সমাজ বা জাতির জীবনও তদ্রূপ জানিও। সমাজ-সংস্কার কর্ম্মের আন্দোলনকারী অনেক থাকিতে পারেন কিন্তু ভবিষ্যৎ দেখিয়া পথনির্দ্দেশ কে কে দিতেছেন? রাজনৈতিক আন্দোলনকারী ত' সহস্রাধিকই রহিয়াছেন কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ হইলেই কেহ ভবিষ্যদ্দর্শী হয় না, বিদ্বান্ হইলেই কেহ প্রকৃত পথনির্দ্দেশকারী হইতে পারে না, সমস্যার মূলকে যে চিনিতে পারে, তাহার বিচারই নির্ভুল হয়। প্রকৃত সমস্যা যে আমাদের কি, তাহা আগে বুঝিবে,

তবে ত' সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করিবে। প্রকৃত সমস্যাটি চিনিতে চেষ্টা কর।"

আমার দৃষ্টিতে নূতন মানুষের আবির্ভাব

নদীয়া জেলান্তর্গত দত্তপুলিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"মানব-সন্তানের জন্মকে আমি অবাঞ্ছনীয় বলিয়া জ্ঞান করি না। ইহাকে আমি পরমেশ্বরের নূতন একটী আবির্ভাব বলিয়া অনুভব করি এবং জন্ম-সংবাদটী শ্রবণ মাত্র আনন্দে বিগলিত হই। মনে মনে ভাবি, সারা ধরিত্রীর প্রতিটি অধিবাসীকে ডাকিয়া বলি, শোনো মানবসন্তানগণ তোমরা যে সকল অপূর্ণতার দরুন নিজেদের জীবনের পরম-সংসিদ্ধি অর্জ্জনে অক্ষম হইয়া কেবল হাহাকার করিতেছ আর যেই পরম প্রাপ্তিকে হাতের মুঠায় ধরিবার আশায়েই অন্য তনু পরিহার করিয়া মানব-তনু ধারণ করিয়াছ, সেই অপূর্ণতাকে দূর করিয়া দিবার জন্য এবং তোমাদের প্রতিজনের হস্ত-মুষ্টিতে অপ্রাপ্য প্রায় সেই প্রাণভরা প্রাপ্তিকে গুঁজিয়া দিবার জন্য শ্রীভগবান নূতন দেহ নিয়া নূতন রূপে নূতন নামে নূতন কর্ম্মধারা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন,—তোমরা জয়ধ্বনি কর। আমার দৃষ্টিতে নূতন মানুষের আবির্ভাব একটা জৈব ঘটনা নহে, একটা দৈব ব্যাপার।"

তুমি এক সেতু

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত সীতাকুণ্ড-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"একটা জাতির ভাগ্য যেমন একটী মাত্র লোকের উপরেই নির্ভর করে না, তেমন আবার প্রত্যেকটা লোকের উপরেই নির্ভর করে। তোমরা প্রত্যেকে নিজেদিগকে তেমন মূল্যবান্ মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিও, যাহাদের আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন সদাচরণ জাতির ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। বিশ্বাস করিও, তুমি ক্ষুদ্র নহ, তুচ্ছ নহ, অবহেলার পাত্র নহ, বরঞ্চ তোমাকেই এমন সব দুরূহ, দুঃসাধ্য ও সুকঠিন কর্ত্তব্য-সমূহ উদ্‌যাপন করিতে হইবে, যাহার মধ্য দিয়া সমস্ত জাতির বিশোধন, উন্নয়ন এবং রূপান্তরীকরণ সুসাধ্য হইবে। নিজেকে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সেতু বলিয়া জ্ঞান কর এবং অতীতের স্মরণীয় মহত্ত্বকে দৃঢ় পদবিক্ষেপে এই সেতুর উপর দিয়া ভবিষ্যতে উত্তরণ করিবার পরম-শ্লাঘ্য এক সহায়ক রূপে আত্মপ্রকাশ কর। অতীতের মঙ্গলকে ভবিষ্যতের বৃহত্তর মঙ্গলের জনক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার গুরুতর দায়িত্ব ত' তোমারই উপরে ন্যস্ত।"

আত্মিক স্বর্গ ও জাগতিক স্বর্গ

কুমিল্লা জেলান্তর্গত মাঝিগাছা গ্রাম-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"প্রশ্নগুলি সমীচীন এবং স্বাভাবিক কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে উত্তর দিতে গেলে অনেকের চিরপোষিত সংস্কারে বাঁধিবে বলিয়া নিরুত্তর থাকাও সমীচীন মনে হয় এবং বলিতে হয়, যার যেমন বিশ্বাস, তার পক্ষে তেমন। স্বর্গ আর নরক দুইটী বিপরীত মেরুর কল্পনা, দুইটীর মধ্যে যোগসূত্র মাত্র এইটুকু যে, পাপ করার ফলে নরক বাস ত' করিবেই কিন্তু পুণ্য যেটুকু করিয়াছ, নরক বাসের নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে পুণ্যের ফলটুকু ভুগিবার জন্য একবার স্বর্গ দেখিয়াও আসিবে। স্বর্গ দেখিয়া তারপরে কোথায় আসিবে? এই মর্ত্ত্যধামেই আসিবে। এই মর্ত্ত্যধামে আসিয়া নিজ কর্ম্মানুযায়ী উত্তম বা অধম স্থানে, দেবতুল্য লোকের বা মহাপাষণ্ডের কুলে, নানা অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবে। পুণ্য করিয়া যাহারা স্বর্গে যায়, তাহারাও পুণ্যানুযায়ী স্বর্গবাস করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এই বিচারে স্বর্গকে এবং নরককে যে রূপে দেখা যাইতেছে, যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানিক স্বর্গারোহণ ব্যাপারটায় একটা দিক দিয়া তাহার সহিত গুরুতর রূপান্তর লক্ষ্য করা যাইতেছে। যুধিষ্ঠির যে স্বর্গে গিয়াছিলেন, তাহা কতকটা ভৌগোলিক দেশের মতন মনে হয়। এখনো হিমালয় ভ্রমণে গিয়া তীর্থযাত্রীরা যুধিষ্ঠিরের সেই স্বর্গ গমনের পথ অনুমান করিয়া দর্শন করিয়া থাকেন। রাজা দশানন যে স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ শুরু করিয়া আর শেষ করিলেন না, এখনো তীর্থ-পাণ্ডারা

সেই সিঁড়ি তীর্থযাত্রীদের দেখাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, এ স্বর্গ একটা ভৌগোলিক দেশ, যেমন কাশ্মীর বা সুইজারল্যাণ্ড অনেকের নিকটে স্বর্গ এবং তাহা নিতান্তই জড় জগতের দুইটী মনোরম দৃশ্যমণ্ডিত সুন্দর দেশ। স্বর্গ হইতে দানবেরা দেবতাদিগকে বারংবার বাহুবলে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, ইহার বর্ণনা পুরাণ-সমূহে আছে। কেহ কেহ বলেন, অহুরমজদার-উপাসক নিরাকারবাদী জরথুস্ত্রীয়ান পারসিকরা পরমসুন্দর ইরাণ দেশ হইতে যে আর্য্যদিগকে বারংবার বিতাড়িত করিয়াছিল, ইহা তাহারই স্মৃতিচারণ মাত্র। অসুর মানে জরথুস্ত্রীয়ান ইরাণি। সুর মানে অন্যমতাবলম্বী আর্য্য হইলে হইতে পারে। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, চতুর্দ্দিকে দারুণ রুক্ষতাপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে ইরাণের প্রস্রবণধারাময়ী সুন্দরী মৃত্তিকা একদা স্বর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাই এই স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দেবতাদের আফশোষের সীমা ছিল না। কিন্তু আর্য্যরূপী সেই দেবতারা পঞ্চনদের পূর্ব্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকার শ্যাম-সুষমা দেখিয়া সুন্দরী ইরাণকে ভুলিয়া গেলেন অথচ একদা-সৌভাগ্যচ্যুতির দুঃখটুকু তাঁহাদের অবচেতন মনে রহিয়াই গেল এবং তাহাই কবিত্বের স্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া পুরাণের নানা কাহিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই অনুমানগুলিও সত্য হইলে হইতে পারে এবং তাহাই যদি হয়, তবে স্বর্গ একটা ভৌগোলিক দেশ ছাড়া আর কিছুই নহে। তপস্বীরা সারা

জীবনের ত্যাগ, দান ও পুণ্য দ্বারা যে স্বর্গকে অর্জ্জন করেন, তাহা আর দানবেরা অস্ত্রবলে যে স্বর্গকে জয় করেন, তাহা এক বলিয়া মনে করা সুকঠিন। পুণ্য ক্ষীণ হইলে যে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুনঃ নিজ তপস্যানুযায়ী ঔরসে, গর্ভে, পরিবারে বা প্রজাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সেই স্বর্গে আর দধীচি প্রমুখ আত্মত্যাগী ঋষিদের অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত অব্যর্থ অস্ত্র বজ্র দ্বারা নিধন করিয়া যেই স্বর্গকে অসুর-কবল হইতে উদ্ধার করিতে হয়, সেই স্বর্গে পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান। আত্মিক স্বর্গ আর জড় জগতের স্বর্গ কদাচ এক হইতে পারে না।"

নিজ কর্ত্তব্যে লাগিয়া থাক

ঢাকা জেলান্তর্গত রাইপুরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে যতটুকু পার, কাজ করিয়া যাও। কাজের ফল হাতে হাতে পাইলে না বলিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। জগতের অধিকাংশ বড় কাজের ফল আসে বিলম্বে। ডাঁটা গাছে আর ঢেঁড়শ গাছে যত দ্রুত ফলফুল আসে, আম-কাঁঠাল-নারিকেলের কি তত দ্রুত ফল আসে? সৎ উদ্দেশ্য নিয়া কাজ করিয়া যাইতে থাক। যতটুকু কাজ করিবে, ততটুকু সুফল তোমার জন্য, তোমার দেশের জন্য, তোমার জাতির জন্য, তোমার অধ্যুষিত এই জগতের জন্য রহিয়া যাইবেই।

সৎ কাজের সৎফল হইতে তোমাদিগকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারিবে না। সদ্যঃ সদ্যঃ ফল যদি কিছু পাও ত' ভালই, না পাইলেও গৃহীত কর্ম্ম পরিহার করিও না। নিষ্ঠা, ধৈর্য্য এবং দৃঢ়তা সহকারে নিজ কর্ত্তব্যে লাগিয়া থাক। একদা তোমার শ্রম সাফল্যের স্বর্ণকিরীট নিশ্চিতই পরিবে।"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজ

ঢাকা জেলান্তর্গত তেওতা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কাজ যে করিতেছ, তাহার বর্ত্তমানটাই সব-কিছু নহে, তাহার সম্পর্কে একটা অতীতও আছে, তাহার একটা অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎও আছে। অতীতের শ্রম, সেবা, প্রাপ্তির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, ভবিষ্যৎ-সম্পর্কে গৃহীত পরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং প্রচলিত নানাবিধ কর্ম্মস্রোতের সহিত অকারণ বিরোধ না জমাইয়া ধীর পদ-বিক্ষেপে দৃঢ়তার সহিত এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি করিয়া অগ্রগতির দিকে চলিতে থাকার নাম হইতেছে কাজ করা। করিলেই কাজ করা হইল না, স্থায়ী কুশলের দিকে সুনিশ্চিত পদক্ষেপ চাই। একথা যাহারা বোঝে না, তাহারা হুজুগকে কাজ বলিয়া ভ্রম করে এবং দীর্ঘকাল নানা হুজুগ করিয়া অস্থিরতা লাভের পরে হাত-পা ছাড়িয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে। বুদ্ধি এবং প্রত্যয় লইয়া কাজ করিবে, কাজের ভিতর দিয়া তোমার চরিত্রটি

বিকশিত হউক, কাজের উপরে তোমার চরিত্র প্রতিফলিত হউক। ইহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজ।"

কর্ম্মবিমুখ কর্ম্মসমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কর্ম্মরুচি সৃষ্টি

পাবনা জেলান্তর্গত ফুলকোচা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সৎকাজের যাহার সামর্থ্য আছে অথচ মন নাই, এমন লোককে সৎকাজে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে কৌশলের প্রয়োজন হয়। কৌশল যে কত রকমের হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যাবতীয় কৌশলের মধ্যে হুজুগ তোলা একটা মোক্ষম্ কৌশল বলিতে হইবে। ইহার একমাত্র দোষ এই যে, হুজুগে যোগদান করিতে করিতে মানুষের হুজুগপ্রিয়তা এতই বাড়িয়া যায় যে, শেষে আর কোনও কাজই ইহাদিগকে হুজুগের আড়ম্বর ছাড়া করান যায় না। কিন্তু একটি হুজুগ অপেক্ষা পরবর্ত্তী হুজুগটি যদি অধিকতর চমকদার ও চটকদার না হয়, তাহা হইলে হুজুগের আবেদন ইহাদের মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। ফলে ছল, চাতুরী, মিথ্যা, শঠতা, অন্যায় ও অবাঞ্ছনীয় উপায়-সমূহ অবলম্বিত হয়। জাতিকে ধীর-পদ-বিক্ষেপে সুস্থ মস্তিষ্কে চলিবার প্রেরণা দিতে অক্ষম হইয়া যোগ্য নেতৃত্ব তখন হয় বিপথে চলে নতুবা বিস্মৃতির চিরান্ধকারে আত্মগোপন করে। পরবর্ত্তী কালের জনসাধারণ

এই সকল নেতাকে ক্ষণকালের জন্য স্মরণ রাখাও প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে না। চটক নহে, চমক নহে, সিনেমার ষ্টাণ্ট নহে, সরল, সবল, সহিষ্ণু, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাশীল, আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর, নবশক্তিতে দৃপ্ত কল্যাণকর্ম্মই দেশ ও জাতির তথা জগতের জন্য প্রয়োজন। ইহার ভিতরে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ধাপ্পা এবং ধোঁকার প্রবেশাধিকার নাই। এই কথাটি মনে রাখিয়া কর্ম্ম-বিমুখ কর্ম্ম-সমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কাজ করিতে হইবে।"

আমার মত কি ভাবে প্রচারিত হইবে

কুমিল্লা জেলান্তর্গত ময়নামতী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার মত প্রচারের জন্য কোনও কৃত্রিম কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে না। চাঁদ উঠিলে পৃথিবী যেমন আপনা আপনি আলোকিত হয়, ফুল ফুটিলে সৌরভ যেমন আপনা আপনি মলয়ানিলে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, আমার মতও ঠিক সেই ভাবেই প্রচারিত হইবে। তবে উপলক্ষ্যের প্রয়োজন। সেই উপলক্ষ্য তোমাদের প্রতিজনের জীবনের সাধনা। নিজ নিজ জীবনকে গঠন করিয়া নিবার প্রয়োজনে আমার মতকে যতটা প্রচার করা আবশ্যক, ততটুকু ত' তোমরা করিবেই। আমি এমন কিছু করি নাই, বলি নাই,

ভাবি নাই, যাহার প্রচারে জগতের কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে। কিন্তু তোমরা ত' জগতেরই অংশ। তোমাদের কল্যাণটা হইবে একেবারে প্রত্যক্ষ ভাবে। নিজ কল্যাণের প্রয়োজনে তোমরা আমার জগৎকল্যাণকারিণী বাণী প্রচার করিতে নিশ্চয়ই অধিকারী। নিজেকে গড়িয়া নিবার আগ্রহ যাহার একান্ত অকপট, সে হইতেছে উত্তম অধিকারী।"

ভক্তের দেশ

নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীবাবামণির আগমন-সংবাদ যেন কাহাকেও দেওয়া না হয় এবং শ্রীযুক্ত নরোত্তমও সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু নরোত্তম হঠাৎ হাইলাকান্দি গেলেন কেন, ফিরিয়া আসিবার কালে তার মুখচন্দ্র এত আনন্দোজ্জ্বল দেখাইতেছিল কেন, সঙ্গে যে দুই জন লোক আসিলেন, তাঁহারাই বা কে, দুই চারি জনের মধ্যে ইহা লইয়া জল্পনা হইল। ফলে সন্ধ্যার পরে শ্রীযুক্ত নরোত্তমের বন্ধুস্থানীয় কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছু উপদেশ শুনিতে চাহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণির স্বহস্তে খোদাই করা কাঠের ব্লকে ছাপান কিছু মন্ত্রবাণী নরোত্তমের ঘরে টাঙ্গান ছিল, সেই দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেত করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কথা বলার আজ বড় অরুচি। ঐ দেখো নরোত্তমের ঘরে টাঙ্গানো রয়েছে আমার উপদেশ। এর বেশী কিছু বলতে পারব না।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় শ্রীশ্রীবাবামণি শয্যাশ্রয় লইলেন। রাত্রি আড়াইটায় জাগিয়া উঠিয়া পুনরায় ছুটিতে হইবে নালাবাজার রেল ষ্টেশানে। সময় মত না যাইতে পারিলে ট্রেন মিলিবে না। পর দিনই হইলাকান্দিতে ভাষণ আছে। কিন্তু রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটার সময় নালা চিরিরবন্ধ হইতে চারি জন প্রবীণ ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন মহাপুরুষ-দর্শনার্থে। সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী আপত্তি করিলেন, এই সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণির ঘুম ভাঙ্গানো যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকেরা বায়না ধরিয়া বসিলেন, দর্শন করিবেনই। অগত্যা ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাবামণিকে জাগাইয়া দিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সব কাজেরই একটা সময় অসময় আছে রে! দেখা এখন হবে না।

ভদ্রলোকেরা নিরাশ হইয়া আফশোষ করিতে করিতে ফিরিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে শ্রীশ্রীবাবামণি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়াছেন। নরোত্তমকে ডাকিয়া বলিলেন,—ভদ্রলোকেরা কোথা থেকে এসেছিলেন রে!

—বেশ কতকটা দূর, নালার কাছে চিরিরবন্ধ থেকে।

—ডেকে আন্ দেখি! তাঁরা কত দূরে গেছেন, বলতে পারিস?

নরোত্তম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। অর্দ্ধ মাইল দূরে তাঁহাদের পাওয়া গেল। সংবাদ পাইয়া আনন্দ-কলরব করিতে করিতে সকলে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈষ্ণব সাধু যজ্ঞেশ্বর গোস্বামী মহাশয় আকুলি প্রাণ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভু তুমি দয়াল কল্পতরু।

শ্রীযুক্ত ভবানন্দ দাস গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ধন্য হ'লাম, কৃতার্থ হ'লাম।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ দাস বলিলেন,—ভাগ্যে একজনের মুখে একটা গুঞ্জন শুনেছিলাম, তাই ছুটে এলাম। গুজবে বিশ্বাস না করলে ত' আজ এই ভাগ্যোদয় হত না।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচরণ দাস বলিলেন,—আজকের তিথিটা আমাদের জীবনে চিরস্মরণীয় দিন হ'য়ে থাক্‌বে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ্‌তে পাচ্ছি, দেশটা ভক্তের দেশ।

দেবী ও দেবোত্তম

ষ্টেশানে রওনা হইবার সময় হইয়া আসিল। শ্রীমতী নির্ম্মলা এবং শ্রীযুক্ত নরোত্তম গুরুপাদপদ্মে প্রণত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি উভয়ের মস্তকে দুই হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—মা নির্ম্মলা, তুমি দেবী, নারী নও, এজন্যই যে স্বামী তোমাকে কামের শিক্ষা দিতে রক্তলোলুপা রাক্ষসীতে পরিণত করেছিল, তাকেই তুমি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষে পরিণত করেছ। আর নরোত্তম, তুমি শুধু নরোত্তম নও, তুমি দেবোত্তম, তোমাদের সম্বৎসরব্যাপী ত্রুটিহীন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনের সামর্থ্য

তোমাদিগকে দেবত্বায় রূপান্তরিত করেছে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা আরও তিনটী বৎসর পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন কর।

উভয়ে প্রণত হইয়া গুরুর আদেশ আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিলেন। *

হাইলাকান্দি (কাছাড়)
৫ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৪১
(১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

সরোজ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবামণি হাইলাকান্দি পৌঁছিয়াছেন। উঠিয়াছেন শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে।

কয়েক বৎসর আগে শ্রীশ্রীবাবামণি গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে কোথাও আসিতেছিলেন। সেখানে সরোজ বাবুর সহিত আলাপ হয়। তিনি আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, হাইলাকান্দি আসিতে এবং তাঁহার গৃহে উঠিতে। শ্রীশ্রীবাবামণি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তাঁহার গৃহে উঠিয়াছেন। ভদ্রলোক সমগ্র সহরময় ছুটাছুটি করিয়া অদ্য অপরাহ্ণে যে স্থানীয় টাউনহলে শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা হইবে, তাহা প্রচার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য তিনি যথোপযুক্ত অর্থও ব্যয় করিয়াছেন। একটা মাত্র লোক,

* এই দম্পতী এই তিন বৎসর নিখুঁত ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

নিজের সাধারণ একটুকু ব্যবসায়ের ক্ষুদ্র আয়, তিনি যে এত শ্রম আর এত ব্যয় করিতে পারেন, ইহা ধারণাতীত।

নারীর মহিমা

অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকায় হাইলাকান্দি টাউন হলে মহিলাদের সভা হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি পূর্ণ দুই ঘন্টাকাল ভাষণ দিলেন। সভাস্থলে তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণরতা মহিলাদের মধ্যে একটুকু ফিস্‌ফাস্ শব্দ পর্য্যন্ত হইল না।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগৎ-সভ্যতায় নারী এক অপরিহার্য্য বস্তু। নারীকে কেন্দ্র ক'রেই সংসার, সমাজ ও দেশ, নারীকে কেন্দ্র ক'রেই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য। যেখানে নারী নাই, সেখানে বিস্তার নাই, আনন্দ নাই, উৎসব নাই। নারী মানবজীবনে এক অত্যদ্ভুত প্রাণ-কেন্দ্র, যাকে আশ্রয় ক'রে কত ঋষি, কত কবি, কত দার্শনিক নিজেদিগকে অভিব্যক্ত ক'রে তুললেন। জননীগণ, তোমাদের মহিমা অপার। কিন্তু তোমরা কি সে কথা জানো?

দার্শনিকের দৃষ্টিতে নারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দার্শনিকেরা নারীকে বস্তু রূপে দেখেন নাই, দেখেছেন তত্ত্বরূপে। দেখেছেন সৃজনী প্রতিভার

উৎস-রূপে। দেখেছেন মাতৃত্বের অমৃত-নিঃস্যন্দন আধাররূপে। দেখেছেন সর্ব্বমানবকে কাছে টেনে আনার আকর্ষণী শক্তি-রূপে। আর যারা বস্তু ব'লেই নারীকে ধ'রে নিয়েছেন, তারা দেখেছেন, এই বস্তুর সংস্পর্শে এলে কেমন ক'রে পুরুষগুলি বস্তুগুলি তালগোল পাকিয়ে নিজেদের সমস্ত চৈতন্য নারীতে বিসর্জ্জন দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে নিরর্থক হ'য়ে যায়। নারীর এই অসাধারণত্বের জন্যেই তাঁরা নারীকে নাম দিয়েছেন প্রকৃতি। নারী বিশ্ববিধাতার শ্রেষ্ঠ বিভূতি, নারী বিশ্বস্রষ্টার আসক্তির মূর্ত্তি।

কবির দৃষ্টিতে নারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কবির দৃষ্টিতে নারী সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তার রূপচ্ছটা যেন উষাগমের পূর্ব্বাভাস, তার সুষমা তার সর্ব্ব-অঙ্গ-জোড়া, কোনো অঙ্গে কোনো প্রত্যঙ্গেই সে কদাচ কুৎসিত নয়, অসুন্দর নয়, অবাঞ্ছনীয় নয়, অনবলোকনীয় নয়। তার ভ্রূভঙ্গে কোটি ইন্দ্রধনুর বিচিত্র লীলা, তার প্রতি রোমকূপে শত সমুদ্রের শুভ্র ফেনিল চূর্ণিত তরঙ্গের অপরূপ মেলা, তার কুঞ্চিত কুন্তলে নববর্ষার সুধাবর্ষণোন্মুখ ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা, তার নয়নে কোটি চন্দ্রমার স্নিগ্ধতা। সে সুন্দর, তাই সে বরণীয়, তাই সে স্পৃহণীয়, তাই সে চিরবাঞ্ছিত। নীরস রুক্ষ মরুভূমি-তুল্য শুষ্ক হৃদয়ে সে প্রেমরসসঞ্চারিণী অমোঘ প্রেরণা।

ঋষির দৃষ্টিতে নারী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ঋষির দৃষ্টিতে নারী আনন্দ, বিশ্বের সমস্ত হর্ষের উৎস, সমস্ত উৎসবের উল্লাস, নারী পূর্ণতার তৃপ্তি, স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত প্রজ্ঞার জন্মভূমি। এত ভাবে এত জন নারীকে দেখেছেন তাঁদের দিব্য দৃষ্টিতে।

নারীর উন্নতিতে জাতির উন্নতি

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু মায়েরা, সে কথা কি তোমরা জান? তোমরা কি জানো যে, তোমাদের বাদ দিয়ে চলা যায় না ব'লেই কেউ তোমাদের মা ব'লে ডাকে, কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ব'লে পূজা করে আর সেই পূজার মধ্য দিয়ে নিজ জীবনের চরম চেতনাকে জাগ্রত করে, পরম সার্থকতাকে লাভ করে? তোমরা কি জানো যে, তোমাদের বাদ দিয়ে চলা যায় না ব'লেই তোমরা কারো হৃদয়ের রুদ্ধ স্নেহের দুয়ার খুলে দাও নয়নানন্দদায়িনী নন্দিনী-রূপে, কারো জীবনে জীবন্ত প্রেরণা সঞ্চারণের জন্য এসে দাঁড়াও ভগিনী রূপে, কারো বা সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ-আত্মাকে অধিকার ক'রে নিজের সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিয়ে নাও অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী-রূপে? এই শক্তি দিয়েই তোমরা গড়েছ সংসার, পত্তন করেছ সভ্যতার, সৃষ্টি করেছ নব নব দেশে নব নব সংস্কৃতিকে, অফুরন্ত মসী যুগিয়েছ সাহিত্যিকের লেখনীতে। তোমরা

যেখানে ঊর্দ্ধমুখ, সমাজ সেখানে উন্নত, তোমরা যেখানে নিম্নগামী, সমাজ সেখানে পতিত। এভাবে তোমরাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছ দেশ ও সমাজের প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্ত্রী। কিন্তু সে কথা কি তোমরা জানো? সে কথা কি তোমরা বিশ্বাস কর?

পুরুষ দুঃসাহসী

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—পুরুষ স্বভাবতই গৃহসীমা-লঙ্ঘনকারী দুঃসাহসী এক অভিযাত্রী, ঘরের কোণে বদ্ধ হ'য়ে সে থাকতে চায় না, নিজের পৌরুষকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখা তার পক্ষে অসহ্য, সে কেবলি দূরদূরান্তরে ছুটে ছুটে যেতে চায়, যে নিয়ম তারই কুশলের জন্য প্রতিষ্ঠিত, তাকে সে ভেঙ্গে খান্ খান্ ক'রে দিতে চায়, তার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার তোড়ে সে অতীতের সমস্ত শুভসংস্কার ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দিতে চায়, অমিতাচার, অহিতাচার, ব্যভিচারকে গ্রাহ্যও সে করে না, যেমন বেপরোয়া তার গতি, দুর্দ্দম তার সাহস, লজ্জা তার নাই, ঘৃণা তার নাই, নিজের কিছু ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য সে যে-কোনো অকার্য্য কুকার্য্য অবহেলে ক'রে ফেলতে পারে, অবিরাম করে। সমাজ-মধ্যে নানা বিধি-বিধান গ'ড়ে উঠেছে ব'লেই পুরুষকে তা মানতে হবে? কেন সে তা মানবে? তার ইচ্ছা না হ'লে সে এসব মানবে না। সে কি কারো নিন্দার বা বাধার, শাসনের বা রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা রাখে? সে বেপরোয়া ব'লেই ত' তার নাম পুরুষ,

সে পুরুষ ব'লেই সে বেপরোয়া। বৃহৎ মহীরুহ বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্য বৃক্ষের ছায়াতলে প'ড়ে থেকে বামনের মত চিরকাল বালখিল্যই থেকে যাবে? তার কি শাখা-প্রসার ঘটিয়ে সকলের ঊর্দ্ধে উঠতে হবে না? কেন সে চিরকেলে বা সেকেলে সংস্কার মানবে? সে মানবে না, কেউ তাকে তা' মানতে বাধ্য করতে পারবে না। পুরুষের এই হ'ল পরিচয়।

নারী রক্ষণশীলা

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু নারী? সে সমাজবৃক্ষের মূল, সে তার জন্মভূমির মাটিকে ছেড়ে দিতে পারে না। বাহিরের ঝড়-ঝাপটা সমাজ-বৃক্ষের উপরে যত বেশী অত্যাচার সুরু করবে, নারী তত নূতন নূতন শাখামূল, উপমূল সৃষ্টি ক'রে অগণিত সংখ্যায় মাটির ভিতরে চতুর্দ্দিকে অধিকতর উৎসাহে ছড়িয়ে দেবে যেন একটা শিকড় ছিঁড়ে গেলে অন্য দশটা বিশটা ত্রিশটা শিকড় গাছটাকে অবিচল ভাবে অনায়াসে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখতে পারে। মাগো, তোমরা ধ'রে রেখেছ ব'লেই সমাজটা আজও আছে। তোমাদের এই বিরাট অবদানের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এখনো সচেতন নয় ব'লেই তোমাদের কৃতিত্ব বা মাহাত্ম্য ক'মে যেতে পারে না।

সুদীর্ঘ দুই ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতায় কত বিষয়ই যে আলোচিত হইল, লিখার সাধ্য নাই।

আমার লাভ হইয়াছে

বক্তৃতান্তে শ্রীশ্রীবাবামণি যখন হল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন হলের মধ্যে তুমুল হুলুধ্বনি উত্থিত হইল। মন্ত্রমুগ্ধ মহিলারা এতক্ষণ বুঝিতেই পারেন নাই যে, বক্তৃতা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং অগ্নিবর্ষী বক্তা সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

হলের বাহিরে বড় রাস্তায় অনেক শিক্ষিত পুরুষ দণ্ডায়মান ছিলেন। একজন শ্রীশ্রীবাবামণির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন,—আমারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার কম্বুকণ্ঠের সুমধুর গদ্য-সঙ্গীত এতক্ষণ মুগ্ধ মানসে শ্রবণ করছিলাম। আগামী কাল আপনি কি পুরুষদের জন্য একটা ভাষণ দিতে পারেন না? অনেক লোক আকাঙ্ক্ষিত হ'য়ে আছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আগে জানলে পারতাম। কল্পনা আমার তাই ছিল। সোম, মঙ্গল, বুধবার তিনটা দিন একেবারে ব'সেই কাটালাম। বৃহস্পতিবার যা হ'ল তাকে ভূরিভোজন বলে না, বলা চলে জলগণ্ডূষ মাত্র। শুক্রবার মুসলমানদের ঈদ ছিল, কিন্তু তাতে আমাদের সভার কোনো বাধা হ'ত না। তাঁরা তাঁদের মনের খুশীতে ঈদের নমাজ পড়তেন নির্দ্দিষ্ট স্থানে, আমরা আমাদের মনের খুশীতে ধর্ম্মকথা বলতাম অন্য স্থানে। আটকাত না। কিন্তু আপনারাই ত'

কেউ এগিয়ে এলেন না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে, সেই সিলেট থেকে আমি এক রকম বিদায় নিয়েই চলে এসেছিলাম, পুনরায় সেখানে যাবারই প্রোগ্রাম করেছি। এখন আর এখানে থাকা চলে না।

ভদ্রলোকেরা তথাপি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এখন আর তো হয় না। আমি আজই শ্রীহট্টে দুর্গেশ্বর বাবুকে টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিয়েছি যে কাল শ্রীহট্ট পৌঁছুচ্ছি। এ প্রোগ্রাম বদল করা অসঙ্গত।

ভদ্রলোকেরা খুবই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজনকে বলিতে শুনা গেল,—শিলচরের অমুক বাবুরা স্বামীজীর বিরুদ্ধে আমাদের কাছে চিঠি-চাপাটি পাঠিয়ে এই কাণ্ডটা করালেন। এমন বক্তৃতা শুনতে পেলাম না। আমাদের সত্যই ক্ষতি হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আপনাদের লাভ ক্ষতির কথা জানি না, কিন্তু আমার লাভ হ'য়েছে বিস্তর। আমি এক ঝাঁকে কজন ভক্ত দেখে এসেছি। ভক্ত-দর্শনে মহাপুণ্য। ভক্তেরা ভাগ্যবান, ভক্তেরা দেশের সম্পদ। আর আমি শিব-পার্ব্বতী-তুল্য এক দম্পতীকে দেখতে পেয়েছি, যা এই যুগে প্রায় দুর্লভ। আমার দিক দিয়ে লাভের পরিমাণ এক কণাও কম হয় নি।

ভদ্রলোকেরা কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

৬ই ফাল্গুন, ১৩৪১

শরীরের নাম মহাশয়

ট্রেন খুব সকালে। আহার করিয়া স্থান ত্যাগের উপায় নাই। সরোজ বাবু কিছু উৎকৃষ্ট আতপ চাউল, মুগ ডাল, কিছু আলু-বেগুন এবং ফলমূল নিয়া দিলেন। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটিতে যাইতেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি বাধা দিলেন। বলিলেন,—একদিন এমন সময় হবে, যখন ফার্ষ্ট ক্লাসেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথ-পর্য্যটন কত্তে হবে। ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কাট্‌বে তখন, এখন থার্ড ক্লাসই ভাল। জানেন সরোজ বাবু, ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনকে কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, ও মশাই আপনি থার্ড ক্লাসে চড়েন কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—ফোর্থ ক্লাস নেই ব'লে। আমাদের দেশ গরীবের দেশ, অধিকাংশ লোক দুবেলা খেতে পায় না। এদেশে খাদ্যে, বস্ত্রে, যান-বাহনে আমাদের গরীবানা চালই সঙ্গত। আর, আমি ত' খন্তা-কোদাল-কুড়াল-গাঁইতির একনিষ্ঠ সাধক। থার্ড ক্লাসই ভাল।

সরোজ বাবু বলিলেন,—কিন্তু আপনাকে কঠোর পরিশ্রম কত্তে হয়, তার উপরে যদি আবার পথশ্রম বাড়ে, তবে তা' ক্লেশকর।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু এখনো আমার চুল পাকে নি। আমাকে কঠোর পরিশ্রম কত্তে হয় ব'লে আবার সহানুভূতি কেন? বয়স হ'লে দেহ আরাম চাইবে, তখন তাকে তোয়াজ করা যাবে। এখন নয়। শরীরের নাম, মহাশয়, যা' সহাও তাই সয়।

ছেলেধরা

কুলউড়া জংশনে আসিয়া জানা গেল, শ্রীহট্ট-গামী ট্রেনের অনেক দেরী। শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভালই হ'ল। প্লাটফরমে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসা যাক্, ট্রাঙ্ক খোল, দপ্তর বের কর, চিঠি লিখ্‌ব।

সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী একটু দূরে ষ্টোভ ধরাইলেন। তিনি রান্নায় মনোযোগ দিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি চিঠি লিখিতে বসিলেন।

একটী স্কুলের ছাত্র বই-বগলে করিয়া কোথায় যাইতেছিল। কৌতূহলী হইয়া দাঁড়াইল। পুঞ্জীকৃত চিঠির স্তূপ জমিয়া গিয়াছে। সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক চিঠির লেপাফায় আঠা দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া টিকিট মারিতে উদ্যত হইলে ছাত্রটী বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিল,—বাপ্‌রে বাপ, এত চিঠি।

শ্রীশ্রীবাবামণি চিঠি হইতে চোখ তুলিয়া ছাত্রটীর পানে তাকাইলেন। বলিলেন,—তোমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে। কেমন, তাই না?

—হাঁ, সত্যি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এত চিঠি আপনি লেখেন কাকে?

কাকে? এই আমাকে। আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে আছি। তাই এইখানকার আমি সবখানকার আমি-কে পত্র লিখে আমার মনের কথা সব জানাই।

—আপনি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী?

—হাঁ বাবা, আমি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী। কোটি ব্রহ্মাণ্ডে এমন একটুকু স্থান নেই, যেখানে আমি নেই। এইখানে ব'সে আছি আমি, দেখ্‌তে কতই না ছোট কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সৌরজগৎ, যার এক একটীতে একটা ক'রে সূর্য্য আর অনেকগুলি ক'রে গ্রহ নিজ নিজ কাজ ক'রে যাচ্ছে, সব মিলে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার সর্ব্বত্র আমি আছি, আর তার সবকিছু আমারই মধ্যে আছে। এই জন্যই আমি সবাইকে সর্ব্বত্র চিঠি লিখি।

—কৈ, আমাকে ত' কোনো চিঠি লেখেন নি আপনি?

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—লিখেছি বাবা, লিখেছি কিন্তু সেই চিঠি তুমি এখনো পাও নি। একদিন পেয়ে যাবে। তখন আরো অবাক্ হবে। দেখ্‌বে, আমি তোমাকে কত কথা লিখেছি।

—কি লিখেছেন?

—লিখেছি, হে ক্ষুদ্র বালক, তুমি ক্ষুদ্র নও, অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, কল্পনাতীত বড় তোমার ভবিষ্যৎ। আজ তুমি কত ছোট কিন্তু একদিন তুমি ক্রমবিকশিত হ'তে হ'তে কত বড় হবে, তার ইয়ত্তা নেই। তুমি কখনো আত্মবিশ্বাস হারিও

না, তুমি কখনো দুর্ব্বলতার কাছে নতি স্বীকার ক'রো না, তুমি কখনো পাপ পথে ধাবিত হ'য়ো না। তুমি নিজের কর্ত্তব্য চিন্‌তে চেষ্টা কর এবং অবিচলিত বিক্রমে সেই পথে সাহসের সঙ্গে চল।

এই সময়ে ষ্টেশানের একটা কামরা হইতে একজন রেল-কেরাণী বাহির হইলেন। কথাগুলির কিছু কিছু শুনিলেন। ছাত্রটীকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওহে বালক, অপরিচিত লোকের কথা শুনো না। বাড়ী চলে যাও। কত রকমের সব ছেলেধরা আজকাল বেরিয়েছে। তোমাকে হয়ত ধরে নিয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ না লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি।

ছেলেটী একবার এদিক, আর একবার ওদিক তাকাইয়া হঠাৎ এক দৌড় দিল। মুখে কি একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিল বুঝা গেল না।

রেল-বাবুও চলিয়া যাইতেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবামণি ডাকিলেন। বলিলেন—ও মশাই, আসুন, এখানে একটু বসুন।

—আমার কোনো দরকার নেই।

—আছে। আপনি একটী নিরীহ বালককে ছেলেধরার ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়িয়েছেন। ছেলেটী কৌতূহলী হ'য়ে আমার লেখা চিঠিগুলি দেখ্‌ছিল। আপনি এই চিঠিগুলি পড়ুন। প'ড়ে দেখুন, আমি শুধু ছেলেধরাই নই, ছেলেদের বাপ-ধরা আমি, ছেলেদের মা-ধরা আমি, ছেলেদের পিতামহ-পিতামহী-ধরা আমি, ছেলেদের মাতামহ-মাতামহী-ধরা আমি।

আমি সবাইকে ধ'রে রেখেছি ব'লেই জগৎটা আছে। পড়ুন না মশাই আমার চিঠিগুলি।

স্তূপের মধ্যে কমপক্ষে পঁচিশ ত্রিশখানা খামের আর কার্ডের চিঠি পড়িয়াছিল। দুতিনখানা ধরিয়া তিনি রেল-বাবুর হাতে দিলেন।

ভদ্রলোক চিঠিগুলি পড়িবার কোনও চেষ্টা না করিয়াই ছুটিলেন তার অফিসের দিকে এবং ঘরে ঢুকিয়া দরজা দিলেন বন্ধ করিয়া।

কে জানে, ইনিও ছেলেধরাকে ভয় করিতেছিলেন কিনা। শ্রীশ্রীবাবামণি কিছুক্ষণ মনের আনন্দে হাসিয়া লইয়া পুনরায় পত্রলেখায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি দশটা পাঁচ মিনিটে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীহট্ট পৌঁছিলেন। অ্যাডিশনাল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা মহাশয় নিজে তাঁহার গাড়ী নিয়া ষ্টেশনে আসিয়াছেন শ্রীশ্রীবাবামণিকে অভ্যর্থনা করিতে।

শ্রীহট্টের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত লালমোহন রায়ও ষ্টেশনে আসিয়াছেন আর আসিয়াছেন তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রহিমপুরের শ্রীশশাঙ্ক মোহন রায়। তাঁহার বলিলেন,—শ্রীহট্টের লোকেরা আপনার বক্তৃতা শোনার জন্য পাগল। এজন্য এখানে দুটি দিন আপনার বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কাজটা ভাল কর নাই। আমার দু'চার দিন বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

শ্রীহট্ট

৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৪১

(১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫)

পুনরায় সেই দুর্গেশ্বর বাবুর বাড়ী। দর্শনার্থীদের খুবই ভিড় হইল। শ্রীহট্টের বক্তৃতামালার প্রশংসাই অধিকাংশের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বলা, শোনা ও করা

একজনের কথার পৃষ্ঠাতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—বক্তাদের প্রশংসা ক'রে লাভ নেই। বক্তার বক্তৃতা যেন বন্যার জল। এই জলের সঙ্গে অনেক পলিমাটি প্রচুর সার নিয়ে দেশটাকে হয়ত প্লাবিত ক'রে দিয়ে গেল। কিন্তু সে পলিমাটিকে সদ্ব্যবহারে কে আনল, সেইটী হচ্ছে আসল কথা। এই পলিমাটির সারটুকুকে কাজে যিনি আনলেন, প্রশংসা হচ্ছে তাঁরই প্রাপ্য। কথা বললুম বা শুনলুম কিন্তু কাজ করার জন্য কাউকে প্রলুব্ধ করতে বা প্রবৃত্ত করতে পারলুম না, এখানেই বক্তৃতাদান ব্যর্থ হ'য়ে গেল। সৎকথা বলা ও শোনা নিশ্চয়ই লাভজনক, কেননা, এর ফলে সদ্বিষয়ের রুচি বাড়ে কিন্তু চূড়ান্ত লাভ হচ্ছে কাজ করায়। বলা আর করা যেমন এক কথা নয়, শোনা আর করাও তেমন এক কথা নয়। বলেই ক্ষান্ত হতে পারি না, শুনেই ক্ষান্ত হতে পারি না, করাও চাই। যেখানে মানুষ কথা বলে

আবার কাজও করে, কথা শু'নে তাকে কর্ম্মে রূপদানের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পায়, বক্তার আর শ্রোতার সম্মান মাত্র সেখানেই হওয়া উচিত।

গতকাল এবং অদ্য যে সকল পত্র লিখিত হইল, তাহার কয়েকখানার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

তুমি অনন্ত সদ্‌গুণের আধার

রাজশাহী জেলান্তর্গত ঘোড়ামারা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন—

"পদ্মার চরে বালুকা-রাশির কণা গণিতে দিলে তুমি কয় শতাব্দীতে সেই কাজটী শেষ করিতে পারিবে বলিতে পার? তোমার ভিতরেও অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলির সংখ্যা তদ্রূপই কল্পনাতীত। এত গুণের তুমি অধীশ্বর কিন্তু কেবল অনুশীলনের অভাবে ইহাদের প্রকাশ ঘটিতেছে না। সবগুলি গুণের যুগপৎ অনুশীলন কদাচ সম্ভাব্য ব্যাপার নহে কিন্তু একটী একটী করিয়া গুণকে বাছিয়া নিয়া চেষ্টা করিয়া তাহার অনুশীলন করিলে কতকদিন পরে তাহা এমনই প্রকৃতিগত হইয়া যাইবে যে, তখন আর তাহার পৃথক অনুশীলনের জন্য চেষ্টার আবশ্যকতা হইবে না, সদ্‌গুণটী নিজের স্বভাবে আপনা আপনি তোমার জীবনকর্ম্মে অনুশীলিত হইবে এবং তোমার জীবনধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। পাপ বা কুৎসিত আসক্তি আজ তোমাকে ক্রীতদাসের ন্যায় চাবুক মারিয়া চালাইতে

চাহিয়াছে দেখিয়াই ঘাবড়াইয়া যাইও না। দৃঢ়পণ কর যে, জীবনের অপসম্ভাবনাগুলির তুমি মূলোৎপাটন নিজ ভুজবীর্য্যেই করিবে। বিশ্বাস কর, তাহা তুমি পারিবেও।"

দিকে দিকে অসংখ্য মণ্ডলী গঠন কর

কুমিল্লা জেলান্তর্গত শ্রীঘর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেখানে এক মতের মতী ও এক পথের পথী হইয়া তিনটী লোকেও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, সেখানে তোমরা অবিলম্বে একটী করিয়া অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন কর। ইহার প্রধান কাজ হইবে, সমবেত উপাসনা। তোমাদের উপাসনায় জগন্মঙ্গলসঙ্কল্প বাধ্যতামূলক। এই জায়গায় তোমরা জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপরে উঠিয়া যাইবার অধিকার পাইয়াছ। ব্যক্তিগত মুক্তি তোমাদের লক্ষ্য নহে, তোমরা সমগ্র বিশ্বের মুক্তি চাহ। সেই মুক্তি শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তিই নহে, অন্য সর্ব্ববিধ মুক্তির সোপানশ্রেণী হইতেছে তোমাদের উপাসনার মন্ত্রাবলি। সকল মত সকল পথের প্রতি তোমরা শুধু সহিষ্ণু নহ, তোমরা শ্রদ্ধাশীলও। একটা স্থানে মণ্ডলী স্থাপিত হইলে সদস্য যদি মাত্র তিন জনও হও, তথাপি মিলনের মহিমায় তোমরা ছয় জনের বা নয় জনের কাজ

আবার কাজও করে, কথা শু'নে তাকে কর্ম্মে রূপদানের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পায়, বক্তার আর শ্রোতার সম্মান মাত্র সেখানেই হওয়া উচিত।

গতকাল এবং অন্য যে সকল পত্র লিখিত হইল, তাহার কয়েকখানার অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

তুমি অনন্ত সদ্‌গুণের আধার

রাজশাহী জেলান্তর্গত ঘোড়ামারা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন—

"পদ্মার চরে বালুকা-রাশির কণা গণিতে দিলে তুমি কয় শতাব্দীতে সেই কাজটী শেষ করিতে পারিবে বলিতে পার? তোমার ভিতরেও অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলির সংখ্যা অল্পাপেক্ষা কল্পনাতীত। এত গুণের তুমি অধীশ্বর কিন্তু কেবল অনুশীলনের অভাবে ইহাদের প্রকাশ ঘটিতেছে না। সবগুলি গুণের যুগপৎ অনুশীলন কদাচ সম্ভাব্য ব্যাপার নহে কিন্তু একটি একটী করিয়া গুণকে বাছিয়া নিয়া চেষ্টা করিয়া তাহার অনুশীলন করিলে কতকদিন পরে তাহা এমনই প্রকৃতিগত হইয়া যাইবে যে, তখন আর তাহার পৃথক অনুশীলনের জন্য চেষ্টার আবশ্যকতা হইবে না, সদ্‌গুণটী নিজের স্বভাবে আপনা আপনি তোমার জীবনকর্ম্মে অনুশীলিত হইবে এবং তোমার জীবনধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। পাপ বা কুৎসিত আসক্তি আজ তোমাকে ক্রীতদাসের ন্যায় চাবুক মারিয়া চালাইতে

চাহিয়াছে দেখিয়াই ঘাবড়াইয়া যাইও না। দৃঢ়পণ কর যে, জীবনের অপসম্ভাবনাগুলির তুমি মূলোৎপাটন নিজ ভুজবীর্য্যেই করিবে। বিশ্বাস কর, তাহা তুমি পারিবেও।"

দিকে দিকে অসংখ্য মণ্ডলী গঠন কর

কুমিল্লা জেলান্তর্গত শ্রীধর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যেখানে এক মতের মতী ও এক পথের পথী হইয়া তিনটী লোকেও দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ, সেখানে তোমরা অবিলম্বে একটী করিয়া অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন কর। ইহার প্রধান কাজ হইবে, সমবেত উপাসনা। তোমাদের উপাসনায় জগন্মঙ্গলসংকল্প বাধ্যতামূলক। এই জায়গায় তোমরা জগতের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপরে উঠিয়া যাইবার অধিকার পাইয়াছ। ব্যক্তিগত মুক্তি তোমাদের লক্ষ্য নহে, তোমরা সমগ্র বিশ্বের মুক্তি চাহ। সেই মুক্তি শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তিই নহে, অন্য সর্ব্ববিধ মুক্তির সোপানশ্রেণী হইতেছে তোমাদের উপাসনার মন্ত্রাবলি। সকল মত সকল পথের প্রতি তোমরা শুধু সহিষ্ণু নহ, তোমরা শ্রদ্ধাশীলও। একটা স্থানে মণ্ডলী স্থাপিত হইলে সদস্য যদি মাত্র তিন জনও হও, তথাপি মিলনের মহিমায় তোমরা ছয় জনের বা নয় জনের কাজ

করিয়া যাইতে পারিবে। চারিদিকে যদি অসংখ্য ছোট ছোট মণ্ডলী সন্ধ্যাকাশের তারকাবলীর ন্যায় মিট্‌মিট্ করিয়াও জ্বলে, তবু তাহাদের সকলের সংহতি যে-কোনও কর্মক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর সাফল্যের হইবে জনয়িত্রী। তোমরা আমার বাক্যে বিশ্বাস কর এবং এই বাক্য পালন কর।"

সমবেত উপাসনা ও অখণ্ডমণ্ডলী

কুমিল্লা জেলান্তর্গত বরকুল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমার পরিকল্পনায় অখণ্ডমণ্ডলীগুলি এক একটা অসাধারণ কর্ম্মের কেন্দ্র। শিক্ষাবিস্তার, অজ্ঞানতার নাশ, দুঃস্থের আত্মনির্ভরতার শক্তিতে দুঃখ-বিদূরণের উপায় লাভ প্রভৃতি ইহার বহিরঙ্গ সাধন। আসল অন্তরঙ্গ সাধন হইতেছে সমবেত উপাসনা। ভগবদ্‌ভক্তির ভিত্তিতে ঐক্যবোধ এবং সেবাবুদ্ধি না জাগিলে সেই ঐক্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও সেই সেবাবুদ্ধিতে আত্মসেবার চেষ্টা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। নিজেকে বিশুদ্ধ কাঞ্চনে পরিণত করিতে করিতে সকলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার প্রয়াসেরই অপর নাম সমবেত উপাসনা। মণ্ডলী স্থাপন করিলেই এই কাজটিকে প্রথম ও প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মণ্ডলী স্থাপন করিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

স্কুল, কলেজ হাসপাতাল, পিঞ্জরাপোল, অনাথাশ্রম, আতুরাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম আদি স্থাপন করিলে অথচ ইহার মূল বেদীস্বরূপ সমবেত উপাসনা ভুলিয়া গেলে, মণ্ডলীর ব্যাপারে কাহারও আচরণ এইরূপ হইলে চলিবে না। বরং উপর্যুক্ত সংকাজগুলি করিবার জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়িলে গড়িতে পার কিন্তু অখণ্ডমণ্ডলী একবার গঠিত হইলে তাহার মূল ভিত্তিই হইবে সমবেত উপাসনা। সমবেত উপাসনাতে যতক্ষণ অধিকাংশে সমভাবের ভাবুককে আনিয়া সুলগ্ন করিতে না পারিতেছ, ততক্ষণ অন্যান্য দশ, বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ রকমের জনহিতকর সৎকর্ম্ম মণ্ডলীর ভিতর দিয়াই করিবার প্রয়াসে কদাচ প্রযত্নপর হইও না। কারণ তদ্রূপ করিতে গেলে মণ্ডলীর প্রকৃত প্রাণটী বিশীর্ণ হইয়া যাইবে এবং মণ্ডলীর মাধ্যমে কৃত তোমাদের সৎকর্ম্মগুলি আস্তে আস্তে অসাত্ত্বিক রাজসিকতায় মেদস্বী ও স্ফীত হইয়া প্রবলবেগে ভুগিয়া মারা পড়িবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী একত্র হইয়া কাজ করিলে এবং নিয়ত চতুর্দ্দিকে নূতন নূতন মণ্ডলীর সৃষ্টি-কার্য্যে লাগিয়া গেলে কি যে মহাশক্তির বিকাশ ঘটিতে পারে এবং তাহার কি যে অসামান্য প্রকাশ মানবসভ্যতার নবতর অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তাহা আজ তোমরা কেহই অনুমান করিতে পারিবে না।"

নারীর ক্রন্দন ও নারীর আত্মমর্য্যাদাবোধ

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত গোমদণ্ডী-নিবাসিনী জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতের প্রান্তে প্রান্তে কত স্থানে কত যে স্বামী আছে, যাহারা বিবাহ করে একজনকে, ভালবাসে আর একজনকে, প্রতিপালন করে তৃতীয় একজনকে এবং সন্তানোৎপাদন করে চতুর্থ আর এক জনের গর্ভে, একথা কে ঠিক মত বলিতে পারিবে? এই স্বেচ্ছাচার, এই উন্মার্গগামিতা আদিম মানুষেরই হয়ত স্বভাব ছিল। মানুষ সভ্য হইয়া এক-পত্নীপরায়ণতার নিয়ম স্থাপন করিল এবং বর্ত্তমানে অতিমাত্রায় সভ্যতা হেতু এক পরায়ণতার ছদ্মবেশটাই হয়ত বাহিরে তাহার জাঁকজমক দেখাইয়া বেড়াইতেছে, আসল মানুষটা জীবন ভরিয়া এক ভুলের পর আর একটী ভুল করিয়া করিয়া ভুলের পাহাড় জমাইয়া ফেলিতেছে। এত বড় ভুলের রাজত্বে একটী দুইটী বা দুই শত পাঁচ শত সতী-সাধ্বী নারীর দুনয়নের অশ্রু দেখিবেই বা কে, তাহাদের কাতর কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ শুনিবেই বা কে? লম্পট ধনবান হইলে, রূপবান হইলে, বিদ্বান হইলে, বুদ্ধিবলসম্পন্ন হইলে অথবা রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হইলে দেশ বা সমাজ তাহার ব্যক্তিগত জীবন নিয়া মাথা ঘামাইতে চাহে না, দেশের লোক বা সমাজের

লোকের যত রক্তচক্ষু ধনহীন, রূপহীন, বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন ও রাষ্ট্রশক্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত সাধারণ লোকদের ভুল-ভ্রান্তির উপর। কথায় বলে, দেবতারা সিংহ-ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মাংস খান না। কারণ তাহাদের পরাক্রম আছে, মাংস খান নিরীহ দুর্ব্বল আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছাগকুলের। সুতরাং পুরুষের জীবনে যদি অন্যায় দেখে, নারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের কাছে সুবিচার পাইবে না। আবার, নারী-চরিত্রের এমনি এক বিশেষত্ব যে, যে স্বামী তার স্ত্রীটিকে নিরন্তর অন্যায়, অবিচার ও লাঞ্ছনা দিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, সেই স্বামীরও সর্ব্বজনসমক্ষে অপমান কোনও নারী সহ্য করিতে পারে না। ইহা নারীর দুর্ব্বলতা নহে, ইহা নারীর মহত্ত্ব। মহত্ত্ব মানে শক্তি। নারী নিজেকে কেন শক্তিহীনা মনে করিবে? উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে সে যদি সৎপথে ফিরাইয়া আনিতে না পারে, তবু তাহার হাল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কেননা, কোনও সংগ্রামেরই পূর্ণ বিজয়ের পূর্ব্বে শেষ নাই। নারী নিজেকে উন্নত করুক, নিজেকে মহিমান্বিত করুক, নিজের মূল্য সর্ব্বপ্রকারে অকল্পনীয় রূপে বর্দ্ধিত করিবার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করুক। নারী এমন হউক, যেন তাহার বিপথভ্রান্ত স্বামী তাহাকে মনে মনে ভয় করিতে, শ্রদ্ধা করিতে নিজের চেয়ে শতগুণ ঊর্দ্ধচারিণী বলিয়া জ্ঞান করিতে বাধ্য হয়। নারীর ক্রন্দন আমাকে বেদনা দেয়, নারীর আত্মমর্য্যাদাবোধ আমাকে উদ্দীপ্ত করে।"

স্ত্রীর সেবায় ও সহিষ্ণুতায় স্বামীর নবজন্ম লাভ

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ঢাশারা-নিবাসিনী জনৈকা পত্রলেখিকার পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কিছু কিছু স্ত্রীলোক এমন দুর্ভাগ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে যে, তাহাদের স্বামীরা কখনই তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না। স্বামীর এই অসন্তোষ সমূলকও হইতে পারে, অকারণও হইতে পারে। যে অসন্তোষের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তাহা দূর করা যায়, মূল কারণটিকে উৎপাটিত করিলেই। স্ত্রী অলস, স্বামী অসন্তুষ্ট হইলেন,—এরূপ ক্ষেত্রে অলসতা দূর করিতে পারিলেই স্বামীর অসন্তোষও দূরীভূত হইবে। স্ত্রী অপরিচ্ছন্ন, স্বামী অসন্তুষ্ট হইলেন, পরিচ্ছন্নতার স্বভাব আয়ত্ত করিলেই স্বামীর অসন্তোষ বিনাশ পাইবে। স্ত্রী কটুভাষিণী, স্বামী অসন্তুষ্ট হইলেন, এরূপ ক্ষেত্রে কটুভাষণ পরিত্যাগ করিলেই স্বামীর সন্তোষ উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু কোনও কারণ নাই, তথাপি স্বামী কেবল দোষ ধরিবেন এবং নিশিদিন খুঁতখুঁত করিবেন, এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর পক্ষে আত্মসংশোধনের কোনও পথ থাকে না। থাকে না বলিয়াও কিন্তু পথ আছে। তাহা হইতেছে নিজের ভিতরের মহনীয়তাকে

এমন একটী বিকাশ দেওয়া, যাহাতে খুঁৎখুঁতি রোগগ্রস্ত স্বামীটী হাসপাতালের নার্সের হাতের রোগীটিতে পরিণত হইয়া যায় এবং সর্ব্বব্যাপারে তাহারই অধীন হইয়া পড়ে। তখন স্বামীর রুগ্ন মনকে আস্তে আস্তে স্নেহ দিয়া, মমতা দিয়া, ভালবাসা দিয়া, অমৃতমধুর বচন দিয়া, সান্ত্বনা দিয়া, বুঝপ্রবোধ দিয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা যায়। এই ভাবে দীর্ঘকালের সেবা ও সহিষ্ণুতার ফলে হঠাৎ একদিন স্বামী আবিষ্কার করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যায় যে, পত্নী রূপে তাহার ঘরে একটা প্রেতিনী বাস করিতেছিল না, বাস করিতেছিল এক দেবী তার দেবীত্বকে নারীত্ব দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দারুণ এক দুর্ব্বোধ্য ছদ্মবেশে। তখন স্বামীর এক নবজন্ম লাভ হয়।"

সংগঠনের প্রাণ

নোয়াখালী জেলান্তর্গত ঢেওয়ারিয়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংগঠন একটা বিরাট ব্যাপার। ইহা শুধু বিরাটই নহে, ইহা একটী সূক্ষ্ম শিল্প-কর্ম্ম। সহরের দেওয়াল জোড়া বড় বড় প্রাচীর-পত্র, পথে পথে বিতরিত সহস্র সহস্র প্রচার-পুস্তিকা, ভাষণমঞ্চের সুগম্ভীর সুললিত সুদীর্ঘ বক্তৃতাধ্বনি সংগঠনের বহিরঙ্গ মাত্র,—প্রাণ নহে। এই বহিরঙ্গ না থাকিলেও সংগঠন চলে, কিন্তু প্রাণহীন বস্তুর কোনও মূল্যই

নাই। ব্যক্তিগত পরিচয়, আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতা ও নিরন্তর যোগাযোগ হইতেছে সংগঠনের প্রাণ। যাহাদের ভিতরে নবীন প্রেরণা জাগাইতে চাহ, তাহাদের সহিত মিশিয়াছ কি? তাহাদিগকে ভালবাসিয়া একান্ত আপন করিয়া লইয়াছ কি? তোমার চরিত্রবলের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা এবং তোমার বিশ্বসনীয়তার উপরে তাহাদের আস্থা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছ কি? ইহা যদি পারিয়া থাক, তবে সংগঠন তোমার কাছে অতি সহজ কাজ, সংগঠন তোমার সহজাত প্রতিভা। আর, ইহা যদি না পারিয়া থাক, তবে তোমার সংগঠন অমূল তরু মাত্র, ইহার মূল্য কিছুই নহে। ইহা যদি না চাহিয়া থাক, তবে সংগঠন সম্পর্কে তুমি নিতান্তই অজ্ঞ, আনাড়ী বা মূর্খ রহিয়াছ বলিয়াই রুচি তোমার সেই দিকে ধাবিতই হয় না। যে যাহার মহিমা জানে না, সে কি কখনো তাহার দিকে ঝোঁকে?"

সংগঠন কাহাকে বলে

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত পাহাড়তলী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখককে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"কত কত মহতের কত কত বাণী,
দিকে দিকে ছড়াইয়া আছে,
তার মাঝখান হ'তে কুড়াইয়া আনি,
দেখ কিসে মৃতপ্রাণ বাঁচে

যে বাণী সুনির্ম্মল সত্যতায় ঝলমল,
যে বাণী প্রাণের চেয়ে প্রিয়,
সতত যতন করি' পূজার থালিকা ভরি'
শ্রদ্ধায় জনে জনে দিও।
অজেনারে এই ভাবে করিও আপন,
এই ভাবে জয় কর সারাটি ভুবন।

"ইহার নাম সংগঠন।

"সংগঠনকারীকে আদর্শনিষ্ঠ হইতে হইবে, সহিষ্ণু হইতে হইবে, ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে, শবরীর ন্যায় প্রতীক্ষার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে, মৌমাছির ন্যায় প্রতি ফুলে মধু খুঁজিতে হইবে, পিপীলিকার ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমী হইতে হইবে, ভাবুক হইতে হইবে, প্রেমিক হইতে হইবে, কবি হইতে হইবে, দার্শনিক হইতে হইবে, বাস্তব জগতের প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকিতে হইবে, কল্পনার জগৎ কোটি দিগন্তকেও ছাড়াইয়া যাইবে।"

সংগঠন, সাহস, চরিত্র ও আত্মবিশ্বাস

বরিশাল জেলান্তর্গত গাভা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্যই বল আর স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যই বল, কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে প্রথমেই হইতে হইবে নির্ভীক, তারপরেই প্রয়োজন কলঙ্কহীন চরিত্রবলের, তৎপরে আবশ্যক ধারাবাহিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবার যোগ্য অধ্যবসায়,

যে অধ্যবসায় কদাচ পরাজয় স্বীকার করিবে না। ভয়াতুর ব্যক্তির চরিত্র-গৌরব নিতান্তই বিনিয়োগ-সামর্থ্যহীন কোটিপতির অতুল সম্পদের ন্যায় জড় বস্তু, ইহার দ্বারা জগতের ধন, মান, কুশল কিছুই বর্দ্ধিত হয় না। চরিত্রের মহত্ত্ব নিজে বাড়িবার মধ্যে আর অপরকে বাড়িয়া যাইবার আনুকূল্য দানের যোগ্যতার মধ্যে। সাহস-সমন্বিত না হইলে চরিত্র কেবল নিজের গুণেই দিকে দিকে কল্যাণ-কর্ম্মের প্রসার সাধন করিতে পারে না। প্রতিটি প্রাণের দুয়ারে যাইয়া করাঘাত করিয়া তোমাদিগকে অন্ধকার কারাগৃহগুলিতে নবোদিত প্রদীপ্ত সূর্য্যের বিমল কিরণ প্রবেশের পথ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে নিরন্তর লাগিয়া থাকার নাম সংগঠন। হৈ-চৈ, হট্টগোল, সভাসমিতি, ফেরিওয়ালার চীৎকার, জনতার ভিড় আর সংবাদ-পত্রের রিপোর্টের নাম সংগঠন নহে। সাহস লইয়া কাজ করিবে, চারিত্রিক শক্তি অটুট রাখিয়া কাজ করিবে, জগতের প্রত্যেককে তোমরা সৎপথে টানিয়া আনিতে যে পারিবে সেই বিশ্বাসে অটল হইয়া কাজ করিবে।"

ইতিহাস কথা কহিবে

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত কানুনগোপাড়া-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অবিরাম ক্ষেত্র-নির্ম্মাণে রত থাকিবার নাম সংগঠন।

সুমহান আদর্শ নয়ন-সমক্ষে রাখিয়া সমুদ্দেশ্যে নিষ্ঠার নিঃস্বার্থ শ্রম করিয়া যাওয়া এবং শ্রম সফল হউক বা নিষ্ফল হউক, কোনও অবস্থাতেই হতাশ না হইয়া একই উদ্দেশ্যকে চূড়ান্ত পরিণতির দিকে আগাইয়া নিয়া যাইবার জন্য চতুর্দ্দিকের পরিবেশকে কেবলই অনুকূল করিয়া যাইতে থাকার নাম সংগঠন। কে কোথায় তোমার কাজের বিরোধিতা করিল, তাহা নিয়া জটলা, আলোচনা, তর্ক বা পরামর্শে সময় নষ্ট না করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সকল বিরোধিতাকে চরম সাফল্যের দ্বারা পরাহত করিয়া দিবার জন্য পরাক্রান্ত পরিশ্রমের নাম সংগঠন। সফলতা কুসুম-শয্যা নহে, উহা কণ্টক-কিরীট। ইহা জানিয়া ইহা বুঝিয়া প্রত্যেকে পরম নিষ্ঠার সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে থাক। দেখিবে, মৌন মূক নিঃশব্দ ইতিহাস হঠাৎ কথা কহিতে সুরু করিবে। মিশরের সুরক্ষিত 'মমী' না হইয়া প্রতিজনে প্রতিক্ষণে উল্কাপিণ্ডের মতন দ্রুত-গতি-শীল ও মধ্যাহ্ন ভাস্করের মতন ভাস্বর ও দেদীপ্যমান হও। শত যুগের আলস্য-তন্দ্রা বিদূরিত হউক, সদাজাগ্রত বিশ্বস্ত প্রহরীর ন্যায় জগতের মঙ্গলকে রক্ষা কর।"

মানুষ ও সরল সত্যের সহজ পথ

চট্টগ্রাম জেলান্তর্গত ফতেয়াবাদ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অতিরিক্ত কাব্যের আবেশ আর সাহিত্যিকতার অপলেখতা তোমাদের সত্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলার দরুণ তোমরা অতি সহজ সরল সাধারণ কথাটাকেও এমন ঘোরালো, প্যাঁচালো, জটিল, কুটিল, ফেনিল উচ্ছ্বাসে ভরিয়া দাও যে, অল্প একটুখানি তত্ত্বকে বুঝিবার জন্যও চক্ষুকে তিন চারি পৃষ্ঠাব্যাপী কাব্যালঙ্কারের গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সহজ কথাটাকে সহজ ভাবেই বলিও, সরল কথাটাকে সরল ভাবেই বলিও, নিছক কাব্যের বা দার্শনিকতার জন্য যে কথাটি কহিতে চাহ, তাহাতে যত ইচ্ছা সাহিত্য-দর্পণ বা শাস্ত্রীয় ভাব্যের সুপ্রয়োগ কর, আপত্তি দেখি না। মানুষের চিন্তা প্রণালীও স্বচ্ছ সরল হওয়া আবশ্যক। চিন্তাপদ্ধতিতে জটিলতা থাকিলে কদাচ অতি দ্রুত কোনও সংসিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এই জন্যই দার্শনিক-বিচারপরায়ণ পণ্ডিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা সরল-বিশ্বাসী সাধারণ ভদ্রলোক জনসমাজে বেশী সমাদর পাইয়া থাকেন। কাব্যের কাকলী কর্ণরসায়ন হইতে পারে কিন্তু সরল সত্য হৃদয়-মনকে ঝঙ্কৃত ও পুলকিত করে, সে ঝঙ্কার আর সে পুলক এমন, যাহা মানুষের বাস্তব জীবনকে অবিরাম প্রভাবিত করে। চিন্তায় যেমন কৃত্রিমতা বর্জ্জন আবশ্যক, বাক্যেও তদ্রূপ জানিও। কাব্য অনেক সময়ে যে কৃত্রিমতার দৃষ্টান্ত, সাহিত্যিকতা অনেক সময়ে যে শুধু বাগাড়ম্বর হইতে পারে, এই কথাটী মনে রাখিও। কবি বা দার্শনিক হওয়ার চেয়ে জীবনের

প্রাণাতের মহত্ত্ব প্রকৃত মানুষ হওয়া। মানুষ হইতে হইলে সরল সত্যের সহজ পথই শ্রেষ্ঠ পথ।"

পিতৃ-পিতামহের শুভ অভিপ্রায় তোমার জীবনে ন্যস্ত সম্পত্তির ন্যায় পবিত্র

ময়মনসিংহ জেলান্তর্গত কালিয়াজানি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"নিজ জীবনটাকে পিতৃপিতামহের এক অপূর্ব্ব দান বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাঁহাদের জীবনের সদ্‌গুণগুলি অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং নিজ জীবনে সেগুলির ব্যাপক অনুশীলন ও সুগভীর চর্চ্চা করিতে হইবে। তাঁহাদের শুভ অভিপ্রায়গুলিকে তোমার জীবনে ন্যস্ত সম্পত্তির ন্যায় মূল্যবান্ ও পবিত্র বলিয়া গণনা করিতে হইবে। এই একটা দারুণ দায়িত্ব বংশধরের উপরে যে সুকৌশলে অর্পিত হইয়া রহিয়াছে, এই কথাটুকু বারংবার স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই শ্রাদ্ধ নামক একটী প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, জানিও। একজন মরিলে আর একজনে পার্থিব জগতে বসিয়া তাঁহার আত্মার উদ্ধার করিতে পারেন, এই কল্পনার চাইতেও একজন গতাসু হইলে তাঁহার প্রাণের স্পন্দনকে ব্যাপকতর, বিশালতর, গভীরতর করিয়া জগৎজোড়া অনুভূতিতে পরিণত করিবার

সার্থকতা আছে, এই সত্যে তোমাদের অধিকতর বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। একেবারে গুণহীন মানুষের ঘরে আমরা একজনেও জন্মগ্রহণ করি নাই। এই জন্মজাত গুণসংক্রমণশীলতাই, একদা যাহারা অমানব জন্তুবিশেষ ছিল, তাহাদিগকে বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বর্তমান মানুষ করিয়াছে। পিতৃপিতামহের প্রতি ভক্তির ইহা সমর্থক। পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, উপদেশগুলি নিতান্তই বাজে কথা নহে। যে কল্যাণ জগতের জন্য তাঁহারা চাহিয়াছিলেন, তাহাকে রূপদান করিতে হইবে তোমাকে, তোমার পুত্রকে, তোমার পৌত্রকে এবং তাহাদের বংশবাহকদিগকে।"

সুধন্য পিতা

রংপুর জেলান্তর্গত সদ্যপুষ্করিণী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে পিতামাতা নিজেরা চূড়ান্ত ভাবে যৌবন-সুখ উপভোগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে কাহাকেও কাহাকেও যে দেখা যায় নিজ পুত্র বা কন্যাকে সংসারের জান্তব দিকটা হইতে মুক্ত রহিয়া সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করিতে উৎসাহ দিতে, তাহার প্রকৃত উৎসটা কি হইতে পারে, ভাবিয়াছ? যৌবন-সুখের চর্চায় ইহারা বারংবার লিপ্ত হইতেছেন শুধু অভ্যাস-রূপ দুরন্ত শক্তির অবাঞ্ছিত

তাড়নায় কিন্তু বারংবার সম্ভোগ-সুখ-লিপ্ত হইয়াও একথাই শুধু বুঝিতেছেন যে, সত্যিকারের সুখ এখানে নাই। ইন্দ্রিয়-সুখচর্চার যে ঘনিষ্ঠ অবস্থাটা দিকে দিকে শত শত সংসারকে সৃষ্টি করিল, বিস্তার দিল, বংশধারাকে প্রবহমান করিল, সেই সুখ নিজে একান্তই অস্থায়ী এবং অকিঞ্চিৎকর। পুরুষ ও নারীর মধ্যে অতীব গভীর প্রেমসঞ্চার ব্যতীত ইহার নৈতিক সুফল আর কিছুই নাই। অন্য দিক দিয়া এই চর্চা নানা দুঃখ, ক্লেশ, আশঙ্কা, উদ্বেগ ও সমস্যারই শুধু সৃষ্টি করিতেছে। ইহা বুঝিতে পারিয়াই এমন পিতামাতারা কেহ কেহ চাহেন যে, তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রটি বা কন্যাটী যেন সংসারের গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া অবিরাম অর্থহীন ঘূর্ণিপাক খাইয়া না মরে। সে পুত্র ভাগ্যবান্, যাহার পিতা এই ভাবের চিন্তা করেন কিন্তু সে পুত্র নিতান্ত মন্দভাগ্য, যে মনে মনে সমালোচনা করিতে পারে যে, তাহার পিতামাতা অবাধে করিবেন ইন্দ্রিয়-চর্চা, আর সন্তানের জন্য ব্যবস্থা করিবেন বৈরাগ্য, সন্ন্যাস আর নির্জলা একাদশী। পিতাকে লম্পট বলিয়া ভাবিতে আমি দুই চারিটী কৃতী ও বহু অকৃতী ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ইঁহারা নিজেদিগকে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন বলিয়া মনে করেন বলিয়াই এইরূপ অসুন্দর চিন্তা করিতে সাহস পান। কিন্তু পিতা অসংযমীই হউন আর লাম্পট্যদোষদুষ্ট কুৎসিতকারী ব্যক্তিই হউন, একজন পিতা

না থাকিলে তুমি বা আমি এই জগতে আবির্ভূত হইবার রাস্তা পাইতাম না। নিজ জীবনে ইন্দ্রিয়সেবার কুফল অনুভব করিয়া কোনও পিতা যদি পুত্রকে ইন্দ্রিয়সেবাবিমুখ সন্ন্যাস-জীবনের প্রতি উৎসাহিত করেন, তবে এমন পিতাকে গর্হণ না করিয়া সহস্রশঃ প্রশংসা করিতে হইবে। তবে, পিতৃপ্রদত্ত প্রেরণার তুমি সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে কিনা, পিতৃদত্ত সুযোগকে তুমি কাজে আনিবে কিনা, ইহা সম্পূর্ণতঃ তোমার নিজের রুচি, প্রবৃত্তি, অধ্যবসায় ও পুরুষকারের উপরে নির্ভর করে। কিন্তু এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তোমার পিতা সুনিশ্চিতই সুধন্য পিতা, যিনি অন্য দুই শত পাঁচ শত জন পিতা হইতে একেবারে পৃথক্ এবং বিশেষ।"

মহাপুরুষ

অন্য দুইটী স্থানে দুইটী বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং দর্শনার্থীদিগকে কোনও কথাবার্ত্তা না কহিয়াই বিদায় দিতে হইয়াছে। একজন খুবই রুষ্ট হইলেন। বলিলেন,—মহাপুরুষ হলেই কি সাধারণ লোককে অবজ্ঞা কর্ত্তে হয়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কে বলেছে আমি মহাপুরুষ? বাল্যকালের নামটা মাত্র আমার পালটে গেছে, নইলে আর সব ত' ঐ আগেকার মানুষটারই রয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ যেমন খায়, দায়, ঘুমায়, কাজ করে, বিশ্রাম নেয়, আমারও

তেমনি। তফাৎ শুধু এইটুকু যে আমি কোনো নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির বা সুনির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠীর চাকুরি করি না। আমার চাকরি সকলের। অনেক মনিব যার, তার বড় ক্লেশ। সে সারাদিন খেটেও কাউকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারে না। একথা মনে করা উচিত নয় যে, অতিশ্রমে তার ক্লান্তি হবে না, শ্রান্ত দেহে সে বিশ্রাম নেবে না, সে আহার কর্ব্বে না, নিঃশ্বাস ফেলবে না। তবে অনেক মানুষ তাকে ভুল বুঝবেই। মানুষ যদি তার প্রয়োজনের তাগিদে বা অধিকারের দাবীতে মহাপুরুষ-নামধারী কারো উপরে অত্যাচারও করে, তবু মহাপুরুষকে তা হাসি মুখে সহ্য ক'রে যেতে হবে।

শ্রীহট্ট

৮ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৪১

অদ্যও শ্রীহট্ট সহরের দুই প্রান্তে দুইটী স্থানে শ্রীশ্রীবাবামণিকে ভাষণ দিতে হইল।

কথার উৎস

একজন প্রশ্ন করিলেন,—এত কথা আপনার আসে কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভগবানে একান্ত নির্ভরই হচ্ছে আমার কথার উৎস, তিনিই আমার কথার ভাণ্ডার। নিজেকে যখন মহৎ মনে করি, তখন মুখে কথা জোগায় না, নিজেকে

যখন অকিঞ্চিৎকর মনে করি এবং নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে নিজেকে পরমেশ্বরের হাতে ছেড়ে দিই, তখন ভগবান শ্রোতাদের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ সংসাধন ক'রে দেন। ভগবান্ শ্রোতাদিগকে যা ভাবান, আমার মনে তার তরঙ্গমুখরিত অনুরণন বাজতে থাকে। চ'খ বুজে নিঃশঙ্কে নির্ভয়ে জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল বিষয়ে ব'লে যাই, ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করার বা থামবার প্রয়োজন ঘটে না। কথার উৎস ভাব, ভাবের উৎস নির্ভর, নির্ভরের উৎস বিশ্বাস আর বিশ্বাসের উৎস স্বয়ং শ্রীভগবান্।

(ষোড়শ খণ্ড সমাপ্ত)

ষোড়শ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অকপী থাক	২৬৩
অজ্ঞানতা ও আলস্য	৯৩
অতঃপরীর কথা	১৩২
অন্তরের অন্তস্থতা ও উপাসনা	১৬০
অমার্জ্জনের উদ্দেশ্য	২৬৫
অভিক্ষা	১৮
অভিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	২৮৩
অভিমানে বিসর্জ্জন দাও ৯২,২৭৩	
অর্দ্ধনারীশ্বর	৯
অরাজনৈতিক সমাজসেবা করিতে থাক	২৭২
অলসতা ও বাতব্যাধি	১৩১
অসৎ, অসাধুরা সৎ ও সাধু হউক	২৫৫
অসাম্প্রদায়িক উপাসনা-গৃহ স্থাপনের আবশ্যকতা	৬১
আইনের বলে বহু-বিবাহ নিরোধ	৫৬
আত্মজয়ী ও বিশ্বজয়ী	১৩৩
আত্মদান ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ	২২০
আত্মবিশ্বাস ও ভগবদ্বিশ্বাস কখন অবিরোধী	২৮৯
আত্মবিশ্বাস ভগবদ্বিশ্বাস চাই	২৮৮
আত্মসমর্পণ ও মহাশক্তি	৬৪
আত্মসমর্পণের পন্থা	২২১
আত্মসমর্পণের ভূমিকা	২২০
আত্মসংশোধন ও পরসংশোধন	১২৮
আত্মিক স্বর্গ ও জাগতিক স্বর্গ	২৬
আত্মোৎসর্গের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক	১৭৭
আদর্শ-পরায়ণ মহাজাতির সৃষ্টি	১৫০
আনন্দজনক গুরুভ্রাতৃসঙ্গ	১৩৬
আপনি কি যাদু জানেন	১১৮
আমন্ত্রণের প্রতীক্ষা কেন রাখিবে	৩০০
আমার ঈশ্বর-সেবা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বভাবে	১১৯
আমার দৃষ্টিতে নূতন মানুষের আবির্ভাব	৩২৫
আমার প্রাণ কাঁদিয়াছে	৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আমার মত কি ভাবে প্রচারিত হইবে	৩৩২
আমার লাভ হইয়াছে	৩৪২
আলস্যের পারিশ্রমিক নাই	১২৫
আর্য্য কে	৩০৭
আশাবাদী ও সাহসী হও	২৮৮
ইতিহাস কথা কহিবে	৩৬০
ইন্দ্রিয় মধ্যে ভগবদ্-ধ্যান	১৬২
ইন্দ্রিয়-সুখ ও বন্ধন-মুক্তি	১৩৬
উচ্চাদর্শ মানুষের ঐক্য ও নিত্য ইতিহাসের সৃষ্টি	২৭৯
উন্নতির শত্রু	১৩৮
উপদেশ-সমূহকে চিত্তাকর্ষক কর	২১৮
ঋষির দৃষ্টিতে নারী	৩৩৯
একই দিনে বহুস্থানে সমবেত উপাসনা	২৪৬
এক পত্নী থাকিতে পুনঃ পত্নী-গ্রহণ	৮৪
এক বস্তা চিঠি	৭৪
কঠিন কাজ সহজ করিবার উপায়	২৯০
কথার উৎস	৩৬৭
কবির দৃষ্টিতে নারী	৩৩৮
কর্ম্মবিমুখ কর্ম্মসমর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কর্ম্মরুচি সৃষ্টি	৩৩১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কাজ ও অকাজ	২৮৫
কাজ ও অকাজ চিনিবার উপায়	২৮৫
কাজ ছাড়িবার সময়	১৭৪
কাজে লাগিয়া থাক	৯৭
কাজে হাত রাখ	১৭৩
কিশোরী ভজন	১০
কিসে আমি সুখী হই	২৮৬
কীর্ত্তন পরিচালন	২৯৬
কুলোকের দ্বারা দল গড়িবার করুণ পরিণাম	২৫৩
কুসীদজীবীর আবির্ভাব	২৯২
কৃত্রিম উপায়ে দীক্ষাদান	২১২
কেমন ঐক্য চাই	২৪৪
ক্ষিপ্ত জনতার গুণ্ডামিতে কর্ত্তব্য	৪১
ক্ষুধার্ত্ত উদর বড়ই নিষ্ঠুর	২৬৩
গণিকাকে দীক্ষাদানে বিপত্তি	৩৭
গণিকার দীক্ষা লাভের অধিকার	৩৮
গর্ভবতী রমণী সন্ন্যাসার্থী	২২৪
গলা সাধা দরকার	৩১
গার্হস্থ্যের বিয়োগ-সাধনা	১১৫
গুণ্ডামি ও সত্য আন্দোলন	১৫১
গুর্ব্বস্তুর গ্রহণের বিপদ	১৫৪
গুরুকে দিয়া কোন্ প্রয়োজন	২৩৯

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গুরুদেবকে প্রদত্ত অর্থ	১০৮
গুরুদ্রোহী গুরুভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য	১৬৪
গুরুনিষ্ঠা	১১
গুরুবাদের উৎপত্তি	২৪১
গুরু-ভ্রাতাদের মিলন	২৩৩
গুরু-ভ্রাতার প্রতি গুরু-ভ্রাতার কর্ত্তব্য	১৮৪
গুরু ও শিষ্যের বিচ্ছেদের অধিকার	১৫৩
গ্রামের শত্রু ও কাজের শত্রু	১৩৮
চাই দৈবসম্পদে সুন্দর জীবন	২৬৭
চাকুরীয়া মনোবৃত্তি	১৭৫
ছেলেধরা	৩৪৫
ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব	১০০
জগদ্ধিতার্থে আত্মদান	২১৯
জঘন্যতম পাপ	১৪৬
জনতার মনোবৃত্তি	৪৪
জাগরণের বাণী	১৩৪
জাতিভেদের অভিসম্পাত	১৭৮
জাতিভেদের কুসংস্কার	২০১
জাতীয় জীবনে চেতনার লক্ষণ	১৫৮
জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর পাইবার উপায়	৯১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
জীবনকে সফল করিবার সহজ পথ	২৭৫
জীবনের উদ্দেশ্য	১৮৭
জ্ঞান কখনো কালতু হয় না	১৩
তরবারি কোষমুক্ত কর	২৭৭
তরুণের নিকটে প্রত্যাশা	১৫৭
তুমি অনন্ত সদ্গুণের আধার	৩৫০
তুমি এক সেতু	৩২৬
তোমাদের মধ্যে আমাকেই দেখিতেছি	১০৫
তোমার অধঃপাতই জাতির অধঃপাত	১২৫
দলাদলির উৎস	১৪০
দাম্পত্য প্রেম ও ঐশ্বরিক প্রেম	১৮৭
দাম্পত্য প্রেম কখন ঐশ্বরিক প্রেমের সহায়	১৮৮
দারিদ্র্য ও ধন	২২১
দার্শনিকের দৃষ্টিতে নারী	৩৩৭
দিকে দিকে অসংখ্য মণ্ডলী গঠন কর	৩৫১
দীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব	২২৫
দীক্ষার জন্য আত্মপ্রস্তুতি	২২৬
দীর্ঘায়ু লাভ লোভনীয়	১৫৯
দীর্ঘায়ু লাভের উপায়	১৫৯
দুর্য্যোগকে সুযোগ কর	৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দেবী ও দেবোত্তম	৩৩৫
দেশের কথা ভাব	১৩৫
দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কর্তব্য	২৫৮
দৈর্ঘ্যে সহস্রাংশে অগ্রসর হও	২৭১
নরোত্তম নাথ	৩১৮
নাম পতিত-পাবন	৩৭
নারীর উন্নতিতে জাতির উন্নতি	৩৩৯
নারীর ক্রন্দন ও নারীর আত্মমর্যাদাবোধ	৩৫৪
নারীর দেবীত্ব উদ্বোধনের উপায়	৫৫
নারী রক্ষণশীলা	৩৪১
নারীর মহিমা	৩৩৭
নারীর সতীত্ব, অকালমৃত্যু ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা	৪৮
নারীর সতীত্ব ও পুরুষ জাতির কর্তব্য	১৪৩
নিজ কর্তব্যে লাগিয়া থাক	৩২৯
নূতন পৃথিবী গড়িবার আয়োজন চাই	২৫০
নেতৃত্ব ও দাসত্ব	২০৬
পতিতকে উত্থান লাভের সুযোগ দাও	৩৫
পরদোষ দর্শন ও আত্মগঠন	৬৫
পরম সত্য জীবন	২১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পরিমাণ ও উৎকর্ষ	২৭১
পরিব্রাজনীয় গুরুভ্রাতৃসঙ্ঘ	১৩৭
পারস্পরিক সহযোগ শক্তির উৎস	৩১৫
পিতৃপিতামহের শুভ অভিপ্রায় তোমার জীবনে ন্যস্ত সম্পত্তির ন্যায় পবিত্র	৩৬৩
পিতৃমাতৃ-ভক্তি	১৭,৩০২
পুণ্যকর্ম চিনিবার উপায়	২৫৯
পুণ্যকর্মে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করিবার উপায়	২৫৯
পুরুষ দুঃসাহসী	৩৪০
পূর্ববর্তীদের কার্যাভার অনুবর্তীদের গ্রহণীয়	২৩৫
পৌরুষের পরাক্রম	২৮২
প্রকৃত উন্নতি	৩৪
প্রকৃত শিক্ষা	২৫৬
প্রকৃত সমস্যাকে চিন	৩২৪
প্রেমকে এককেন্দ্রক কর	১০৪
প্রেমবুদ্ধি তোমার কর্মের নিয়ামক হউক	২৯৯
বক্তার কি কি প্রয়োজন	৩১
বক্তৃতা দিতে যাবেন না	৭৩
বলা, শোনা ও করা	৩৪৯
বংশসেবার ও পুরোহিত শ্রেণী	৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বহু বিবাহ-নিরোধ ও অভিজাত রাজনৈতিক বিপর্যয়	৫৭
বহু-বিবাহ-নিরোধক আইন কখন লঙ্ঘনীয়	৫৮
বিদ্বেষপরায়ণা স্ত্রীকে অনুকূল করিবার উপায়	১৮৯
বিদ্যাভ্যাসের আবশ্যকতা	৯৫
বিপদ ও বিশ্বাস	২০৪
বিপদ সম্পর্কে সজাগ থাক	১৩০
বিপ্লব	৪
বিবাহ একটী পবিত্র বন্ধন	১৯৪
বিবাহ-প্রথার সংস্কার	২২
বিবাহাদি উৎসবে জাতি-পুষ্টি পূরণের উপায়	২১৪
বিবাহিত জীবনে অসহিষ্ণুতার কুফল	১৯৬
বিবাহিত জীবনে অসহিষ্ণুতার প্রতিফল	১৯৭
বিবাহের আকুলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা	১৯৪
বিবাহের আবশ্যকতা	১৯১
বিবাহের কামনা কি ভাবে জাগে	১৯২
বিবাহের হলাহলকে অমৃত করা যায়	১৯৮
বিভূতি ও প্রচার	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিশ্বাসীর নাহি পরাজয়	১৩৩
বিশ্বাসের শক্তি ও ষোল আনা মন দিয়া কর	২৩৮
বীরের মত মর	১৩৭
ব্যক্তির কুশল নহে, সমষ্টির কুশল	১৭
ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও সমাজ-কেন্দ্রিকতা	২০৪
ব্যবসায়ীর মনোবৃত্তি	১৭৬
ব্যাকুলতা ও আত্মসমর্পণ	২২১
ব্যাপক সংযম শিক্ষার আবশ্যকতা	২৮
ব্রহ্মচর্য্যই জীবনের যোগ	৭০
ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মোৎসর্গ উন্নতি ও সভ্যতার মানদণ্ড	২২৭
ভক্তপদরেণু ও প্রসাদের মহিমা	২২২
ভক্তের দেশ	৩৩৩
ভগবৎপ্রেমিকের জন্মমৃত্যু	১০৩
ভগবদনুরাগকে গোপন করা বনাম প্রকাশ করা	১৮
ভাগ অঙ্ক বা সন্ন্যাস	১২৪
ভাঙ্গা এবং গড়া	১৫৮
ভাবী বিপর্যয়	২১৩
ভারতের অভ্যুদয়ের পথ	২৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মণ্ডলী-গঠন ও তাহার উদ্দেশ্য	২৯৭
মৎস্য ও মাংসকে প্রসাদ জ্ঞান করা যায় কিনা	২১৬
মনোবল হারাইও না	১৯১
মহত্‌কে সম্মান করিও	৩১১
মহাপুরুষ	৩৩৩
মহাপুরুষের সঙ্গ ও জীবের মঙ্গল	২২৩
মহামন্ত্রে দীক্ষা	২০৭
মানুষ ও সকল সত্যের সহজ পথ	৩৬১
মানুষ দেখিলে মানুষ হয়	২৩১
যাহারা আমার করিছে বিরোধ	২৯
যুগান্তরের সৃষ্টি	৩১০
যুবশক্তি ও অভিভাবক শ্রেণীর দায়িত্ব	২৮০
যোনিপূজা ও লিঙ্গপূজা	৫
যৌবনকে ধরিয়া রাখার উপায়	৪৭
যৌবনের চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমনের উপায়	৮১
যৌবনের জাগরণ	২৮১
যৌবনের সদ্ব্যবহার কর	৮২
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা মানুষ মাত্রেরই কাম্য	৬৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আবশ্যকতা	৬৯
রুচিও চাই, প্রবৃত্তিও চাই	৩০১
রুচিমান করিতে হইবে	২৭৪
শতবর্ষ পরের উপাসনা-গৃহ	৬৩
শরীরের নাম মহাশয়	৩৪৪
শান্তি ও অভ্যুদয়ের পথ	৩১২
শিক্ষার্থী ও ব্রহ্মচর্য্য	১৬
শিক্ষার উদ্দেশ্য	২৬৬
শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ কর	৭৬
শিলচর-মহাযজ্ঞের উপসংহার	১৫৫
শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধনের প্রয়োজন নাই	২২৯
শুচিতা ও শুচিবায়ু	৯৫
ষড়যন্ত্র	২০
সঙ্গম তীর্থ	৩১৭
সৎকর্ম্মের প্রকৃত প্রবৃত্তি	২৬৮
সৎপথে থাকিয়া ব্যবসায়	২৩
সতীত্ব ও সমাজ	১৪১
সতীত্বনাশকারী দুর্বৃত্তকে কাবু করিবার উপায়	১৪৯
সতীত্বনাশকারীর প্রতি ক্ষমা	১৪৪
সতীত্ব বনাম সভ্যতা	২৩
সতীত্ব বিপন্ন হইলে কর্ত্তব্য	১৪৮
সতীত্বের মর্য্যাদা লঙ্ঘনে পরোক্ষ সহায়তাকারিগণ	১৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সত্যিকারের কাজ	১১৪
সদাচার-ভিত্তিক অধ্যবসায় ও সমবেত উপাসনা	১৮৩
সন্ন্যাসীর আদরের ও সম্মানের কারণ	১২২
সপত্নীর প্রতি সপত্নীর কর্ত্তব্য	৫১
সপরিবারে ঈশ্বর-সাধন	৯৯
সপ্তাহের প্রতিদিনই সমবেত উপাসনা	২৪৬
সব ভাল, যার শেষ ভাল	১৫২
সমদর্শী	২৪২
সমবেত উপাসনা ও অখণ্ডমণ্ডলী	৩৫২
সমবেত উপাসনা ও একক উপাসনার ফল-পার্থক্য	২৪৫
সমবেত উপাসনা এক মহামিলনের সাধনা	২৪৮
সমবেত উপাসনাকালীন পরিচ্ছদ	২৪৮
সমবেত উপাসনার বেদীতে বিগ্রহ	২৪৯
সমবেত উপাসনায় কি কি নিষিদ্ধ	২৫২
সমবেত উপাসনায় নবপ্রবর্তন	২৫২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সমবেত উপাসনায় ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের যোগদান	২৫০
সমবেত উপাসনায় সঙ্গী-সাথীর অভাবে	২১০
সমবেত উপাসনার যোগ-নৈবেদ্য ও প্রসাদ	২৫০
সমাজের জীবন-শক্তি বর্দ্ধন	৩৯
সম্প্রদায় কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়	১০৬
সম্প্রদায় কিসে বড় হয়	১০৭
সরোজ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩৬
সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আত্মানুশীলন	২৭০
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজ	৩৩৩
সর্ব্বাবস্থায় মনকে ভগবন্মুখী রাখিবার উপায়	২৮৯
সংগঠন কাহাকে বলে	৩৫৮
সংগঠন, সাহস, চরিত্র ও আত্মবিশ্বাস	৩৫৯
সংগঠনের প্রাণ	৩৫৭
সংযমেই পুষ্টি-জীবনের সুন্দরতা	১২১
সংযমের বলে জন্মশাসন কর	৩১৩
সাত্ত্বিক উৎসব-সমূহে প্রসাদের উপচার	২১৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সাধনে একনিষ্ঠা ও বহুদেববাদ	৭১
সম্প্রদায়ের জীবন	১৮
সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য্য পরিণতি	৫৩
সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা	১৮১
সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার কুফল	২৫৩
সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও মনের শক্তি	১৬১
স্বতন্ত্র শিক্ষা	৩৬৪
স্ত্রীকে বশীভূত করিবার উপায়	১১৩
স্ত্রী-জাতির প্রতি ঘৃণা-সঞ্চারের কারণ	৫৩
স্ত্রীর সেবায় ও সহিষ্ণুতায় স্বামীর নবজন্ম লাভ	৩৫৬
স্বদেশ-প্রেম ও দুর্যোগের প্রতীকার	৬৯
স্ব-সমাজের লোকদের মনের গহনে প্রবেশ কর	২২৮
স্বার্থ ও ঐক্য	২৪২
স্বাস্থ্যহীনতা ও মহৎ কর্ম্ম	১২৯
হতাশা ও স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার	১২৯
হরিনামকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য	২৯৫

(১)

হে প্রভো, করহ মোরে তেজোবীর্য্য দান,
বাহুতে অমিত শক্তি, বুকে ব্রহ্মজ্ঞান ॥
দেহে, মনে প্রাণে তুমি হও আপনার,
কোমল পরশে দূর কর অন্ধকার ॥
পরদুঃখে কর মোরে চঞ্চল অধীর।
নিজ দুঃখে রাখ মোরে অচঞ্চল স্থির ॥
অসত্য অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত রাখ মোরে
মম চিত্ত বাঁধ তুমি তব প্রেম-ডোরে ॥
কুবুদ্ধি কুমতি মম করহ দমন।
সর্ব্বজীবহিতে রত কর মোর মন ॥
সৎসাহস দাও মোরে সম্পদে বিপদে।
ধীরত্বে মণ্ডিত মোরে কর প্রতি পদে ॥
নিজেরে জানিয়া প্রভো তোমারি কিঙ্কর,
কোটি বজ্রাঘাতে যেন নাহি পাই ডর ॥
চরণারবিন্দে তব করি নমস্কার,
হে অমৃত, হে সুন্দর আনন্দ আমার।

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৭৭' নং গান।

(২)

যে আছ যেখানে নিখিল ভুবনে
নিকট অথবা দূর
এস হে সকলে; প্রাণ-ফুল-দলে
পূজা হবে শ্রীপ্রভুর॥

হবে উপাসনা শুভ উপচারে,
হৃদয়ের প্রীতি-ধন-সম্ভারে,
সবারে আনিয়া সকলেরে নিয়া
হব প্রেমে ভরপুর॥

সকলের হাসি স্নেহে ভ'রে দিব,
সকলের শত দুখ হ'রে নিব,
হরষ পরশে সরস দরশে
নাচিবে যে ব্যথাতুর॥

ঘুচিয়া যাইবে সকল অতীত,
ঘুচিয়া যাইবে অখিল অহিত,
প্রণব-মন্ত্রে প্রাণের যন্ত্রে
মূর্চ্ছনা সুমধুর,
জীবন জাগাবে,—উদ্ধার হবে
যত আছে সুরাসুর॥ *

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৬' নং গান।

(৩)

আমি, তেমন মানুষ চাই,
মান-অপমান, পতন-মৃত্যু,
গ্রাহ্য যাহার নাই॥

বিভীষিকা দেখি' হয় না আর্ত্ত,
পায়ে দ'লে যায় সকল স্বার্থ,
দীন-দুখীরে বুকে চেপে ধরে,
পতিতেরে ডাকে "ভাই"॥
কঠিন বুকের মাঝারে যাহার
করুণা-নির্ঝর ঝরে শতধার,
বাহিরে রুদ্র, ভিতরে শান্ত,
নির্ভীক সব ঠাঁই॥

তাদেরি লাগিয়া পিয়াসী নয়ন।
যৌবন-ছবি করিছে চয়ন,
একবার শুধু দেখিলে যাদের
পাগল হইয়া যাই॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '৩৮০' নং গান।

(৪)

একলা আমি মুক্ত হ'তে
চাই না প্রাণনাথ;
আমায় তুমি মুক্ত কর
বিশ্বজনার সাথ॥

সবাই যখন বদ্ধ কারায়,
মুক্তিতে মোর সাধ নাহি যায়;
সবার সাথে এক দশাতে
হোক্ এ জীবন-পাত॥

সবার শিকল ছিঁড়বে যেদিন,
আমার মুক্তি হোক্ না সে দিন,
সবাই যখন ব্যথায় অধীর,—
চাই বেদনার ঘাত॥

(৫)

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান,
শিখ বা ইহুদী, মুসলমান
আমার চক্ষে সব সমান
যত আছে নানা জাতি,
সবাই আমার আপনার জন
সবাই আমার জ্ঞাতি॥

* মন্দির পুস্তক হইতে গৃহীত '১৩১' নং গান।

জগতের মাঝে কেহ নাহি মোর পর,
সবায় হৃদয়ে আঁকড়ি' ধরিব
আসুক না যত ঝড়,
সবারে লইয়া গগনের তলে
বাঁধিব আমার ঘর,
সবার নয়নে দেখিব আমার
মধুর নয়ন-ভাতি॥
ভালবাসা দিয়া সবারে বাঁধিব
আমার বক্ষ-নীড়ে,
সকলের দুখে হব সমদুখী,
জাগিয়া অশ্রুনীরে,
বিপদে আপদে বাহুযুগ বেড়ি'
রাখিব সবারে ঘিরে,
করিয়া লইব জীবন মরণে
সবারে মরম-সাথী॥
কাহারেও হেলা করিব না অনাদরে,
স্নেহের পরশ বুলাইয়া দিব
সকলের অন্তরে।
সবার লাগিয়া জ্বালাইব আমি
সোহাগের শত বাতি,
সবার কুশলে তপস্যা আমি
করিব সারাটি রাতি॥

* মঙ্গল-মুরলী পুস্তক হইতে গৃহীত '২৫' নং গান।

(৬)

খণ্ড আজিকে হোক্ অখণ্ড
অণু-পরমাণু মিলিত হোক্;
ব্যথিত পতিত দুঃখী দীনেরা
ভুলুক বেদনা, ভুলুক শোক।।
ছোট বড় সব এক হ'য়ে যাক্,
প্রাণে প্রাণে হোক্ নব অনুরাগ,
জীবে জীবে হোক্ প্রেম-বন্ধন,
সৃষ্টি হোক্ আনন্দ-লোক।।

দূরে থাকা আর চলিবে না,
জগতের কাছে আছে দেনা;
জনমে জনমে প্রাণ-বলি দিয়া
ফুটুক নয়নে বিমলালোক।।

অপগত হোক্ আত্ম-কলহ,
স্বার্থ-প্রসূত দুঃখ-নিবহ;
শরণ্য হোক্ ত্যাগের মন্ত্র,
ত্যাগেই অমৃত, নহেক ভোগ।।

* মন্দির পুস্তক চটিতে গৃহীত '৩১৮' নং গান।


অখণ্ড সংহিতা
বা
ষোড়শ
শ্রী শ্রী স্বামী
খণ্ড
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী
অ খ ণ্ড - সং হি তা
ষোড়শ খণ্ড
অখণ্ড সংহিতা
বা
শ্রী শ্রী স্বামী
খণ্ড
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী